

সশস্ত্র বাহিনী দিবস জার্নাল ২০১৬

ARMED FORCES DAY JOURNAL 2016



সশস্ত্র বাহিনী দিবস জার্নাল ২০১৬

ARMED FORCES DAY JOURNAL 2016



জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক বানৌজা ঈসা খান এর কমিশন ও নেভাল এনসাইন প্রদান অনুষ্ঠান

১৯৭৪ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশ নৌবাহিনীর বৃহত্তম নৌ ঘাঁটি বানৌজা ঈসা খান কমিশন করেন এবং নেভাল এনসাইন প্রদান করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে প্যারেড পরিদর্শন শেষে জাতির পিতা তাঁর বক্তৃতায় বলেন, "আমাদের সুবিশাল সমুদ্র এলাকা ও সামুদ্রিক সম্পদ রক্ষায় একটি সুপ্রশিক্ষিত ও শক্তিশালী নৌবাহিনী অত্যাবশ্যক।"

তিনি এই বাহিনীকে দক্ষ, সাহসী ও বিশ্বের একটি অন্যতম চৌকষ নৌবাহিনী হিসেবে গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেছিলেন। এই দুরদৃষ্টি নিঃসন্দেহে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর অগ্রযাত্রায় এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব এবং বঙ্গোপসাগরে বিশাল সমুদ্র এলাকা রক্ষার প্রত্যয় নিয়ে বাংলাদেশ নৌবাহিনী অতিশীঘ্র একটি ত্রিমাত্রিক নৌবাহিনী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে যাচ্ছে।



বানৌজা ঈসা খান এর কমিশন অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান



بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।

০৭ অগ্রাহয়ণ ১৪২৩
২১ নভেম্বর ২০১৬

বাণী

আজ ২১ নভেম্বর, সশস্ত্র বাহিনী দিবস। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন। ১৯৭১ সালের এই দিনে তিন বাহিনী সম্মিলিতভাবে পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর উপর সর্বাত্মক আক্রমণ পরিচালনা করে। ফলশ্রুতিতে আমাদের কাঙ্খিত বিজয় অর্জন ত্বরান্বিত হয়। ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ আমরা বিজয় অর্জন করি। দিবসটি উপলক্ষে আমি সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর সকল সদস্যগণকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

সশস্ত্র বাহিনী দিবসে আমি পরম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যিনি শত জেল-জুলুম উপেক্ষা করে সমগ্র জাতিকে বাঙালি জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ করে ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। তাঁরই নেতৃত্বে দীর্ঘ ন'মাস সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা অর্জন করি কাঙ্খিত বিজয়। আজকের দিনে আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি মুক্তিযুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী বীরশ্রেষ্ঠ সিপাহী মোস্তফা কামাল, বীরশ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীর, বীরশ্রেষ্ঠ সিপাহী হামিদুর রহমান, বীরশ্রেষ্ঠ মোঃ রুহুল আমিন, ইআরএ-১, বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান, বীরশ্রেষ্ঠ ল্যান্স নায়েক নুর মোহাম্মদ শেখ, বীরশ্রেষ্ঠ ল্যান্স নায়েক মুন্সী আব্দুর রউফকে, যাঁরা মহান মুক্তিযুদ্ধে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করেন। এ দিনে আমি দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের জন্য শাহাদতবরণকারী মুক্তিযোদ্ধাসহ সশস্ত্র বাহিনীর বীর শহীদদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করি এবং যুদ্ধাহত ও শহীদ পরিবারের সদস্যদের প্রতি জানাই গভীর সমবেদনা। মহান মুক্তিযুদ্ধে সশস্ত্র বাহিনীর অবদান ও বীরত্বগাথা জাতি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে।

মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী জাতির অহংকার। তাই মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করেই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী একটি উঁচু পেশাদার, দক্ষ ও সুশৃঙ্খল বাহিনী। দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার মহান দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি যে-কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলাসহ জাতিগঠনমূলক কর্মকান্ডে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যগণ প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন। কেবল দেশেই নয়, সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যগণ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে অংশ নিয়ে অত্যন্ত দক্ষতা, সততা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করে চলেছেন। এ দায়িত্ব পালনকালে অনেক সদস্য শাহাদত বরণ করেছেন। আমি তাঁদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করি এবং তাঁদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাই।

সশস্ত্র বাহিনীর উন্নয়নে সরকার ফোর্সেস গোল-২০৩০ প্রণয়ন করেছে। এর ফলে সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীতে জনবল, স্থাপনা, আধুনিক যুদ্ধসরঞ্জাম বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। আমার বিশ্বাস এসব কর্মসূচি সশস্ত্র বাহিনীকে আরও আধুনিক, দক্ষ ও গতিশীল করবে। যে-কোনো বাহিনীর উন্নয়নের পূর্বশর্ত হলো নেতৃত্বের প্রতি গভীর আস্থা, পারস্পরিক বিশ্বাস, শ্রদ্ধাবোধ, কর্তব্যপরায়ণতা, পেশাগত দক্ষতা এবং সর্বোপরি শৃঙ্খলা। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যগণ নেতৃত্বের প্রতি পরিপূর্ণ অনুগত থেকে কঠোর অনুশীলন, পেশাগত দক্ষতা, কর্তব্যনিষ্ঠা ও দেশপ্রেমের সমন্বয়ে তাঁদের গৌরব সমুন্নত রাখতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবেন।

আমি সশস্ত্র বাহিনী দিবস-২০১৬ উপলক্ষে সশস্ত্র বাহিনীর উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি এবং বাহিনীসমূহের সকল সদস্য ও তাঁদের পরিবারবর্গের অব্যাহত সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ
রাষ্ট্রপতি ও সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক



بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০৭ অগ্রহায়ণ ১৪২৩
২১ নভেম্বর ২০১৬

বাণী

সশস্ত্র বাহিনী দিবস-২০১৬ উপলক্ষে আমি সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

গৌরবময় ঐতিহাসিক এই দিনে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের সকল বীর শহীদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করছি। শ্রদ্ধা জানাচ্ছি সশস্ত্র বাহিনীর সকল শহীদের প্রতি যাঁরা দেশমাতৃকার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহবানে সাড়া দিয়ে সমগ্র বাঙালি জাতি ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। আওয়ামী লীগ সরকারের অধীনে পরিচালিত মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ১৯৭১ সালে ২১ নভেম্বর দেশপ্রেমিক জনতা, মুক্তিবাহিনী, সশস্ত্র বাহিনী ও বিভিন্ন আধাসামরিক বাহিনীর সদস্যগণ সম্মিলিতভাবে দখলদার পাকিস্তানী বাহিনীর বিরুদ্ধে আক্রমণের সূচনা করেন। এর ফলশ্রুতিতে ১৬ ডিসেম্বর হানাদার পকিস্তানী বাহিনীকে পরাজিত করে চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়। মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি জাতির অগ্রযাত্রা ও বিজয়ের স্মারক হিসেবে প্রতি বছর ২১ নভেম্বর সশস্ত্র বাহিনী দিবস পালন করা হয়।

জাতির পিতা স্বাধীন বাংলাদেশে একটি আধুনিক সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলার কাজ শুরু করেন। তাঁর হতে গড়া সে বাহিনী আজ পেশাদারিত্ব ও দক্ষতার স্বাক্ষর রাখছেন তাঁদের সকল কর্মকান্ডে।

আওয়ামী লীগ সরকার সশস্ত্র বাহিনীর আধুনিকায়নে সর্বাত্মকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। পেশাগত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি সশস্ত্র বাহিনী দুর্যোগ মোকাবিলা, অবকাঠামো নির্মাণ, আর্তমানবতার সেবা, বেসরকারি প্রশাসনকে সহায়তা এবং বিভিন্ন জাতিগঠনমূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করছে।

জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করে আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যগণ আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করছেন।

আমি আশা করি, সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিটি সদস্য দেশপ্রেম, পেশাদারিত্ব এবং উন্নত নৈতিকতার আদর্শে স্ব-স্ব দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করে যাবেন।

আমি সশস্ত্র বাহিনী দিবস-২০১৬ উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা



জাতীয় স্মৃতিসৌধ, সাভার
(৩০ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত বাংলাদেশের স্বাধীনতার মূর্ত প্রতীক)



শিখা অনির্বাণ, ঢাকা সেনানিবাস
(মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের আত্মত্যাগের প্রতীক)



بسم الله الرحمن الرحيم

সেনাবাহিনী সদর দপ্তর
ঢাকা সেনানিবাস

সেনাবাহিনী প্রধান

বাণী

একুশে নভেম্বর–মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সমুজ্জ্বল বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী দিবস। এই দিবসটি সশস্ত্র বাহিনীর প্রত্যেকটি সদস্যের নিকট অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও স্মরণীয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে সাড়া দিয়ে ১৯৭১ সালের এই দিনেই আত্মোৎসর্গের মহান ব্রত নিয়ে দেশ মাতৃকাকে শত্রুমুক্ত করতে মুক্তিকামী আপামর জনতার সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর অকুতোভয় বীর সেনানীরা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে অপ্রতিরোধ্য আক্রমণের সূচনা করেছিল। ফলে ত্বরান্বিত হয়েছিল আমাদের কাঙ্খিত চূড়ান্ত বিজয়। আত্মোৎসর্গের প্রত্যয়ে উজ্জীবিত আজকের এই মহতী দিনে আমি সশস্ত্র বাহিনীর সকল সদস্যকে জানাচ্ছি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় আমাদের স্বাধীনতাযুদ্ধ। ১৯৭১ সালে দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে বিশ্ব মানচিত্রে স্বাধীন দেশ হিসেবে স্থান করে নেয় আমাদের দেশ, বাংলাদেশ। লাল-সবুজে খচিত এই পতাকা আমাদের গর্বের অর্জন, পরম প্রাপ্তি। এই প্রাপ্তি অনেক রক্ত ও ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত। সশস্ত্র বাহিনী দিবস প্রতি বছর আমাদের সেই ত্যাগ তিতীক্ষার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

আজকের এই বিশেষ দিনে আমি সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করছি মুক্তিযুদ্ধের সেইসব অকুতোভয় শহীদদেরকে, যাঁদের সুমহান আত্মত্যাগে অর্জিত হয়েছে আমাদের প্রাণপ্রিয় স্বাধীনতা। শ্রদ্ধা নিবেদন করছি তাঁদের প্রতি, যাঁরা স্বাধীনতা উত্তরকালে মাতৃভূমির অখন্ডতা রক্ষায় সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করেছেন। এই মহান দিনে আমি সকল শহীদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি এবং তাঁদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি জানাচ্ছি গভীর সমবেদনা।

মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা বাংলাদেশ সেনাবহিনী আজ একটি সুদক্ষ, সুশৃঙ্খল ও সুসংগঠিত বাহিনীরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। আমাদের অকুতোভয় বীর সেনানীরা জাতীয় দুর্যোগ মোকাবেলায় এবং বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা কার্যক্রমে নিজেদের আন্তরিকতা, কর্তব্যনিষ্ঠা ও উন্নত পেশাগত দক্ষতার মাধ্যমে স্বীয় দায়িত্ব পালন করে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়েছে। আগামীতেও মাতৃভূমির অখন্ডতা রক্ষা তথা জাতীয় যে কোন প্রয়োজনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারে সদা প্রস্তুত থাকবে।

এ মহান দিবসের তাৎপর্য সমুন্নত রাখার জন্য সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ একটি স্মরণিকা প্রকাশ করছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আমি এ মহতী উদ্যোগকে স্বাগত জানাই এবং এই প্রকাশনার সাথে সম্পৃক্ত সকলকে জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন। আমাদের নতুন প্রজন্মকে নব উদ্যমে উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে এই প্রকাশনা প্রভূত অবদান রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি। আমি বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর উত্তরোত্তর উন্নতি ও সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করছি। পরম করুণাময় আল্লাহ্‌তা'য়ালা আমাদের সকলের সহায় হউন। আমিন।

আবু বেলাল মোহাম্মদ শফিউল হক
জেনারেল
সেনাবাহিনী প্রধান



بسم الله الرحمن الرحيم

★ ★ ★ ★

নৌবাহিনী প্রধান

নৌবাহিনী সদর দপ্তর
বনানী, ঢাকা-১২১৩

বাণী

একুশে নভেম্বর সশস্ত্র বাহিনীর ইতিহাসে একটি গৌরবোজ্জ্বল ও তাৎপর্যপূর্ণ দিন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে সাড়া দিয়ে ১৯৭১ সালের এই দিনে আমাদের সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর অকুতোভয় বীর সেনানীরা দেশের আপামর জনতার সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে জল, স্থল ও আকাশ পথে অপ্রতিরোধ্য আক্রমণের সূচনা করেছিল। যার ফলশ্রুতিতে ত্বরান্বিত হয় আমাদের চূড়ান্ত বিজয় এবং বিশ্ব মানচিত্রে স্বাধীন দেশ হিসাবে স্থান করে নেয় আমাদের প্রাণপ্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ।

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে লাখো শহীদের আত্মোৎসর্গের বিনিময়ে আমরা অর্জন করেছি স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ। আজকের এই মহান দিনে আমি সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করছি মুক্তিযুদ্ধের সেইসব অকুতোভয় শহীদদের, যাঁদের সুমহান আত্মত্যাগে অর্জিত হয়েছিল আমাদের গর্বিত স্বাধীনতা। সেইসাথে স্মরণ করছি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যাঁর উদাত্ত আহবানে সাড়া দিয়ে ১৯৭১ এর এদিনে সশস্ত্র বাহিনীর সর্বস্তরের সদস্যবৃন্দ জনসাধারণের সাথে একাত্ম হয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য আত্মোৎসর্গের এক মহান দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। বিশেষ এই দিনটিতে আমি সকল শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি এবং তাঁদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে কার্যকর ও পেশাদার সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আন্তরিকতা ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বর্তমান সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এরই অংশ হিসেবে নৌবাহিনীকে ত্রিমাত্রিক ও যুগোপযোগী বাহিনী হিসেবে গড়ে তুলতে ইতোমধ্যে সংযোজিত হয়েছে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক যুদ্ধজাহাজ ও আধুনিক সামরিক সরঞ্জাম। যার মাধ্যমে আমাদের নৌ সদস্যরা দেশের বিশাল সমুদ্র এলাকার সার্বভৌমত্ব রক্ষা, সমুদ্র সম্পদের হেফাজত, চোরাচালান রোধ, উপকূলীয় এলাকার জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণসহ সমুদ্র এলাকার নিচ্ছিদ্র নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সার্বক্ষণিকভাবে দায়িত্ব পালন করে চলেছে। তাছাড়া দেশী-বিদেশী বাণিজ্যিক জাহাজসমূহকে সমুদ্রে নিরাপদ যাতায়াত নিশ্চিত করার মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিকে গতিশীল রাখায় বিশেষ অবদান রাখছে নৌবাহিনী। পাশাপাশি জাতীয় যে কোন দূর্যোগ মোকাবেলায় ও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় আন্তরিকতা, কর্তব্যনিষ্ঠা ও পেশাগত দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করে আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রশংসিত হচ্ছে। আগামীতেও মাতৃভূমির অখন্ডতা রক্ষা তথা জাতীয় যে কোন প্রয়োজনে বাংলাদেশ নৌবাহিনী সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারে সদা প্রস্তুত থাকবে।

মহান এ দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরতে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ বিশেষ জার্নাল প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আমি মহতী এই উদ্যোগকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। আমাদের নতুন প্রজন্মকে স্বাধীনতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে এই প্রকাশনা বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। পরিশেষে আমি নৌবাহিনী তথা সশস্ত্র বাহিনীর উত্তরোত্তর উন্নতি ও সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করছি। সর্বশক্তিমান আল্লাহতায়ালা আমাদের সকলের সহায় হউন।

নিজামউদ্দিন আহমেদ
এডমিরাল
নৌবাহিনী প্রধান



بسم الله الرحمن الرحيم

বিমান বাহিনী সদর দপ্তর
ঢাকা সেনানিবাস

★ ★ ★ ★

বিমান বাহিনী প্রধান

বাণী

বাঙালি জাতির ইতিহাসে একুশে নভেম্বর একটি গৌরবময় ও অবিস্মরণীয় দিন। তাৎপর্যপূর্ণ এই বিশেষ দিনে আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে যাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে বাংলার আপামর জনগণ স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। ১৯৭১ সালের এই দিনটিতে আমাদের সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর বীর সেনানীরা মাতৃভূমির স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত দেশের আপামর জনগণের সাথে একাত্ম হয়ে দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে রচনা করে সমন্বিত ও সর্বাত্মক আক্রমণ। প্রগাঢ় দেশপ্রেম ও আত্মশক্তিতে বলীয়ান এ সম্মিলিত প্রয়াসের মাধ্যমে ত্বরান্বিত হয় আমাদের চূড়ান্ত বিজয় এবং বিশ্ব মানচিত্রে আত্মপ্রকাশ করে আমাদের প্রাণপ্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ। আজকের এই দিনটি তাই আমাদের জাতীয় জীবনে এবং সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিটি সদস্যের কাছে অফুরন্ত অনুপ্রেরণার উৎস।

আমাদের জাতীয় জীবনে সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় হলো ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ। আজকের এই বিশেষ দিনে আমি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি তাঁদের - যাঁদের সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে আমাদের মহান স্বাধীনতা। আমি স্বাধীনতা যুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী সকল শহীদদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি এবং তাঁদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি।

প্রিয় মাতৃভূমির কষ্টার্জিত স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা ও দেশ গঠনে সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিটি সদস্য সদা প্রস্তুত। সশস্ত্র বাহিনী দেশের যেকোন দুর্যোগ মোকাবেলা, অবকাঠামো নির্মাণ, আর্তমানবতার সেবা প্রদানসহ বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজে সর্বাত্মকভাবে অনন্য ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। দেশের সীমানা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে দেশের জন্য বয়ে আনছে প্রভূত সম্মান। সমগ্র জাতি আজ তাঁদের গৌরবে গৌরবান্বিত।

এই তাৎপর্যপূর্ণ দিনটি উদযাপনের প্রাক্কালে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ একটি জার্নাল প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আমি এ মহতী প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানাই এবং প্রকাশনার সাথে সম্পৃক্ত সকলকে জানাই অভিনন্দন। আজকের এই গৌরবময় দিনে আমি সশস্ত্র বাহিনীর সকল সদস্য ও তাঁদের পরিবারবর্গকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। মহান আল্লাহ্ আমাদের সহায় হোন।

আবু এসরার
এয়ার চীফ মার্শাল
বিমান বাহিনী প্রধান



بسم الله الرحمن الرحيم

সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ
ঢাকা সেনানিবাস

মুখবন্ধ

সশস্ত্র বাহিনী দিবসের এই মহতী দিনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের সকল শহীদ ও বীর মুক্তিযোদ্ধাগণকে পরম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁদের অবিস্মরণীয় ভূমিকা স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের অবিচ্ছেদ্য অংশ। মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে এই বীর যোদ্ধাদের মহান আত্মত্যাগের ফলেই আজ আমরা বিশ্বের বুকে এক স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পেরেছি।

১৯৭১ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উদাত্ত আহবানে সাড়া দিয়ে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা সমন্বিতভাবে দেশের আপামর জনগণের সাথে হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীসহ সর্বস্তরের মুক্তিযোদ্ধাগণ ২১ নভেম্বর ১৯৭১ সালের এই দিনে একাত্ম হয়ে দখলদার পাকিস্তানী বাহিনীর বিরুদ্ধে সম্মিলিত আক্রমণের সূচনার মাধ্যমে বিজয়ের ধারা ত্বরান্বিত করে। এরই ফলশ্রুতিতে ১৬ই ডিসেম্বর অর্জিত হয় আমাদের মহান বিজয়। বস্তুত, মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের মাধ্যমেই আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর। আর তাই, মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের চেতনাকে বুকে ধারণ করে সশস্ত্র বাহিনীর নবপ্রজন্মের সকল সদস্যের কাছে এই মহতী দিবসটি দেশমাতৃকার প্রয়োজনে আত্মোৎসর্গের জন্য নতুন করে দৃপ্ত শপথ গ্রহণের দিন।

একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে কার্যকর ও পেশাদার সশস্ত্র বাহিনী প্রতিষ্ঠার জন্য বর্তমান সরকার যুগোপযোগী কার্যক্রম গ্রহণ করে চলেছে। দৃঢ়চেতা, অসীম সাহসী আর দেশপ্রেমিক আমাদের সশস্ত্রবাহিনীর সদস্যরা দেশমাতৃকার অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় নিষ্ঠার সাথে অহর্নিশি দায়িত্ব পালন করে চলেছে। আর্ত-মানবতার সেবা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, প্রয়োজনীয় যোগাযোগ ও অবকাঠামো নির্মাণ এবং অন্যান্য কার্যক্রমে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আমাদের সশস্ত্র বাহিনী জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমেও পেশাদারিত্বের পরিচয় দিয়ে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বিরল সম্মান ও ভূঁয়সী প্রশংসা অর্জন করে দেশের ভাবমূর্তিকে উজ্জ্বলতর করে চলেছে।

মহান সশস্ত্র বাহিনী দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে অন্যান্য বছরের ন্যায় ২০১৬ সালেও অসামরিক ও সামরিক সংযোগ পরিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে সশস্ত্র বাহিনীর একটি জার্নাল প্রকাশিত হলো। এই জার্নালে মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং বাহিনী প্রধানগণ তাঁদের মূল্যবান বাণী প্রদান করে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের অনুপ্রাণিত করেছেন। এজন্য তাঁদের প্রতি আমার সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছি। সশস্ত্র বাহিনীর বিভিন্ন স্তরের সদস্যদের লেখা ও ছবিতে সমৃদ্ধ জার্নালটি পাঠক মহলে সমাদৃত হলেই আমাদের এ প্রচেষ্টা সার্থক হবে। সৃজনশীল এ প্রকাশনার সাথে সম্পৃক্ত সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

মহান আল্লাহতায়ালা আমাদের সহায় হউন।

মোঃ মাহফুজুর রহমান
লেফটেন্যান্ট জেনারেল
প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার

আমাদের বীরশ্রেষ্ঠরা যেভাবে শহীদ হয়েছেন



বীরশ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর (সেনাবাহিনী)

১৯৭০ সালের ১৪ অক্টোবর ৭ নম্বর সেক্টরের মাহাদীপুর সাব-সেক্টরে যুদ্ধকালীন অবস্থায় চাঁপাইনবাবগঞ্জ শত্রুমুক্ত করার অভিযানে নেতৃত্ব দেন। শত্রুর প্রভূত ক্ষতিসাধন করেন এবং শত্রুর গুলিতে শাহাদাত বরণ করেন।



বীরশ্রেষ্ঠ সিপাহি হামিদুর রহমান (সেনাবাহিনী)

১৯৭১ সালের ২৮ অক্টোবর ১ নম্বর সেক্টরের ১ ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অধীনে যুদ্ধকালীন অবস্থায় চট্টগ্রাম জেলার ধলই এলাকার শত্রুর মেশিনগান পোস্ট ধ্বংস করে সহযোদ্ধাদের আক্রমণ ত্বরান্বিত করেন এবং শত্রুর গুলিতে শাহাদাত বরণ করেন।



বীরশ্রেষ্ঠ সিপাহি মোস্তফা কামাল (সেনাবাহিনী)

১৯৭১ সালের ১৮ এপ্রিল ৩ নম্বর সেক্টরের ৪ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অধীনে যুদ্ধকালীন অবস্থায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার গঙ্গাসাগর এলাকায় শত্রুর আক্রমণ ও ভারী কামানের গোলাবর্ষণের মুখে লাইট মেশিনগানের গুলি ফুরিয়ে যাওয়া পর্যন্ত নিজ অবস্থান থেকে একা শত্রুর মোকাবেলা করেন। পরে শত্রুর গুলিতে ও বেয়নেটের আঘাতে শাহাদাত বরণ করেন।



বীরশ্রেষ্ঠ ইঞ্জিনরুম আর্টিফিসার রুহুল আমিন (নৌবাহিনী)

১৯৭১ সালের ১০ ডিসেম্বর খুলনার রূপসা নদীতে যুদ্ধরত বাংলাদেশের রণতরী বাংলাদেশ নৌবাহিনী জাহাজ পলাশে জঙ্গিবিমান থেকে গোলাবর্ষণে আগুন ধরে যায়। ইঞ্জিনরুম আর্টিফিসার রুহুল আমিন রণতরী পলাশকে রক্ষা করার আপ্রাণ চেষ্টা করেন এবং শহীদ হন।



বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান (বিমান বাহিনী)

১৯৭১ সালের ২০ আগষ্ট পাকিস্তানের মশরুর বিমানঘাঁটি থেকে দুই আসনবিশিষ্ট একটি টি-৩৩ প্রশিক্ষণ বিমান চালানোর সময় ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান পাকিস্তানি পাইলটের কাছ থেকে বিমানের নিয়ন্ত্রণ ছিনিয়ে নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহনের উদ্দেশ্যে রওনা করেন এবং ভারতের সীমান্তের কাছে চলে আসেন। বিমানটি আকাশে অবস্থানকালীন পাকিস্তানি পাইলটের সাথে বিমান নিয়ন্ত্রণ নিয়ে সংঘর্ষকালে বিমানটি বিধ্বস্ত হয় এবং ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান শাহাদাত বরণ করেন।



বীরশ্রেষ্ঠ ল্যান্স নায়েক মুন্সি আবদুর রউফ (বিজিবি)

১৯৭১ সালের ২০ এপ্রিল ১ নম্বর সেক্টরে যুদ্ধরত অবস্থায় রাঙ্গামাটি জেলার বুড়িঘাট এলাকার প্রতিরক্ষা অবস্থানে থাকাকালীন ল্যান্স নায়েক মুন্সি আবদুর রউফের কোম্পানির ওপর শত্রুর প্রচন্ড গুলিবর্ষন শুরু হয়। এ সময় কোম্পানির প্রতিরক্ষা অবস্থান পরিবর্তনের জন্য মুন্সি আবদুর রউফ কভারিং ফায়ার প্রদানের দায়িত্ব নেন এবং শত্রুর ওপর অবিরাম গুলিবর্ষণ করে শত্রু বাহিনীর প্রভূত ক্ষতিসাধন করেন। যুদ্ধরত অবস্থায় শত্রুর একটি শেলের বিস্ফোরণে তিনি শাহাদাত বরণ করেন।



বীরশ্রেষ্ঠ ল্যান্স নায়েক নূর মোহাম্মদ শেখ (বিজিবি)

১৯৭১ সালের ৫ সেপ্টেম্বর ৮ নম্বর সেক্টরের বয়রা সাব-সেক্টরে যুদ্ধকালীন যশোর জেলার চৌগাছা থানার সুতিপুর প্রতিরক্ষা এলাকার সামনে গোয়ালহাটি গ্রামের কাছে স্ট্যান্ডিং প্যাট্রোল অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে ল্যান্স নায়েক নূর মোহাম্মদ শেখ শত্রু দ্বারা পরিবেষ্টিত হন। তিনি শত্রুকে প্রতিহত করার চেষ্টা অব্যাহত রাখেন এবং সহযোদ্ধা সিপাহী নান্নু মিয়া গুলিবিদ্ধ হলে নূর মোহাম্মদ শেখ তাঁকে কাঁধে নিয়ে মূল প্রতিরক্ষা অবস্থানে যেতে থাকেন এবং এসএলআরের মাধ্যমে গুলি করে শত্রুর অগ্রসর বাধাগ্রস্ত করেন এবং সহযোদ্ধাদের মূল প্রতিরক্ষা অবস্থানে ফিরতে সাহায্য করেন। এ সময় তিনি কাঁধে শত্রুর গুলি এবং হাঁটুতে শেলের আঘাতপ্রাপ্ত হন এবং যুদ্ধরত অবস্থায় শাহাদাত বরণ করেন।

দেশমাতৃকার অমর সন্তান
আমরা তোমাদের ভুলব না

সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ







সম্পাদনা পর্ষদ



কমডোর মোঃ নাজমুল হাসান, এনপিপি, এনসিসি, পিএসসি
প্রধান সম্পাদক



কর্নেল আবদুল্লাহ্-আল-মামুন, পিএসসি
সহকারী প্রধান সম্পাদক

জার্নাল সম্পাদনা উপপর্ষদ (বাংলা)



কমান্ডার এম শাহীন মজিদ, (জি), পিএসসি, বিএন
সম্পাদক



মেজর কামাল আতাউর রহমান, এইসি
সহযোগী সম্পাদক, সেনাবাহিনী



ইঃ লেঃ কমান্ডার নিলুফার আখতার খানম, বিএন
সহযোগী সম্পাদক, নৌবাহিনী



লেঃ কমান্ডার এম আসাদুজ্জামান, (এনডি), বিএন
সহযোগী সম্পাদক



উইং কমান্ডার মোঃ আসাদুজ্জামান
সহযোগী সম্পাদক, বিমান বাহিনী

জার্নাল সম্পাদনা উপপর্ষদ (ইংরেজি)



উইং কমান্ডার মোঃ রফিকুর রহমান, পিএসসি
সম্পাদক



মেজর সিনথিয়া সারমিন, এইসি
সহযোগী সম্পাদক, সেনাবাহিনী



ইঃ লেঃ এম ইফতেখারুল আলম, বিএন
সহযোগী সম্পাদক, নৌবাহিনী



স্কোয়াড্রন লীঃ শেখ মোহাম্মদ আলী
সহযোগী সম্পাদক, বিমান বাহিনী



স্কোয়াড্রন লীডার মোঃ মিজানুর রহমান, পিএসসি
সহযোগী সম্পাদক



সিএসও-২ মোঃ অহিদুজ্জামান বিশ্বাস
সহযোগী সম্পাদক

ক্রোড়পত্র সম্পাদনা উপপর্ষদ (বাংলা ও ইংরেজি)



লেঃ কর্নেল মাহমুদ মাওলা ভন, পিএসসি
সম্পাদক



মেজর মোঃ রোকনুজ্জামান খাঁন, এইসি
সহযোগী সম্পাদক



ইঃ লেঃ কমান্ডার এম আলিফ উল্লাহ, বিএন
সহযোগী সম্পাদক, নৌবাহিনী



স্কোঃ লীডার আরাফাত ইবনে জামান, জিডি (পি)
সহযোগী সম্পাদক

EDITORIAL

The 21st November, marked as Armed Forces Day, preserves immense significance in the history of our Liberation War. On this historic day in 1971, the valiant members of Bangladesh Army, Navy and Air Force along with the freedom fighters from all walks of life, launched an all out offensive on the occupation forces. The decisive attacks coordinated from all sectors compelled the enemy to surrender, resulting the glorious victory of Bangladesh. On this day of remembrance, the nation along with the members of the Armed Forces pay homage to the martyrs of our Liberation War and express heartfelt gratitude to all freedom fighters and their family members.

The spirit of 'Armed Forces Day' gives us a deep sense of pride and honour and is ever imprinted in the mind of every member of Armed Forces. This day specially marks an enduring bond of inter-service solidarity and amity.

In the series of commemorative events organized by the Armed Forces, we also bring out a journal, with due satisfaction. It is really encouraging that, the contributors of articles could spare valuable time for intellectual pursuit and present some quality papers on issues of military and national strategic interests. Scholars from civil society have also enriched our journal by rendering their articles. I would like to express my sincere appreciation to all the contributors of articles who, amidst their busy schedule, displayed a high standard of commitment towards the noble cause.

I am highly indebted to the Principal Staff Officer, Armed Forces Division, for his guidance and encouragement which were indispensable for the preparation and timely publication of this journal. The members of the editorial board tried their best to ensure the originality, factuality and creativity of all the write-ups. The team sincerely pursued careful editing and thus ensured its smooth publication. Despite careful scrutiny at this end, we request readers' accommodative view on our shortcomings, if there is any.

Finally, we pray to the Almighty for the salvation of the departed souls of the martyrs of our War of Independence. Let our hearts and minds be always guided by the spirit of our great Liberation War. Let us always remember with due respect the sacrifices made by the entire nation to achieve our coveted independence.

May Allah bless us all.

Chief Editor

সশস্ত্র বাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ তথ্যকণিকা

উন্নয়নের ধারায় সশস্ত্র বাহিনী









সাম্প্রতিককালে সশস্ত্র বাহিনীতে গুণগত ও অবকাঠামোগত প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে, যা নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী

১। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর আধুনিকায়নের অংশ হিসেবে সেনাবাহিনীতে সংযোজিত হয়েছে চতুর্থ প্রজন্মের ট্যাংক এমবিটি-২০০০ এবং আর্মড রিকভারি ভেহিকল ডব্লিউ-৬৫৪। এছাড়া সেনাবাহিনীতে সংযোজিত হয়েছে ওয়েপন লোকেটিং র‍্যাডার এসএসসি-২৩, সেক্ষ প্রপেল্ড (এসপি) কামান, এ্যান্টি ট্যাংক গাইডেড মিসাইল, লাইট আর্মড ভেহিকেল, সাউন্ড রেজিং ইকুইপমেন্ট ও মাল্টিপল লঞ্চিং রকেট সিস্টেম।

২। ঢাকা সেনানিবাসে নবনির্মিত 'আর্মি ডাটাসেন্টার' এবং 'কম্পিউটারাইজড ওয়ারগেইম সেন্টার' এর উদ্বোধন।

৩। কক্সবাজার জেলার রামু সেনানিবাসে ১০ম পদাতিক ডিভিশন এর অধীনস্থ ২ পদাতিক ব্রিগেডসহ ৭টি ইউনিটের পতাকা উত্তোলন।

৪। রামু সেনানিবাসে নির্মাণাধীন 'বীরসরণী' নামে নান্দনিক একটি সড়ক, ১০ম পদাতিক ডিভিশনের স্মৃতিস্তম্ভ 'অজেয়', একটি মাল্টিপারপাস শেড 'বীরাঙ্গণ' ও আলী কদম সেনানিবাসে নির্মিত কম্পোজিট ব্যারাক (মাতামুহুরী) এর উদ্বোধন।

৫। রামু সেনানিবাসে নির্মিতব্য নতুন ৪টি এসএম ব্যারাকের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন।

৬। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রথম নারী বৈমানিক হবার গৌরব অর্জন করেছেন ক্যাপ্টেন নাজিয়া নুসরাত হোসেন ও ক্যাপ্টেন শাহরিনা বিনতে আনোয়ার।

৭। ১২তম সাউথ এশিয়ান গেমস ২০১৬ এ ৫০ মিটার ফ্রি পিস্তল ইভেন্টে স্বর্ণপদক জয় করেছেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর উদীয়মন শ্যুটার সৈনিক শাকিল, যা বাংলাদেশের জন্য বয়ে এনেছে সম্মান ও সুনাম।

বাংলাদেশ নৌবাহিনী

১। নৌবাহিনীর নতুন তিনটি যুদ্ধজাহাজ 'সমুদ্র অভিযান', 'স্বাধীনতা' ও 'প্রত্যয়' এর কমিশনিং।

২। নৌবাহিনীকে আধুনিক ও ত্রিমাত্রিক বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে স্থায়ী সাবমেরিন ঘাঁটি তৈরীর কাজ চলমান রয়েছে।

৩। নৌবাহিনীর দক্ষ পরিচালনায় খুলনা শিপইয়ার্ড এবং নারায়নগঞ্জ ডকইয়ার্ড ইতিমধ্যে ৫টি পেট্রোল ক্রাফট, ২টি ল্যান্ডিং ক্রাফট ইউটিলিটি এবং ২টি ল্যান্ডিং ক্রাফট ট্যাংক নির্মাণ করেছে। এছাড়া নৌবাহিনী চিটাগাং ড্রাইডক পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছে।

৪। মহামান্য রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে নৌবাহিনী প্রধানের পদবী 'ভাইস এডমিরাল' হতে 'এডমিরাল' পদমর্যাদায় উন্নীত করা হয়।

৫। গত ০১ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখ খুলনাস্থ নৌবাহিনী ঘাঁটি তিতুমীরে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে আনুষ্ঠানিকভাবে ৪৪ জন মহিলা নাবিকের যোগদানের মাধ্যমে শুরু হলো মহিলা নাবিকদের গর্বিত পথচলা।

বাংলাদেশ বিমান বাহিনী

১। অবকাঠামোগত উন্নয়নের অংশ হিসেবে স্থাপিত হয়েছে বঙ্গবন্ধু এ্যারোনটিক্যাল সেন্টার এবং পূর্ণাঙ্গ ঘাঁটি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে বিমান বাহিনী ঘাঁটি বঙ্গবন্ধু ও বিমান বাহিনী ঘাঁটি কক্সবাজার।

২। MI সিরিজের বিভিন্ন হেলিকপ্টারসমূহ মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ এবং ওভারহলিং করার জন্য সম্প্রতি স্থাপন করা হয়েছে ২১৬ মেইনটেন্যান্স, রিপেয়ার এন্ড ওভারহল ইউনিট।

৩। বাংলাদেশ বিমান বাহিনী ঘাঁটি কক্সবাজারে একটি আধুনিক প্রযুক্তির YIC-6 Air Defence Radar উদ্বোধন।

৪। বাংলাদেশ বিমান বাহিনীতে অত্যাধুনিক ডিজিটাল ককপিট সম্বলিত Yak-130 কমব্যাট ট্রেইনার বিমান এবং মেরিটাইম সার্চ এন্ড রেসকিউ হেলিকপ্টার AW-139 এর উদ্বোধন।

৫। উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় শীঘ্রই বিমান বাহিনী বহরে সংযোজিত হতে যাচ্ছে গণচীনের তৈরী এয়ার ডিফেন্স র‍্যাডার (REI-4), ১২টি PT-6 প্রশিক্ষণ বিমান, রাশিয়ার তৈরী এমআই-১৭১ ই স্যালুন (ভিআইপি) হেলিকপ্টার।





দেশ গঠনে সশস্ত্র বাহিনী





বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর দেশ গঠনের ধারাবাহিকতায় গত এক বছরে সংগঠিত হয়েছে নানাবিধ কার্যক্রম, যা নিচে উদ্ধৃত হলোঃ

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী

১। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এর অধীনে বেড়ীবাঁধ হতে মোহাম্মদপুর বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত সংযোগ সড়ক নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন।

২। জয়দেবপুর হতে ময়মনসিংহ পর্যন্ত ৮৭.১৮ কিঃমিঃ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় মাওনা ফ্লাইওভার, সালনা রেল ওভার ব্রীজসহ প্রকল্পের মূল সড়ক নির্মাণের কাজ সম্পাদন।

৩। বেগুনবাড়ী খালসহ হাতিরঝিল এলাকার সমন্বিত উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সাউথ ইউ-লুপের কাজ সম্পাদন।

৪। ঢাকা সেনানিবাসের রজনীগন্ধা-বনানী সংযোগ সড়ক প্রকল্পের অংশ হিসেবে ৯৫০ মিঃ দৈর্ঘ্য, ১৫ মিটার প্রস্থ বিশিষ্ট ৪ লেন সড়ক, ১২৩৪ মিটার দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট ফুটপাতসহ ড্রেন, ১১৬৯ মিটার বাউন্ডারী ওয়াল এবং ১৮৮২ বর্গমিটার টাইলস এর নির্মাণ কাজ সম্পাদন।

৫। ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে রুট এ্যালাইনমেন্টের মধ্যে বিদ্যমান ইউটিলিটি প্রতিস্থাপন/অপসারণ প্রকল্পের ১ম পর্যায়ের (হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর হতে বনানী রেলক্রসিং পর্যন্ত) জিপিআর সার্ভে, ডিটেইল সার্ভে, ইউটিলিটি শিফটিং ও ডেমুলিশন কাজ সম্পাদন।

৬। মেঘনা সেতুর ক্ষয়ক্ষতি প্রটেকশন এবং মেঘনা ও গোমতি সেতুর রক্ষনাবেক্ষণ প্রকল্প বাস্তবায়ন।

৭। পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রজেক্টের তদারকি চলমান।

৮। পদ্মা বহুমুখী সেতুর রেলওয়ে লিংক প্রজেক্টের তদারকির দায়িত্ব গ্রহণ।

৯। ৬ষ্ঠ বাংলাদেশ চীন-মৈত্রী সেতুর (মুক্তারপুর সেতু) সংযোগ সড়কে অবস্থিত দুটি ক্ষতিগ্রস্থ সেতুর বিকল্প (বাইপাস) সড়ক নির্মাণ ও সেতু দুটির সংস্কার/পূণঃনির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ।

১০। আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় ২৮৯টি ব্যারাক হাউজ নির্মাণ ও ০৮টি গভীর নলকুপ স্থাপনের কাজ সম্পাদন।

১১। বীর উত্তম শহীদ মাহবুব সেনানিবাসের ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজের ছয়তলা বিশিষ্ট ছাত্রাবাস নির্মাণ।

১২। ৩৪ কিঃমিঃ দীর্ঘ বাঘাইহাট-মাসালং-সাজেক (বিএমএস) সড়ক নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন।

১৩। ঢাকা-চট্টগ্রাম সংযুক্ত মহাসড়কের উপর মহিপাল ফ্লাইওভার নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ।

১৪। লক্ষীপুর জেলার অন্তর্গত রামগতি-কমলনগর উপজেলার মেঘনা নদীর ভাঙ্গন রোধকল্পে বাঁধ নির্মাণ বাস্তবায়ন।

১৫। ৮০ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্য ও ৩.৬৬ মিটার প্রস্থের কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ সড়ক প্রকল্প চলমান।

বাংলাদেশ নৌবাহিনী

১। কক্সবাজারের অদূরে ভাসমান ফিশিং বোট "আল্লাহর দান" কে টোয়িং করতঃ নিরাপদ স্থানে আনয়ন।

২। চট্টগ্রামের বহিঃনোঙ্গর A এবং B ও তৎসংলগ্ন এলাকায় গত ৬ মার্চ ২০১৬ তারিখে ডুবন্ত Lighter Ship MV KHANSONS-1 এর উদ্ধার অভিযান এবং নিখোঁজ ক্রুদের উদ্ধার কার্যে অংশগ্রহণ।

৩। গত ৯ মার্চ ২০১৬ তারিখে কক্সবাজারের (কাজির টেক ও মহেশখালী চ্যানেল) নিকটে বিধ্বস্ত Cargo Aircraft এর ধ্বংসাবশেষ এবং নিখোঁজ ক্রুদের উদ্ধার অভিযানে অংশগ্রহণ।

৪। ভারতীয় ফিশিং বোট FB MOHA GOURI ১৭ জন ক্রুসহ বাংলাদেশের জলসীমায় ডুবে গেলে পরবর্তীতে ডুবন্ত বোট, ক্রুদের মধ্যে ৮ জনকে মৃত এবং ৩ জনকে জীবিত উদ্ধার।

৫। পায়রা সমুদ্র বন্দরের ড্রেজিং ও চ্যানেল ডিজাইন কার্যক্রমে হাইড্রোগ্রাফিক তথ্য উপাত্ত সরবরাহসহ ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নে সহযোগিতা।

৬। চট্টগ্রাম ড্রাইডক লিঃ (সিডিডিএল) কে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর নিকট আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর।

৭। নৌবাহিনী কর্তৃক ভূমিহীন, গৃহহীন, ছিন্নমূল অসহায় দরিদ্র পরিবারকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে আশ্রয়ণ-২ নামে প্রকল্প ২০১০ হতে চলমান।

৮। মৎস্যসম্পদ রক্ষা অভিযানে ৫১,৭৬,০৪,৮০০ টাকা মূল্যমানের সম্পদ আটক।

৯। জাটকাবিরোধী অপারেশন পরিচালনায় ১,৩০,৩৬,৫৫০ মিটার জাল ১,২৮০ কেজি জাটকা আটক।

বাংলাদেশ বিমান বাহিনী

১। পার্বত্য চট্টগ্রামের দূর্গম পাহাড়ি অঞ্চলে বিভিন্ন অপারেশনাল জরুরি পরিবহন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ।

২। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর রাত্রিকালীন ফায়ারিং অনুশীলন চলাকালে মারাত্মকভাবে আহত ০৩ জন সেনা সদস্যকে মধ্যরাতে বিমান বাহিনীর একটি Mi-17 হেলিকপ্টারের মাধ্যমে কক্সবাজারের উখিয়া হতে জরুরি ভিত্তিতে উদ্ধার করে ঢাকা সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে স্থানান্তর।

৩। চলতি বছরের মে মাসে বান্দরবানের থানচির দূর্গম এলাকায় খাদ্য ঘাটতি দেখা দিলে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর এমআই-১৭১ হেলিকপ্টারের মাধ্যমে জরুরি ভিত্তিতে খাদ্য সরবরাহ।

৪। শ্রীলংকায় সংঘটিত ভয়াবহ বন্যা ও ভূমিধসে ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের জন্য ত্রাণ সহায়তা নিয়ে সি-১৩০ পরিবহন বিমান শ্রীলংকায় গমণ এবং দেশের ভাবমূর্তি উন্নয়ন।

বাংলা প্রবন্ধসমূহের সূচিপত্র

১। 'লাখো কণ্ঠে সোনার বাংলা' - আপামর জনতা ও সশস্ত্র বাহিনীর এক অনন্য সাফল্য ২৮
কর্নেল আবদুল্লাহ্ -আল-মামুন, পিএসসি

২। আঞ্চলিক সমন্বিত নিরাপত্তা উদ্যোগে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সম্পৃক্ততা ও সাফল্য-পরিপ্রেক্ষিত IONS ২০১৬ ৩৭
কমান্ডার সারওয়াত হোসেন, (এনডি), পিএসসি, বিএন

৩। 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'-এর আলোকে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের জন্য শিক্ষনীয় কিছু বিষয় ৪৭
লেঃ কর্নেল মোঃ কামরুল হাসান, পিএসসি, জি, আর্টিলারি

৪। চতুর্থ প্রজন্মের যুদ্ধ, বৈশ্বিক সন্ত্রাসবাদ এবং সশস্ত্র বাহিনীর প্রস্তুতি ৫৪
লেঃ কর্নেল আবু রুবেল মোঃ শাহাবুদ্দিন, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, জি, আর্টিলারি

৫। ইসলামের দৃষ্টিতে সশস্ত্র বাহিনীর মর্যাদা ৬২
অধ্যাপক মুহম্মদ মাসুম চৌধুরী

৬। মুক্তিযুদ্ধ ও জাতীয়-আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ভূমিকা ৭১
উইং কমান্ডার মোঃ আসাদুজ্জামান, শিক্ষা

৭। অগ্নি নির্বাপনে ব্যক্তি সামর্থ্য ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ৭৯
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ আইয়ুব আনসারী, পিএসসি

Content of English Articles

1. **Defence Diplomacy in Bangladesh-An Introspection** 93
Col Husain Muhammad Masihur Rahman, SPP, afwc, psc

2. **Maritime Terrorism: Strategic Preparedness for Bangladesh** 103
Commander M Mahbubur Rahman, (TAS), psc, BN

3. **Operational Importance of Tejgaon Airport vis-a-vis Urbanization in Dhaka City** 114
Wing Commander AKM Ziaul Haque, afwc, psc, ATC

4. **Joint Logistics for Bangladesh Armed Forces : Practicable Possibilities** 121
Maj Md Ziaur Rahman, ASC

5. **Open Space Emergency Shelter-A Guideline for Armed Forces of Bangladesh During Disaster Management** 131
Major Khandaker Mustafizur Rahman, psc

6. **Armed Forces' Contribution in Reshaping the Tourism Sector of Chittagong Hill Tracts** 141
Lt Col A F M Atiqur Rahman, afwc, psc, G, Arty

7. **Reflections on The Armed Forces Day** 151
Professor Dr. Md. Tawfiqul Haider



‘লাখো কণ্ঠে সোনার বাংলা’ - আপামর জনতা ও সশস্ত্র বাহিনীর এক অনন্য সাফল্য

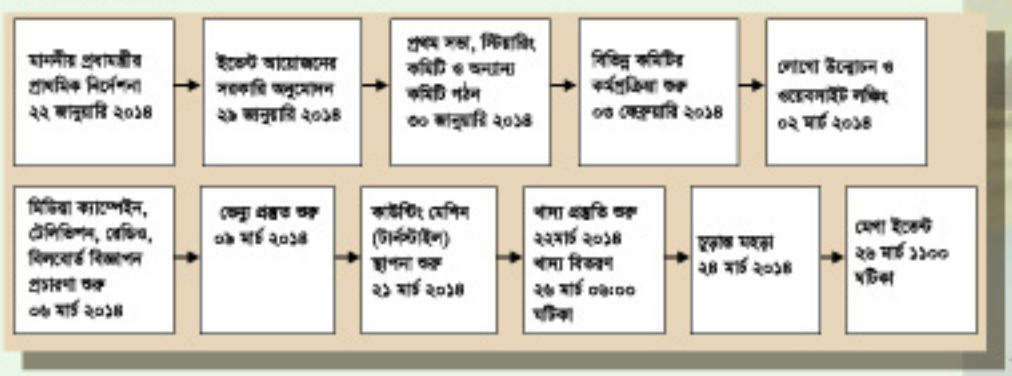
কর্নেল আবদুল্লাহ্-আল-মামুন, পিএসসি

ভূমিকা/অনুপ্রেরণা

২০১৪ সালের ২৬শে মার্চ ছিল বাংলাদেশের ৪৪ তম স্বাধীনতা দিবস। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও স্বাধীনতার উচ্ছ্বাসে আপ্লুত হওয়ার দিন, বাঙালির প্রাণের উৎসব। একটি বিশেষ অর্জন সেদিন এই উৎসবকে পরিণত করেছিল মহোৎসবে। সর্বাধিক জনগণের অংশগ্রহণে জাতীয় সংগীত গেয়ে সেদিন বাংলাদেশ অর্জন করেছিল গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডের অধিকারী হওয়ার গৌরব। বাংলাদেশের সেই আন্তর্জাতিক অর্জনের মহোৎসবের নাম ছিল ‘লাখো কণ্ঠে সোনার বাংলা’। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত উদ্যোগে ‘লাখো কণ্ঠে সোনার বাংলা’ এর পরিকল্পনা শুরু হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২২ জানুয়ারি ২০১৪ তারিখে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং সশস্ত্র বাহিনী বিভাগকে এই আয়োজনটি করার দায়িত্ব দেন। এর আগে ১ লক্ষ ২১ হাজার ৬৫৩ জনগণের অংশগ্রহণে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ার রেকর্ড ছিল অন্য একটি দেশের। সেই রেকর্ডকে অতিক্রম করে নতুন বিশ্ব রেকর্ড করার জন্য ৩ লক্ষ জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। হাতে তখন সময় মাত্র ২ মাস। সামনে দুরূহ একটি লক্ষ্য, কারও কারও মতে আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব একটি লক্ষ্য। কিন্তু মরিয়া হয়ে যুদ্ধ করে মাত্র ৯ মাসে দেশ স্বাধীন করেছে যে বাঙালি জাতি তাদের চেতনার মহাশক্তি আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভবকে কেন সম্ভব করবে না? সেই আত্মবিশ্বাস নিয়ে শুরু হল এক বিশেষ অর্জনের যাত্রা।

আয়োজনের ক্রমধারা

যেকোন সফল ইভেন্ট শুরু হয় একটি উদ্যোগের মাধ্যমে। ‘লাখো কণ্ঠে সোনার বাংলা’ আয়োজনের উদ্যোগ এবং নির্দেশ আসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছ থেকে। ১৬ ডিসেম্বর ২০১৩ সালে বিশ্বের সর্ববৃহৎ মানব পতাকা তৈরির সাফল্য ‘লাখো কণ্ঠে সোনার বাংলার জন্য আত্মবিশ্বাস ও অনুপ্রেরণা যোগায়। ২২ জানুয়ারি ২০১৪ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা পাবার পর থেকে সংস্কৃতি বিষয়ক মাননীয় মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান নূর এবং সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের তৎকালীন প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার লেফটেন্যান্ট জেনারেল আবু বেলাল মোহাম্মদ শফিউল হক (বর্তমানে জেনারেল এবং সেনাবাহিনী প্রধান) অনতিবিলম্বে এই আয়োজনটির জন্য প্রয়োজনীয় সরকারি অনুমোদনসহ প্রাথমিক কাজ শুরু করেন। সশস্ত্র বাহিনী, সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, কর্মচারি, স্বেচ্ছাসেবকদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় শুরু হয় এক মহাআয়োজনের প্রস্তুতি। এই প্রস্তুতি ও ইভেন্ট সংগঠনের ক্রমধারা হয় নিম্নরূপঃ





ইভেন্ট শুরুর প্রাথমিক পরিকল্পনা

লাখো কণ্ঠে সোনার বাংলা আয়োজনে সরকারি অনুমোদনের পরপরই শুরু হয় প্রাথমিক পরিকল্পনা। গিনেজ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডের শর্ত মেনে এত বড় আয়োজনের অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের ছিল না। এর আগে সর্ববৃহৎ পতাকা তৈরির আয়োজনের অংশ নিয়েছিল ৪০,০০০ জনতা কিন্তু এবারের সংখ্যা হতে হবে কয়েক লক্ষ, আয়োজনের জন্য হাতে সময় মাত্র ২ মাস। সব কিছু মিলিয়ে অনেক প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, অনেক মতামত বিনিময় হয় এবং পরে কিছু বিশেষ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

উত্থাপিত প্রশ্নঃ ইভেন্ট আয়োজনের সিদ্ধান্তের পর আয়োজকদের মনে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো উত্থাপিত হয়ঃ

- বিশ্ব রেকর্ডের জন্য কতজন অংশগ্রহণকারীর টার্গেট নির্ধারণ করা সমীচীন হবে?
- এত বড় ইভেন্ট আয়োজনের জন্য ভেন্যু কোন্‌টি হবে?
- বিপুল সংখ্যক অংশগ্রহণকারীর উপস্থিতি কিভাবে নিশ্চিত করা যাবে?
- ইভেন্টের জন্য বাজেট কত নির্ধারণ করতে হবে?
- ইভেন্টের মূল আয়োজনের দিন কোন সময়টিতে গান গাওয়া হবে?
- অংশগ্রহণকারীদের মাঝে কি খাবার বিতরণ করা হবে?
- ইভেন্টের এর জন্য ভেন্যু কিভাবে প্রস্তুত করতে হবে?
- অংশগ্রহণকারীদের নিরাপত্তা কিভাবে নিশ্চিত করতে হবে?
- এত বিপুল সংখ্যক অংশগ্রহণকারীকে ভেন্যুতে কিভাবে নিরাপদে প্রবেশ করানো হবে?
- কি কি অনাকাঙ্খিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে?
- ভেন্যুর বাইরে অবস্থানকারী জনগণের জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে?

সংশ্লিষ্ট মতামত : উপরের উত্থাপিত প্রশ্নগুলোর আলোকে আয়োজনকারীদের মধ্যে বিভিন্ন মতামত বিনিময় হয় যা নিম্নরুপঃ

- অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা নির্ধারণে বিভিন্ন মত দেখা যায়। কেউ ৫ লক্ষ, কেউবা ১০ লক্ষ অংশগ্রহণকারীর ব্যবস্থা গ্রহণের পক্ষে মত দেয়, যাতে ভবিষ্যতে এই রেকর্ড কেউ ভাঙ্গতে না পারে।
- কেউ মত দেয় যে, শুধু আনসার ভিডিপি থেকে অথবা শুধু গার্মেন্টস কর্মীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে ইভেন্টটি আয়োজন করা যেতে পারে।
- কেউ কেউ বলেন, কোন সংস্থা থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা নির্দিষ্ট না করে যে কোন সংখ্যক ব্যক্তিকে অংশগ্রহণ করতে দেয়া যেতে পারে।
- ব্যবসায়ী ও গার্মেন্টস শ্রমিকদের প্রতিষ্ঠান এফবিসিসিআই, বিজিএমইএ, বিকেএমইএ এবং বিটিএমইএ দেড় লক্ষ গার্মেন্টস শ্রমিকদের উপস্থিতি নিশ্চিত করার নিশ্চয়তা দেয়।
- সহজে প্রবেশ ও প্রস্থানের জন্য বড় কোন স্টেডিয়ামকে ভেন্যু হিসেবে প্রস্তাব করা হয়।
- ইভেন্টের অর্থ সংস্থানের জন্য প্রাথমিকভাবে কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের স্পন্সারশিপ নেয়ার প্রস্তাব করা হয়।

গুরুত্বপূর্ণ কিছু সিদ্ধান্ত : সব মতামত পর্যালোচনা শেষে বিশেষ কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়ঃ

- টার্গেট অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ৩ লক্ষ নির্ধারণ করা হয়, এর কারণ:

(১) অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণযোগ্য রাখা।

(২) যাতে একটি শক্তিশালী রেকর্ড করা যায়, যে রেকর্ড অদূর ভবিষ্যতে কেউ ভাঙ্গতে না পারে।

(৩) ইভেন্টের বাজেট যাতে অপেক্ষাকৃত পরিমিত থাকে।

(৪) যাতে অংশগ্রহণকারীদের নিরাপত্তা সুচারুভাবে রক্ষা করা যায়।

সকল স্তরের জনগণের অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর বিভিন্ন সংস্থা থেকে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা নিম্নলিখিত ভাবে নির্ধারিত হয়।

ক্র/নং	সংস্থা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১।	সরকারি এবং বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়	৬০,০০০ জন
২।	গার্মেন্টস কর্মী ও কর্তৃপক্ষ	১,৫০,০০০ জন
৩।	বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এবং এর আওতাধীন স্কুল, কলেজসমূহ	২০,০০০ জন
৪।	বাংলাদেশ নৌবাহিনী এবং এর আওতাধীন স্কুল, কলেজসমূহ	৩,০০০ জন
৫।	বাংলাদেশ বিমান বাহিনী এবং এর আওতাধীন স্কুল, কলেজসমূহ	৬,০০০ জন
৬।	বাংলাদেশ পুলিশ এবং এর আওতাধীন স্কুল, কলেজসমূহ	১০,০০০ জন
৭।	বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ	২,০০০ জন
৮।	আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী	২০,০০০ জন
৯।	মুক্তিযোদ্ধাগণ এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীনে সংস্থাসমূহ	৪০,০০০ জন
১০।	বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর	১,৫০০ জন
	সর্বমোট	**৩,১২,৫০০ জন**

- জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ডকে ভেন্যু হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। যেহেতু এর আয়তন বৃহৎ, যেহেতু এখানে ইতিপূর্বে জাতীয় প্যারেড, সর্ববৃহৎ মানব পতাকা তৈরি ইত্যাদি বড় ইভেন্ট আয়োজিত হয়েছে।

- ইভেন্টটিকে জাতীয় রূপ দেয়ার জন্য বিভিন্ন সংস্থার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উপস্থিতি ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য প্রতিটি সংস্থার অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা নির্দিষ্ট করে দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

- কোন স্পন্সরশিপ না নিয়ে স্বতঃস্ফূর্ত অনুদানের মাধ্যমে অর্থ সংস্থান করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

- ভেন্যুতে মেগা ইভেন্টটি চলার সময় একই সময়ে সারা দেশে জাতীয় সংগীত গাওয়া নিশ্চিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

- সেই সাথে সারা বিশ্বব্যাপী প্রবাসী বাংলাদেশীদের একই সময়ে জাতীয় সংগীত পরিবেশনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

- প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে প্যাকেট খাবার ও প্রাথমিক চিকিৎসা সামগ্রী দেয়ার সিদ্ধান্ত






গৃহীত হয়। সেই সাথে একটি স্ট্রিং ব্যাগে একটি ছোট জাতীয় পতাকা, জাতীয় সংগীতের একটি লিখিত কপি, একটি নির্দেশিকা, একটি ক্যাপ ও একটি অংশগ্রহণের সার্টিফিকেট দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

আয়োজনের বিস্তারিত বিবরণ

এই মহান যাত্রায় প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে আয়োজনের পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য সংস্কৃতি বিষয়ক মাননীয় মন্ত্রীর নেতৃত্বে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সশস্ত্র বাহিনী, আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি স্টিয়ারিং কমিটি গঠিত হয়। এর সাথে বিভিন্ন কাজের জন্য ১০টি কমিটি গঠিত হয়। ৩০ জানুয়ারি ২০১৪ তারিখে স্টিয়ারিং কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সে সভায় ১০টি কমিটির প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। গঠিত ১০টি কমিটি নিম্নরূপঃ

ক। ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কমিটি
খ। জনশক্তি ব্যবস্থাপনা কমিটি
গ। খাদ্য ব্যবস্থাপনা কমিটি
ঘ। ট্রাফিক ও ক্রাউড নিয়ন্ত্রণ কমিটি
ঙ। চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা কমিটি
চ। নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা কমিটি
ছ। মিডিয়া ব্যবস্থাপনা কমিটি
জ। প্রোটোকল ও অভ্যর্থনা কমিটি
ঝ। অর্থ ব্যবস্থাপনা কমিটি

প্রতিটি কমিটির প্রধান সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করেন একজন জ্যেষ্ঠ সামরিক কর্মকর্তা। সেই সময়ে ঢাকা ও সাভার সেনানিবাসে চাকুরীরত জ্যেষ্ঠ সামরিক কর্মকর্তাদের নেতৃত্বে অক্লান্ত পরিশ্রম শুরু করে কমিটির সকল সদস্যরা। পাশাপাশি প্রতিটি কমিটি প্রয়োজনীয় নিজস্ব সাব-কমিটি গঠন করে। সামরিক, অসামরিক, সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ এই কমিটি এবং সাব-কমিটির সদস্য ছিলেন।

স্টিয়ারিং কমিটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো গ্রহণ করে এবং অন্যান্য সকল কমিটির কার্যক্রম তদারকি করে। প্রথমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হল আয়োজনের ভেন্যু সম্পর্কে। এমন একটি ভেন্যু প্রয়োজন যেখানে ৩ লক্ষ জনগণের ঢাকার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রবেশ ও প্রস্থানের সু-ব্যবস্থা থাকতে হবে, যেখানে নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুচারু হতে হবে, ভেন্যুটি খোলা হতে হবে যাতে হেলিকপ্টার থেকে সহজে ভিডিও ফুটেজ নেয়া যায়, ভেন্যুতে ৩ লক্ষ জনগণের জন্য যথেষ্ট প্রশাসনিক সুবিধা থাকতে হবে। সব প্রয়োজন পর্যালোচনা করে জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ডকে এই মহতী আয়োজনের ভেন্যু হিসেবে নির্বাচন করা হয়।

১০টি কমিটির মধ্যে কলেবরে সবচাইতে বড় ছিল ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কমিটি। তৎকালীন জিওসি ৯ পদাতিক ডিভিশন, মেজর জেনারেল চৌধুরী হাসান সারওয়ার্দী (বর্তমানে লেফটেন্যান্ট জেনারেল) ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কমিটির প্রধান সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করেন। এই কমিটির কাজের সুবিধার জন্য ৫টি সাবকমিটি গঠন করা হয় যেগুলো ছিল ভেন্যু ম্যানেজমেন্ট সাব কমিটি, অ্যাসেম্বলী এরিয়া সাব কমিটি, ইঞ্জিনিয়ার সার্ভিস সাব কমিটি, টেকনিক্যাল ও লিগ্যাল সাব কমিটি, এন্ট্রি কন্ট্রোল সাব কমিটি এবং সেক্টর ও ব্লক প্ল্যানিং সাব কমিটি। ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কমিটি জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ডকে ১৫টি পৃথক সেক্টরে ভাগ করে এবং প্রতিটি সেক্টরকে ৪০০টি ব্লকে ভাগ করে। এভাবে মোট ৬ হাজার ব্লক প্রস্তুত করা হয় এবং পরিকল্পনা করা হয় যে প্রতিটি ব্লকে একজন ব্লক ম্যানেজারের নেতৃত্বে ৫০ জন অংশগ্রহণকারী অবস্থান করবেন। এভাবে মোট ৩ লক্ষ অংশগ্রহণকারীর অবস্থান নিশ্চিত করার জন্য সেক্টর, ব্লক চিহ্নিত করা হয়। ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কমিটি

গিনেজ ওয়ার্ল্ড রেকর্ড কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করে আয়োজনের জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলী ও নিয়মাবলী জেনে নেয়।

জনশক্তি ব্যবস্থাপনা কমিটি ৩ লক্ষ জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পোশাক প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান, সশস্ত্র বাহিনীর সংগঠনগুলোর সাথে সমন্বয় করে। খাদ্য ব্যবস্থাপনা কমিটি ১০% অতিরিক্ত ধরে ৩ লক্ষ ১০ হাজার জনগণের জন্য শুকনো খাবার, পানি ও জরুরি ঔষুধসহ প্যাকেট প্রস্তুত করে এবং ভেন্যুতে উপস্থিত সকলকে বিতরণের দায়িত্ব নেয়।ট্রাফিক ও ক্রাউড ব্যবস্থাপনা কমিটি ট্রাফিক পরিকল্পনা প্রস্তুত করে আয়োজনের দিন যথেষ্ট ট্রাফিক নিয়ন্ত্রক নিয়োগের মাধ্যমে বিপুল জনগোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব নেয়। চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা কমিটি ২২১ জন ডাক্তার, নার্স ও চিকিৎসা সহায়কসহ ৩ ধাপে বিভিন্ন স্থানে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন করে।

নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব ছিল ইভেন্টকে কেন্দ্র করে সম্পূর্ণ এলাকার নিরাপত্তা বিধান। অন্তঃবেষ্টনী, মধ্যবেষ্টনী ও বহির্বেষ্টনীর মাধ্যমে ৩টি ধাপে নিরাপত্তা বেষ্টনী কার্যকর করে সার্বিক নিরাপত্তা বিধানের পরিকল্পনা করা হয়। মিডিয়া ব্যবস্থাপনা কমিটি সারা দেশব্যাপী এবং দেশের বাহিরেও বিশ্বব্যাপী অনুষ্ঠিতব্য ইভেন্টটির ব্যাপক প্রচারণা চালানোর জন্য টেলিভিশন, রেডিও, সামাজিক মাধ্যমে মিডিয়া ক্যাম্পেইন পরিচালনা করে।


ভেন্যু প্রস্তুতি

প্রোটোকল ও অভ্যর্থনা কমিটি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রোটোকল অনুযায়ী অভ্যর্থনার দায়িত্বে থাকে। এই মহা আয়োজনের অর্থ সংকুলানের জন্য স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান অর্থ হিসেবে প্রদান করে। অনুদানকৃত টাকার সঠিক খরচ ও হিসাব রক্ষণ করে অর্থ ব্যবস্থাপনা কমিটি। অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি শেষে ২৪ মার্চ ২০১৪ তারিখে ৬ হাজার ব্লক ম্যানেজার ও তত্ত্বাবধায়কের উপস্থিতিতে কিছু সংখ্যক ছাত্রছাত্রীর অংশগ্রহণে জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ডে প্রস্তুতিমূলক মহড়া অনুষ্ঠিত হয়।

ইভেন্টের চ্যালেঞ্জসমূহ এবং সমাধান

১। পরিবহন চ্যালেঞ্জঃ ইভেন্টে অংশগ্রহণের জন্য ৩ লক্ষ অংশগ্রহণকারীর পরিবহনের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হয় যে, অংশগ্রহণকারীগণ যেই সংস্থা থেকে আগমন করবে সেই সংস্থা থেকে পরিবহনের ব্যবস্থা করা হবে। বিভিন্ন সংস্থা এতে সমস্যার সম্মুখীন হওয়ায় কেন্দ্রীয়ভাবে অংশগ্রহণকারীদের পরিবহনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। হিসাব করে দেখা গেল ৩ লক্ষ লোককে পরিবহন করতে ৫০ সিটধারী ৬ হাজার বাস প্রয়োজন। প্রতিটি বাসের সারাদিনের খরচ ৫ হাজার টাকা ধরে মোট ৩ কোটি টাকা পরিবহন খরচ প্রয়োজন।

কার্যকরী সমাধানঃ এই পরিস্থিতিতে একদিনে ৬ হাজার বাসের ব্যবস্থা করা অনেক বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। আয়োজনকারীরা এ পরিস্থিতিতে মাননীয় নৌ পরিবহন মন্ত্রী জনাব শাজাহান খানের সাথে সাক্ষাত করেন। মাননীয় মন্ত্রী বাংলাদেশের পরিবহন মালিক সমিতির চেয়ারম্যান হওয়ায় তিনি পরিবহন মালিকদের একটি সভা আহ্বান করেন। মাননীয় মন্ত্রীর উদ্বুদ্ধকারী বক্তব্যের করণে সভায় উপস্থিত পরিবহন মালিকরা ইভেন্টের জন্য সহযোগিতা করার ব্যাপারে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসেন। বেশিরভাগ মালিক ইভেন্টের জন্য বিনামূল্যে যানবাহন দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। কেউ কেউ শুধুমাত্র জ্বালানি খরচ ও চালকের মজুরি নিবেন বলে জানান।



রেলমন্ত্রণালয় অংশগ্রহণকারীদের পরিবহনের জন্য এক বিশেষ উদ্যোগে গাজীপুর থেকে ঢাকা হয়ে নারায়ণগঞ্জে ৪টি বিশেষ শাট্‌ল ট্রেনের ব্যবস্থা করে। এছাড়া বিআরটিসি গাবতলী-তেজগাঁও-যাত্রাবাড়ি রুটে ঐ দিন সকল স্তরের অংশগ্রহণকারীদের জন্য বিশেষ দোতলা শাটল বাসের আয়োজন করে।

সশস্ত্র বাহিনীর প্রচুর সংখ্যক যানবাহন সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের এবং ক্যান্টনমেন্ট এলাকার স্কুল ও কলেজের ছাত্রছাত্রীদের আনা নেয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। ঢাকার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীদের ভেন্যুতে পরিবহনের জন্য বিশেষভাবে বাস ও মিনিবাসের ব্যবস্থা করা হয়।

২। অনুষ্ঠানের অর্থ সংকুলানের চ্যালেঞ্জ: ইভেন্টের অর্থ সংকুলানের জন্য কোন স্পন্সর নেয়া হবেনা মর্মে সিদ্ধান্ত হবার পর বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায় ডোনেশন সংগ্রহ করার বিষয়টি। প্রয়োজনীয় অর্থ যোগানের জন্য মাননীয় অর্থ মন্ত্রী জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিতের সাথে যোগাযোগ করা হয়। মাননীয় মন্ত্রী ব্যবসায়ী সমাজকে নিয়ে বৈঠকে বসেন। মন্ত্রীর ব্যক্তিগত উদ্যোগে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলোর মালিকরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসেন এবং মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর কাছে অনুদানের চেক হস্তান্তর করেন।

৩। অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা গণনা এবং নির্দিষ্ট সময়ে অংশগ্রহণকারীদের প্রবেশ নিশ্চিতকরণ: লাখো কণ্ঠে সোনার বাংলা ইভেন্টের দিনটিতে সবচাইতে দীর্ঘ অধ্যায় ছিল ৩ লক্ষ অংশগ্রহণকারীদের গণনা করে প্রবেশ করানো। এর জন্য দুটো প্রযুক্তিগত পদ্ধতি প্রয়োগ করার সুযোগ ছিল। এর একটি বার কোডে রিষ্ট ব্যান্ড যার মাধ্যমে ৩ লক্ষ অংশগ্রহণকারীদের রিষ্ট ব্যান্ড স্ক্যান করে প্রবেশ করাতে অনেক সময় লেগে যেত। তাই কম সময়ে সবচাইতে কার্যকর পদ্ধতি হিসেবে ইলেক্ট্রনিক টার্নস্টাইলের ব্যবস্থা করা হয় যা স্বাভাবিকভাবে অংশগ্রহণকারী গেট পার হলেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংখ্যা গননা করতে পারে।

৪। বিপুল সংখ্যক অংশগ্রহণকারী ভেন্যুতে দীর্ঘ সময় অবস্থানকালে প্রশাসনিক সহায়তা নিশ্চিতকরণ: ৩ লক্ষ অংশগ্রহণকারী প্রায় ৬ ঘন্টা অনুষ্ঠানস্থলে অবস্থান করতে হবে। এই সময়ে তাদের স্বস্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য জন্য প্রয়োজন ছিলো বিপুল প্রশাসনিক আয়োজন। সার্বিক বিবেচনায় অংশগ্রহণকারীদের জন্য নিম্নলিখিত প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ঃ

ক। ভেন্যুতে প্রবেশের সময় গেটে খাবারের প্যাকেট ও খাবার পানি সরবরাহ করা হয়।

খ। ৪ স্তরে চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করা হয়। এজন্য প্রতি সেক্টরে একটি করে মোট ১৫টি চিকিৎসা কেন্দ্র, ২টি ফিল্ড হাসপাতাল, প্রতি প্রবেশ পথে ২টি করে এবং প্রতি অ্যাসম্বলী এরিয়াতে ১টি করে চিকিৎসা ক্যাম্প স্থাপন করা হয়।

গ। প্রতি সেক্টরে পুরুষ ও মহিলাদের জন্য টয়লেটের ব্যবস্থা করা হয়।

ঘ। ফায়ার সার্ভিস এর গাড়ির মাধ্যমে পানি ছিটিয়ে ভেন্যুর তাপমাত্রা সার্বক্ষণিকভাবে কমানো হয়।

ঙ। অংশগ্রহণকারীদের সুবিধার জন্য ব্লক ম্যানেজার ও সুপারভাইজার নিয়োগ করা হয়।

৫।ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা: ভেন্যুতে আগমনের জন্য ট্রাফিক সার্কিট পরিকল্পনা, প্রতিটি সেক্টরের জন্য পার্কিং এরিয়া এবং সাধারণ ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের বিষয়গুলো নিশ্চিতকরণের জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়ঃ

ক।ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব ট্রাফিক ও ক্রাউড কন্ট্রোল কমিটিকে দেয়া হয়।

খ। ভেন্যুর চারপাশে যথেষ্ট দূরত্ব রেখে ৯টি যানবাহন পার্কিং এলাকা নির্ধারণ করা হয় এবং এগুলোকে সেক্টর মাফিক চিহ্নিত করা হয়।

গ। যানবাহনগুলো ডিবাসিং পয়েন্টে অংশগ্রহণকারীদের নামিয়ে যানবাহন পার্কিং এলাকাতে যাতে চলে যেতে পারে তা নিশ্চিত করা হয়।

ঘ। ভেন্যু ও আশেপাশে রাস্তাগুলিতে বিশেষভাবে সাধারণ যানবাহনের চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

৬। **টার্নস্টাইল নেটওয়ার্কে সমস্যা:** ইভেন্টের আয়োজন সবচাইতে বড় চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে ঠিক আগের দিন, অর্থাৎ ২৫ মার্চ তারিখে। কারিগরি সমস্যার কারণে দেখা যায় প্রতিটি গেইটের গণনাকারী টার্নস্টাইল মেশিনের একটিও কাজ করছেনা। চূড়ান্ত পর্বের তখন মাত্র ২০ ঘন্টা বাকি। কারিগরি বিশেষজ্ঞরা অনেক চেষ্টা করেও কোনো কূলকিনারা করতে পারছেননা। উদ্বেগের চরম পর্যায়ে তখন সবাই। এত বড় আয়োজন, এত পরিশ্রম তাহলে কী বিফলে যাবে? শেষ চেষ্টা হিসাবে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিজ্ঞ শিক্ষক প্রফেসর ডঃ এস. এম. লুৎফুল কবিরের স্মরনাপন্ন হলেন আয়োজকরা। প্রফেসর একদল তরুণ বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়ে শুরু করলেন টার্নস্টাইল নেটওয়াকিং ঠিক করার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা। ঘন্টার পর ঘন্টা প্রচেষ্টা চলল। সবাই তখন রুদ্ধ শ্বাসে অপেক্ষা করছে আর তাকিয়ে আছে প্রফেসরের মুখের দিকে। কিন্তু বাঙালীর এ্যাত বড় প্রাণের উৎসব সৃষ্টিকর্তা পণ্ড হতে দিবেন কেন? আল্লাহ্‌র অশেষ রহমতে ১২ ঘন্টা পর রাত ২টায় টার্নস্টাইল নেটওয়ার্ক ঠিক হলো। আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করে আর প্রফেসর ডঃ এস. এম. লুৎফুল কবিরের দলকে হৃদয় নিংড়ানো ধন্যবাদ জানিয়ে সাবই প্রস্তুত হলো বহু প্রতীক্ষিত চূড়ান্ত আয়োজনের জন্য।



ভেন্যুতে প্রবেশের জন্য অপেক্ষমান দেশপ্রেমী জনতার অংশগ্রহণ



লাল সবুজে উৎসবমুখর জনতা

সাফল্যের সেই দিন: এর পর ২৬ মার্চ ২০১৪ তারিখে আসে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। আয়োজকদের ২ মাসের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ড তখন প্রস্তুত। বাংলাদেশের জাতীয় চেতনাকে আন্তর্জাতিকভাবে বিকশিত করার এক মহতী প্রচেষ্টাকে বুকে ধারণ করার জন্য সকাল ৬টা ৩০ মিনিটে জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ডের সবকটি গেইট অংশগ্রহণকারীদের প্রবেশের জন্য খুলে দেয়া হয়। এরপর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রধান অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠান স্থলে উপস্থিত হন। সকাল ১১টা ১৭ মিনিটে আসে সেই প্রতীক্ষিত মুহূর্তটি। ২ লক্ষ ৫৪ হাজার ৫ শত ৩৭ জন বাংলাদেশি কণ্ঠ মিলিয়ে গেয়ে উঠে আমাদের প্রাণের সংগীত 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি'।

সেই সাথে ভেন্যুর বাইরে অবস্থানরত জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ডের চারপাশের এলাকার আরও লক্ষাধিক বাংলাদেশি কণ্ঠ মেলায় প্রাণের সুরে। ভেন্যুর বাইরে তাদের জন্যও বিশেষ ব্যবস্থা করা হয় এই মহোৎসবে যোগ দেয়ার জন্য। জাতীয় সঙ্গীতের এই অনুরণন জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ডে সীমিত থাকে নি। একই মুহূর্তে বাংলাদেশের প্রতিটি জেলায় এবং প্রতিটি

উপজেলায় বিশেষ আয়োজনে কোটি মানুষ একসাথে জাতীয় সংগীত গায়। এখানেই শেষ নয়। আমাদের জাতীয় চেতনা সুরের মূর্ছনা হয়ে সেদিন ছড়িয়ে পড়েছিল দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বিশ্বময়। সারা বিশ্বে বাংলাদেশের দূতাবাসগুলোর আয়োজনে প্রবাসী বাংলাদেশি এবং জাতিসংঘ মিশনে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কর্মরত সশস্ত্র বাহিনী ও পুলিশ সদস্যরা ঘড়িতে সময় মিলিয়ে একসাথে গেয়েছিল আমাদের প্রিয় জাতীয় সংগীত।

সাফল্যের সাথে এই আয়োজন শেষ হবার পরপরই এই আয়োজনের দলিলাদী, স্থিরচিত্র, হেলিকপ্টার থেকে ধারণকৃত চিত্র, ভিডিও ফুটেজ গিনেজ ওয়ার্ল্ড রেকর্ড কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হয়। এর দুই সপ্তাহ পর গিনেজ ওয়ার্ল্ড রেকর্ড কর্তৃপক্ষ সব প্রমাণাদী পর্যবেক্ষণ করে সর্বাধিক জনগণের দ্বারা জাতীয় সংগীত গাওয়ায় বাংলাদেশ বিশ্ব রেকর্ড করেছে বলে চূড়ান্তভাবে স্বীকৃতি দেয়। যুক্তরাজ্যের গিনেজ ওয়ার্ল্ড রেকর্ড কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে বাংলাদেশের এই বিশ্ব রেকর্ডের সনদ গ্রহণ করা হয়। সংস্কৃতি বিষয়ক মাননীয় মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর এবং সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের তৎকালীন প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার (বর্তমান সেনাবাহিনী প্রধান) জেনারেল আবু বেলাল মোহাম্মদ শফিউল হক এই সনদটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট হস্তান্তর করেন।



অনুষ্ঠানের মাহেন্দ্রক্ষণ



বহু প্রতীক্ষিত গিনেজ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডের সনদ গ্রহণ

উপসংহার/উপলব্ধি

লাখো কণ্ঠে সোনার বাংলার সার্থকতা শুধু বিশ্ব রেকর্ড করা নয় বরং এটি বাংলাদেশিদের জাতীয় চেতনার এক বহিঃপ্রকাশ। এটি এমন একটি আয়োজন ছিল যার পেছনে বাংলাদেশি আপামর জনতার স্বতঃস্ফূর্ততা কাজ করেছিল। এই আয়োজনের অর্থ সংকুলানের জন্য নিজের নাম গোপন রেখে বড় অঙ্কের অনুদান প্রদানের দৃষ্টান্ত রয়েছে। দৃষ্টান্ত রয়েছে সামরিক ও অসামরিক জনগণের একসাথে অক্লান্ত পরিশ্রম করার। দৃষ্টান্ত রয়েছে বিনা পারিশ্রমিকে হাজার হাজার জনগণের এই আয়োজনকে সার্থক করে তোলার প্রচেষ্টার। উদাহরণ আছে বড় বড় কারিগরি, প্রশাসনিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়ার। এতে প্রমাণ রয়েছে স্বল্প সময়ে এত সকল আয়োজনের যা বিশ্বের অন্য কোন দেশ করতে পারে নি।

বাঙালি বীরের জাতি। বাঙালি শত প্রতিকূলতার মাঝে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা জাতি। প্রতিবছর বন্যা আসে, ভেসে যায় ঘরবাড়ি, আসে সাইক্লোন, তছনছ হয় সংসার কিন্তু ভাটা পড়েনা বাংলাদেশির জীবনীশক্তিতে। তাই আবার সে ঘর বাঁধে, আবার ফসল ফলায়। এই অসাধারণ শক্তি, চেতনাই মাত্র ৯ মাসে স্বাধীন করেছিল বাংলাদেশকে। পৃথিবীতে এমনটি খুব কমই হয়েছে, খুব কমই হয়। যেই জাতীয় চেতনা বাংলাদেশকে করেছে অনন্য সেই জাতীয় চেতনার আরেকটি সফল দৃষ্টান্ত 'লাখো কণ্ঠে সোনার বাংলা'। এই অর্জনে গর্বিত বাংলাদেশি আপামর জনতা, গর্বিত সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিটি সদস্য।

তথ্যসূত্র

এই প্রবন্ধটির যাবতীয় তথ্য সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ কর্তৃক ২০১৫ সালে পরিচালিত 'লাখো কণ্ঠে সোনার বাংলা আয়োজন' শীর্ষক একটি গবেষণা কার্যক্রম হতে সংকলিত। উক্ত গবেষণা 'লাখো কণ্ঠে সোনার বাংলা' সম্পর্কিত দাপ্তরিক দলিলাদি, আয়োজনকারী জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের সাক্ষাৎকার, ভিডিও রেকর্ড ও স্থির চিত্র হতে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে সম্পাদিত হয়। এই গবেষণা কার্যক্রম সম্পাদন করেন:

ক। কর্নেল আবদুল্লাহ্-আল-মামুন, পিএসসি
খ। লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোঃ কবির উদ্দিন শিকদার, পিএসসি, ইঞ্জিনিয়ার্স
গ। মেজর মোহাম্মদ মুনিরুল ইসলাম ভূঁইয়া, পিএসসি, এএসসি
ঘ। মেজর এস এম শামীম ইবনে মঈন, এসি



কর্নেল আবদুল্লাহ্-আল-মামুন, পিএসসি ২১ ডিসেম্বর ১৯৯০ সালে ২৩ বিএমএ লং কোর্সের সাথে সেনাবাহিনীর কোর অব ইঞ্জিনিয়ার্সে কমিশন লাভ করেন। তিনি মিরপুরে ডিফেন্স সার্ভিসেস কমান্ড এন্ড ষ্টাফ কলেজের একজন গ্রাজুয়েট। তিনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিফেন্স ষ্টাডিজ এর উপর মাস্টার ডিগ্রি অর্জন করেন। কর্নেল মামুন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এ স্নাতক ডিগ্রী এবং সাউথ ইষ্ট ইউনিভার্সিটি হতে মাষ্টার্স ইন বিজনেজ ষ্টাডিস ডিগ্রি অর্জন করেন। কর্নেল মামুন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে প্রশিক্ষক, স্টাফ এবং ইউনিট কমান্ডার হিসেবে বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি মোজাম্বিক এবং সুদানে জাতিসংঘ মিশনে অংশগ্রহণ করেন। কর্নেল মামুন দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ অর্জন করেন। তিনি সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের গ্রেড-১ ষ্টাফ অফিসার হিসেবে প্রায় সাড়ে তিন বছর জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী মিশনের সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি সশস্ত্র বাহিনীর মুখপাত্র হিসেবে বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াতে অনুষ্ঠিত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। বর্তমানে কর্নেল মামুন সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের অসামরিক ও সামরিক সংযোগ পরিদপ্তরে কর্নেল স্টাফ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।



আঞ্চলিক সমন্বিত নিরাপত্তা উদ্যোগে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সম্পৃক্ততা ও সাফল্য - পরিপ্রেক্ষিত IONS ২০১৬

কমান্ডার সারওয়াত হোসেন, (এনডি), পিএসসি, বিএন

ভূমিকা

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পরিভাষায় জাতীয় নিরাপত্তা এবং পারস্পরিক সহযোগিতা–বিষয় দুটি তাত্ত্বিকভাবে মেলানো কঠিন। পৃথিবীতে রাষ্ট্রগুলো ঐতিহাসিকভাবে জাতীয় নিরাপত্তার বিষয়টিকে বরাবরই অত্যন্ত নিজস্ব বলে মনে করেছে। কিন্তু বিশ্বায়নের প্রভাবে মূলত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর হতে স্নায়ুযুদ্ধ চলাকালীন সময় অবধি বিশ্বজুড়ে পারস্পরিক সহযোগিতামূলক নিরাপত্তা ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটতে দেখা যায়। এই পরিবর্তনের কার্যকারণের বিষয়ে নানা মত থাকলেও সর্বাধিক স্বীকৃত কারণ হলো 'নিরাপত্তা বিষয়ক হুমকির প্রকৃতি ও সেগুলোর ভৌগোলিক পরিবর্তন'। এ সময় নিরাপত্তা বিষয়ক চিন্তাধারায় পূর্বের রাষ্ট্রকেন্দ্রিক এবং ভৌগোলিকভাবে সুনির্দিষ্ট ধারণার বিপরীতে বহুজাতিক এবং কিছুটা বিমূর্ত ধারণার উদ্ভব ঘটে। বহুজাতিক নিরাপত্তার এই ক্রমবর্ধমান প্রবণতা সমুদ্রভিত্তিক নিরাপত্তা বা Maritime Security এর ক্ষেত্রে আরও প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে, কেননা সমুদ্রের বিস্তারের ব্যাপকতা যে কোনো জাতিভিত্তিক ব্যবস্থাকে অপ্রতুল পরিগণিত করে।

ভারত মহাসাগরীয় উপকূলবর্তী রাষ্ট্রগুলি ২০০৮ সালে এমনি একটি সহযোগিতামূলক নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রচলন করেছে যা ইন্ডিয়ান ওশান নেভাল সিম্পোজিয়াম (Indian Ocean Naval Symposium) বা IONS নামে পরিচিত। প্রতিষ্ঠার পর হতে অদ্যাবধি IONS ভারত মহাসাগরীয় সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার পরিবর্তন তথা উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। এ বছর IONS আমাদের জন্য আরও বেশি গুরুত্ববহ; কেননা, ২০১৬-২০১৮ সালের জন্য এই সংগঠনের ৫ম সভাপতি হিসাবে বাংলাদেশ নৌবাহিনী প্রধান দায়িত্ব পালনের জন্য সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হয়েছেন। এই দায়িত্বের অংশ হিসাবে এ বছর জানুয়ারিতে ঢাকায় অনুষ্ঠিত ৫ম দ্বিবার্ষিক সম্মেলনের আয়োজনে বাংলাদেশ নৌবাহিনী অভাবিত সাফল্য লাভ করেছে। এছাড়াও বাংলাদেশ নৌবাহিনী প্রধানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত IONS এর সর্বোচ্চ সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী নৌ প্রধানদের সমাবেশ, যা কনক্লেভ অব চিফস্ (Conclave of Chiefs) বা সংক্ষেপে কনক্লেভ নামে পরিচিত, বিভিন্ন সময়োপযোগী ও বাস্তবমুখী সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে। এটি নিঃসন্দেহে বাংলাদেশ নৌবাহিনী তথা বাংলাদেশের জন্য একটি সম্মানজনক অর্জন।

সময়ের চলার পথ ধরে বাংলাদেশ নৌবাহিনী বর্তমানে একট গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে উপনীত হয়েছে। ক্রমবর্ধমান উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ নৌবাহিনী সুনামের সাথে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও জাতীয় দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি নিজেকে একটি ত্রিমাত্রিক নৌবাহিনীতে রূপান্তরের পথে এগিয়ে চলেছে। এই শতাব্দীর নবতর নিরাপত্তা হুমকি মোকাবিলার জন্য বাংলাদেশ নৌবাহিনী Force Structuring পরিকল্পনায় বিশেষভাবে যত্নশীল। এরই পাশাপাশি আঞ্চলিক নিরাপত্তা বিষয়ে একটি উদ্যোগের কাণ্ডারী হিসেবে স্বীকৃতি ও নির্ভরযোগ্যতা আন্তর্জাতিকভাবে বাংলাদেশ নৌবাহিনীকে আরও সম্মানের আসনে উন্নীত করবে। IONS এর সভাপতিত্ব অবশ্যই নৌবাহিনীর জন্য দেশরক্ষার নিয়মিত দায়িত্বের পাশাপাশি একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা পরিচালনার বহুবিধ বাড়তি দায়িত্ব যোগ করবে। কিন্তু বাংলাদেশ নৌবাহিনী এই কর্তব্যপালনে প্রস্তুত ও

বদ্ধপরিকর। সদ্য শৈশবোত্তীর্ণ IONS কে কৈশোরের পথ ধরে সাবালকত্বে পৌছানোর গুরুদায়িত্ব বাংলাদেশ নৌবাহিনীকেই পালন করতে হবে।

এই রচনায় ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের বর্তমান নিরাপত্তা হুমকিসমূহ এবং বিরাজমান নিরাপত্তা কাঠামোর বিশ্লেষণ করা হবে। অতঃপর IONS এর দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রাধিকারের মাপকাঠিতে একই বিষয়বস্তুর মূল্যায়ন করা হবে। এই প্রক্রিয়ায় সংশিষ্ট অন্যান্য আঞ্চলিক ও বহিঃআঞ্চলিক রাষ্ট্রসমূহের স্বার্থ সংশ্লিষ্টতাও আলোচনায় আসবে। সর্বোপরি সম্প্রতি অনুষ্ঠিত IONS ২০১৬-এর আলোকে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সার্বিক অবদান আলোচনা করা হবে।

ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের নিরাপত্তা কাঠামো - IONS এর দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণ

ভারত মহাসাগরের বিশাল ব্যাপ্তির কারণে সার্বিক নিরাপত্তা কাঠামোর বিবেচ্য বিষয় মূলতঃ অনেক। তবে IONS এর দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী যে বিষয়গুলি অপেক্ষাকৃত গুরুত্ববহ, আলোচনা সেগুলোতেই সীমাবদ্ধ থাকা বাঞ্ছনীয়। এছাড়াও এই নিরাপত্তা ব্যবস্থার মূল্যায়নে নিয়ামক হিসেবে বিভিন্ন বহিঃশক্তির প্রভাব ও স্বার্থসংশ্লিষ্টতা বিবেচনায় আনা জরুরি। সবশেষে IONS একটি সংগঠন হিসেবে এই দুইয়ের সমন্বয়ে কীভাবে পুরো বিষয়টিকে দেখে তা বিবেচনা করা যেতে পারে। ফলতঃ, IONS দেশসমূহ, একযোগে যে সকল বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করে তা বিশ্লেষণের জন্য পূর্বের ঘটনার ধারাবাহিকতা উল্লেখ করা প্রয়োজন।

ভারত মহাসাগর, বিশ্বের ক্ষুদ্রতম মহাসাগর হলেও দুটি বৃহত্তম মহাদেশকে এক করেছে। আফ্রিকার পূর্ব উপকূল হতে অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত এই জলরাশি নানা রকম নিরাপত্তাজনিত সমস্যার পটভূমি। এর মাঝে যেমন আন্তঃরাষ্ট্র বিবাদ বা সমুদ্র পথে হামলার সম্ভাবনা আছে, তেমনি রয়েছে অবৈধ মৎস্য আহরণ বা সমুদ্রের উপর জলবায়ুর বিরূপ প্রভাবের মতো বিপর্যয়। ফলতঃ একই তত্ত্বে সকল সমস্যার আলোচনা বা সমাধান একটি সুদূরপরাহত বাস্তবতা। এমতাবস্থায়, এসব সমস্যার একটি অগ্রাধিকার ভিত্তিক তালিকা সূচিত করার উদ্দেশ্যে ২০১২ সালে কেপটাউনে অনুষ্ঠিত IONS সম্মেলনে তিনটি বিষয় নির্বাচন করা হয়। এগুলি হলো মানবিক সহযোগিতা ও ত্রাণ বিতরণ (HADR), সামুদ্রিক জলদস্যুতা প্রতিরোধ (Counter Piracy) এবং সামুদ্রিক বিষয়ে সচেতনতা (Maritime Domain Awareness)। পরবর্তীতে ২০১৪ সালে অস্ট্রেলিয়ার পার্থে অনুষ্ঠিত চতুর্থ IONS সম্মেলনে এই বিষয়গুলির ভিত্তিতে স্বেচ্ছাপূর্বক সদস্য দেশগুলোর সমন্বয়ে তিনটি IONS ওয়ার্কিং গ্রুপ (IWG) গঠিত হয়। মূলত এই তিনটি বিষয়ে কার্যকরী এবং সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা প্রণয়নের জন্য এই সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়েছিল। পূর্বে নির্বাচিত বিষয়গুলির মূলভাব বজায় রেখে গ্রুপ তিনটির নামকরণ করা হয়- মানবিক সহযোগিতা ও ত্রাণ বিতরণ (HADR), সামুদ্রিক জলদস্যুতা প্রতিরোধ (Counter Piracy) এবং তথ্য আদান-প্রদান ও পারস্পরিক কর্মপন্থা উন্নয়ন (Information Sharing and Interoperablity)। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৬ সালের জানুয়ারিতে ঢাকায় অনুষ্ঠিত সম্মেলনে, পূর্বে প্রণীত Counter Piracy IWG এর কর্মপরিধি সম্প্রসারণ করা হয় এবং একে Maritime Security IWG নামে নতুনভাবে নামকরণ করা হয়। এর ফলে বিভিন্ন আঞ্চলিক সমুদ্র বিষয়ক অপরাধ, সন্ত্রাস, অস্ত্রপাচার ইত্যাদি গুরুত্ববহ বিষয় এই গ্রুপের আলোচনার পরিধিতে অন্তর্ভুক্ত হবে। এই পরিবর্তন নিশ্চিতভাবে IONS এর কর্মপন্থায় সমসাময়িকতা ও আঞ্চলিক গ্রহণযোগ্যতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই রচনায় মূলত এই তিনটি বিষয়কে কেন্দ্র করে আঞ্চলিক নিরাপত্তা কাঠামোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সামুদ্রিক নিরাপত্তা

একাধারে সংঘাত প্রবণ বৃহত্তর মধ্যপ্রাচ্য (Greater Middle East) এবং আরেক দিকে আন্তর্জাতিক স্বার্থের সংঘাতে সংক্ষুব্ধ দক্ষিণ চীন সাগরের বিষয়গুলি ভারত মহাসাগরীয়



আঞ্চলিক না হওয়া সত্ত্বেও, এই অঞ্চলের নিরাপত্তা কাঠামোতে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করছে। এই প্রচলিত ধারার নিরাপত্তা হুমকির পাশাপাশি অপ্রচলিত ধারার নিরাপত্তা হুমকির আশংকাও যথেষ্ট উদ্বেগজনক। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জলসীমায় ক্রমবর্ধমান জলদস্যুতা ও সশস্ত্র ডাকাতির হার বিগত বছরগুলিতে বিশ্বজুড়ে উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম বুরো (IMB) এর ২০১৫ সালের প্রতিবেদনে বিশ্বজুড়ে জলদস্যুতা ও ডাকাতির ক্রমবর্ধমান হারের কারণে বিশেষ উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। এশীয় জলসীমায় জলদস্যুতা দমন সংক্রান্ত সহযোগিতা সংস্থা ReCAAP (Regional Cooperation Agreement of combating piracy and Armed Robbery against ships in Asia) এর সর্বশেষ প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০১৬ এর এপ্রিল অবধি এবছর মোট ২৫টি জলদস্যুতার ঘটনা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে যার মধ্যে দুটি ঘটনায় জাহাজের ক্রুদের অপহরণ করা হয়েছে।

এদিকে আফ্রিকার সোমালিয়া উপকূল সংলগ্ন এলাকায় সংখ্যার দিক দিয়ে জলদস্যুতার হার নিম্নমুখী হলেও এই অবস্থা বজায় রাখতে ব্যয়কৃত বিপুল অর্থ সাফল্যের সমানুপাতিক কিনা তা বিশেষ চিন্তার দাবি রাখে। আন্তর্জাতিক সমুদ্রবিষয়ক পর্যবেক্ষক সংস্থা Oceans Beyond Piracy (OBP) এর ২০১৬ বার্ষিক মূল্যায়ন অনুযায়ী 'জলদস্যুতা বা সমুদ্রে ডাকাতির ঘটনা বর্তমানে নিয়ন্ত্রণে আছে কিন্তু এর স্থায়ী সমাধান হয়নি। একটি টেকসই আঞ্চলিক আর্থ-সামাজিক কাঠামোর অবর্তমানে বারবার আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে এ অঞ্চলে একইভাবে জলদস্যুতা দমনে রত থাকতে হবে'। OBP এর ২০১৪ সালে প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী শুধুমাত্র সোমালিয়া উপকূলে জলদস্যুতা দমন অভিযানে বার্ষিক মোট ব্যয় করা হয়েছিল ১.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। সুস্পষ্টভাবেই পরিস্থিতি যথেষ্ট আশাব্যঞ্জক নয় এবং এই সব কার্যক্রমের ব্যয়ভার ফলতঃ অলাভজনক প্রতিপন্ন হওয়ার পথে।

সমুদ্র বিষয়ক সন্ত্রাসবাদ (Maritime Terrorism)

এই অঞ্চলের বিগত দেড় দশকের ঘটনাপ্রবাহ মূলত সন্ত্রাসী হামলার সম্ভাবনাকে ক্রমান্বয়ে একটি অপ্রিয় বাস্তবতায় পরিণত করেছে। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক গবেষণা সংস্থা **RAND** এর সন্ত্রাসবাদ বিষয়ক উপাত্ত অনুযায়ী বিগত দশকে বিশ্বজুড়ে ঘটে যাওয়া মোট সমুদ্র সন্ত্রাসের ঘটনার সংখ্যা ১৩৬টি। যদিও মোট সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সংখ্যার তুলনায় এটি অনেক কম কিন্তু সমুদ্রে সংঘটিত সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের অর্থনৈতিক তাৎপর্য এবং বিশ্ববাণিজ্যে এর প্রভাব আপেক্ষিকভাবে বিশেষ গুরুত্ববহ।



চিত্র-৩ঃ বিগত দশকের আঞ্চলিক সমুদ্র ভিত্তিক সন্ত্রাসের ঘটনাসমূহ

২০০০ সালের পর থেকে এই অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য কিছু সমুদ্রভিত্তিক সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটেছে। এর প্রথমটি ছিল ২০০০ সালে ইয়েমেনের এডেন বন্দরে মার্কিন নৌবাহিনী জাহাজ USS Cole এর উপর আল-কায়দা কর্তৃক নৌকাবাহী বিস্ফোরকের আক্রমণ। পরবর্তীসময়ে একই ধরণের কৌশল অবলম্বন করে এলটিটিই (২০০৯ হতে তাদের সন্ত্রাসের সময়কালের শেষ অবধি) শ্রীলংকার নৌবাহিনী ও নৌস্থাপনার বিরুদ্ধে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আক্রমণ পরিচালনা করে। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল ২০০৬ সাথে গল্ (Galle)

বন্দরের আক্রমণ। ২০০২ এ ফরাসি তেলবাহী জাহাজ এমটি লিমবার্গ (M T Limburg) আবার আক্রান্ত হয় ইয়েমেন উপকূলে। ২০০৪ সালে ফিলিপাইন উপকূলে সুপারফেরি-১৪ (Superfery-14) আক্রমণ করে আল-কায়েদার আদর্শপন্থী আবু সায়াফ গ্রুপ। মর্মান্তিক এই হামলায় ১১৬ জন আরোহীর প্রাণহানি ঘটে। একই গ্রুপ আবার আঘাত হানে যাত্রীবাহী জাহাজ ডন রামোন (Don Ramon) এ ২০০৫ সালে। সবশেষে, ২০১০ সালে জাপানি তৈলবাহী জাহাজ এম স্টার (M Star) সন্ত্রাসী হামলার শিকার হয় হরমুজ প্রণালী অতিক্রমকালে। এর পূর্বে ২০০৮ সালে, সমুদ্র পথ ব্যবহার করে দ্রুত পৌঁছানোর সুবিধাকে ব্যবহার করে মুম্বাই শহরে ঘটে স্মরণকালের এধরণের মর্মান্তিকতম ঘটনা। প্রাণহানি ঘটে প্রায় ২০০ জনের এবং আরও তিনশ জন আহত হয় এই ঘটনায়। এই দশকের আরও একটি প্রণিধানযোগ্য ঘটনা ছিল ২০১৩ সালে যুক্তরাজ্য সরকারের ঘোষিত ইয়েমেনী উপকূলে ব্রিটিশ পতাকাবাহী জাহাজের জন্য তৃতীয় মাত্রায় ISPS (International Ship and Port facility Security) ব্যবস্থা, যা কিনা অদ্যাবধি সর্বোচ্চ সর্তকাবস্থা ব্যবহারের দৃষ্টান্ত।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ

দু:খজনক হলেও সত্য যে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের লীলাভূমি এই ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চল। বিশ্বের প্রায় ৭০ ভাগ প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটে এই অঞ্চলে যার মধ্যে রয়েছে ঘূর্ণিঝড়, খরা, সুনামি, ভূমিকম্প প্রভৃতির মতো বিপর্যয়কারী ঘটনা। আন্তর্জাতিক মধ্যস্থতা ও সার্বভৌমত্ব বিষয়ক কমিশনের (ICISS) মতে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মানব নিরাপত্তার (Human Security) প্রধান তিনটি প্রতিবন্ধকতার একটি। কেননা, একটি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে বহু বছরের আর্থ-সামাজিক প্রবৃদ্ধি ও অর্জন নিমিষেই বিলুপ্ত হয়ে পড়ে এবং এর ঝুঁকি বিস্তৃত হয় রাজনৈতিক সীমানা ছাড়িয়ে। ফলতঃ এটি বৈশ্বিক বা নিদেনপক্ষে আঞ্চলিক সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। উল্লেখ্য, বিগত ২০০৪ সালের ভারত মহাসাগরীয় সুনামির পর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় ব্যয় ছিল প্রায় ১ বিলিয়ন ডলার। এর সাথে উপদ্রুত রাষ্ট্রগুলির পুনর্গঠন ব্যয় ও পড়ন্ত জিডিপির প্রভাব যোগ দিলে এটি আরও আশংকাজনক মাত্রায় রূপ নেবে। পরিশেষে এটি বলা যায় যে, পুনর্বাসন ক্ষমতা এবং পুনর্গঠন প্রক্রিয়ার সামর্থ বিবেচনায় এই অঞ্চলের সার্বিক নিরাপত্তা সংস্থাপনায় বিশেষ ঝুঁকি সার্বক্ষণিকভাবে বিরাজমান।

তথ্য ও যোগাযোগ অবকাঠামো

ভারত মহাসাগরীয় এলাকায় রাষ্ট্রগুলির মাঝে বৈপরীত্যের তালিকা অন্তহীন। রাজনৈতিক মতাদর্শ, ধর্ম, সংস্কৃতি এমনি বহু বিষয়ে অমিলের কারণে এখানে সর্বজনীন কোনো মূল্যবোধ বা অবকাঠামো বিনির্মাণ অত্যন্ত দুরূহ। এই বৈচিত্রময় জাতিসত্তাগুলিকে একটি নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বাসযোগ্য সাধারণ যোগাযোগ ব্যবস্থার আওতায় আনার প্রচেষ্টায় IONS বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। IONS মূলনীতি অনুযায়ী (প্রাতিষ্ঠানিকভাবে), সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে উন্মুক্ত ও বিশুদ্ধ যোগাযোগ ও আলোচনার একটি মঞ্চ, যেটি পারস্পরিক নির্ভরশীলতার ভিত্তিতে আঞ্চলিক সমুদ্রবিষয়ক নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নতির জন্য প্রচেষ্টারত। এরূপ একটি উদ্যোগের বাস্তবমুখিতা ও কার্যকারিতা বস্তুত, সদস্য দেশগুলির পারস্পরিক যোগাযোগের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। পারস্পরিক সম্পর্কোন্নয়নের পাশাপাশি একটি কার্যকরী ইলেক্ট্রনিক ও সাইবার নির্ভর যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রণয়নকল্পে Information Sharing and Interoperablity (IWG) কাজ করে চলেছে। এই IWG টি একটি সমুদ্র সম্পর্কিত তথ্য বিনিময় নির্দেশিকা (Maritime Information Exchange Directory) প্রস্তুতির পাশাপাশি এই বিষয়ে আরও গঠনমূলক ও বাস্তবসম্মত কার্যব্যবস্থা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে নিবেদিত।





ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ভূ-রাজনৈতিক তাৎপর্য এবং IONS পরিপ্রেক্ষিত

এই অঞ্চলের ভূ-রাজনৈতিক তাৎপর্যের শেকড় সন্ধান করা যেতে পারে ব্রিটিশ ভূরাজনৈতিক এবং রাজনীতিবিদ হালফোর্ড ম্যাকিন্ডারের সুপ্রসিদ্ধ Heartland তত্ত্বে। যেখানে এই অঞ্চলকে Inner Crescent বা মধ্যবর্তী চন্দ্রাকৃতি এলাকা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। ম্যাকিন্ডার বিশ্বাস করতেন, এই অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণকারী রাষ্ট্রশক্তি মূলত বিশ্বের রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করবে। উনবিংশ শতকের পুরোভাগে এই ভাবধারার সুস্পষ্ট প্রকাশ দেখা যায় তৎকালীন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির উপনিবেশিক প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে। এই ভবিষ্যৎবাণী বর্তমান ভূ-রাজনৈতিক ও ভূ-অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে একটুও অতিরঞ্জিত মনে হয় না। মার্কিন লেখক রবার্ট ডি কাপলান লিখেছেন, 'ভারত মহাসাগরের মানচিত্র একবিংশ শতকের পরাশক্তিগুলির ক্ষমতার রাজনীতির অবয়বকেই চিত্রিত করে'। এটি অতিকথন নয় বরং বাস্তবতা। ভারত মহাসাগরীয় জার্নালের তথ্য অনুযায়ী বিশ্বের সমস্ত পেট্রোলিয়াম জ্বালানির মোট ৮০% চলাচল করে এই সমুদ্র দিয়ে, ৪০% যায় হরমুজ প্রণালী দিয়ে, ৩৫% যায় মালাক্কা প্রণালী দিয়ে আর ৮% যায় বাব এল্-মান্দাব প্রণালী দিয়ে।

সংশ্লিষ্টতার গোড়া থেকেই IONS এর কর্মপন্থা নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছে। এরই ফলশ্রুতিতে IONS এর মূল সনদে (Charter of Business) অনাঞ্চলিক রাষ্ট্রগুলির পর্যবেক্ষক সদস্য হিসাবে IONS এ অন্তর্ভূক্তির বিষয়টিকে বিবেচনা করা হয়েছে। উক্ত সনদ অনুযায়ী, কোনো রাষ্ট্রের ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে নিয়ন্ত্রণাধীন ভূখণ্ড না থাকলেও, গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় স্বার্থ বিবেচনায়, উক্ত রাষ্ট্র পর্যবেক্ষক সদস্য পদের জন্য IONS এর সভাপতি বরাবরে আবেদন করতে পারবে। পরবর্তীতে IONS এর নীতি নির্ধারণী সভা, কনক্লেভ অব চীফস্ এর মাধ্যমে সকলের মতামতের প্রেক্ষিতে উক্ত রাষ্ট্রের পর্যবেক্ষক সদস্যপদ প্রাপ্তি সম্ভব হবে। এই ধারা বা নিয়মটির ক্ষেত্রে দুটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। প্রথমত, আবেদনকারী রাষ্ট্রকে তার নিজের স্বার্থসংশ্লিষ্টতা নিজেকেই বিবেচনা করতে হবে, অর্থাৎ বিষয়টি স্বতঃস্ফূর্ত হতে হবে। দ্বিতীয়ত, IONS এর সদস্য রাষ্ট্রসমূহকে এই অন্তর্ভূক্তির বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত হতে হবে। এই দ্বিপাক্ষিক সিদ্ধান্ত নির্ভর প্রক্রিয়া বহিঃআঞ্চলিক রাষ্ট্রগুলির সাথে IONS এর গোষ্ঠীগত আচরণকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে।

আন্তর্জাতিক ভাবে IONS এর গ্রহণযোগ্যতার পরিমাপক হিসেবে বিভিন্ন অনাঞ্চলিক রাষ্ট্রের আগ্রহ প্রকাশকে দেখা যেতে পারে। ভারত মহাসাগরীয় এই নিরাপত্তা সংশ্লেষটির গ্রহণযোগ্যতা বা সফলতার বিচারে এটি বিশেষ গুরুত্ববহ। পাশাপাশি এই আন্তর্জাতিক আগ্রহ IONS এর শুরু থেকেই নীতিনির্ধারণী বিষয়ে পরোক্ষভাবে নানা ভূমিকা রেখেছে। অপরপক্ষে বহিঃআঞ্চলিক স্বার্থসংশ্লিষ্টতার মূল কারণ নিহিত ছিল ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ক্রমবর্ধমান ভূ-রাজনৈতিক তাৎপর্যে। পূর্বে বর্ণিত ভূরাজনৈতিক পণ্ডিতদের ভবিষ্যতবাণী যেন এই টানাপোড়ণের মধ্য দিয়ে বর্তমান সময়ে বাস্তব হয়ে উঠছে।

IONS ২০১৬ : বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সাফল্য ও সম্ভাবনা

IONS এর পথচলার শুরু থেকেই বাংলাদেশ নৌবাহিনী অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছে। এই সংগঠনটির কার্যক্রমের সুফল লাভের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগের প্রতিফলন ঘটিয়ে বাংলাদেশ নৌবাহিনী ০৪ জুলাই ২০১৪ আনুষ্ঠানিকভাবে মূল সনদ অনুমোদনের মাধ্যমে সক্রিয় সদস্য হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। একই সময়ে বাংলাদেশ নৌবাহিনী ২০১৬ এর সম্মেলনের আয়োজক এবং ২০১৬-১৮ সালের জন্য IONS এর সভাপতির দায়িত্ব পালনের জন্য সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হয়। এটি বাংলাদেশ নৌবাহিনী তথা বাংলাদেশের জন্য নিঃসন্দেহে একটি গৌরবময় ও তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়। এরই

ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ নৌবাহিনী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আন্তরিক পৃষ্ঠপোষকতায় মে ২০১৪ এ IONS সচিবালয় স্থাপন করে এবং ২০১৬ এর অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি আরম্ভ করে।

ইতোমধ্যে বাংলাদেশ নৌবাহিনী IONS এর সবগুলো ওয়ার্কিং গ্রুপে সদস্য হিসাবে অংশগ্রহণ করে এবং উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হয়। এছাড়াও IONS এর বিভিন্ন প্রকাশনা, রচনা প্রতিযোগিতা ইত্যাদি বুদ্ধিবৃত্তিক বিষয়ে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর পদচারণা ছিল সফল। পরিশেষে, গত জানুয়ারি ২০১৬ এ IONS এর পঞ্চম দ্বিবার্ষিক সম্মেলন আয়োজনের মধ্য দিয়ে IONS এ বাংলাদেশের সভাপতিত্বের সূচনা হয়। এই আয়োজনে ব্যাপক সাংগঠনিক দায়িত্ব সফলভাবে পালনের মাধ্যমে বাংলাদেশ নৌবাহিনী অভ্যাগত সকল দেশি বিদেশি অতিথিদের ভূয়সী প্রশংসা লাভ করে। এ ছাড়াও এই সম্মেলনের সার্বিক প্রাপ্তির তালিকায় বাংলাদেশ নৌবাহিনীর অবদান আরও কিছু বিষয়ে উল্লেখযোগ্য।





চিত্র-৭: বর্তমান IONS চেয়ারম্যান ও বাংলাদেশ নৌবাহিনী প্রধান। পার্শ্বে IONS ২০১৬ এর অভ্যাগত অতিথিবৃন্দের সাথে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি

IONS ২০১৬ সেমিনার আয়োজনে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সাফল্য: সম্মেলনের সর্ববৃহৎ পরিসরের এবং মুখ্য আনুষ্ঠানিকতা ছিল প্রথম দুই দিনে অনুষ্ঠিত সেমিনারকে ঘিরে। এটির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব এম আব্দুল হামিদ উপস্থিত ছিলেন। এই সেমিনারের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল 'ভারত মহাসাগরীয় এলাকায় পারস্পরিক সহযোগিতা সম্পর্কের উন্নয়নের পথরেখা নির্ধারণ'। মূলত এই অঞ্চলের উপকূলীয় রাষ্ট্রগুলোর সমুদ্র বিষয়ে সাধারণ নিরাপত্তা সমস্যাগুলির সহযোগিতামূলক সমাধানের পথ খোঁজাই ছিল এই আয়োজনের লক্ষ্য। এতে পাঁচটি সুনির্দিষ্ট বিষয়ে প্রখ্যাত বিশেষজ্ঞ বক্তাগণ তাদের বক্তব্য রাখেন। বিষয়গুলি ছিল, ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ভূ-রাজনৈতিক ও ভূ-অর্থনৈতিক গুরুত্ব, সাধারণ সমুদ্র নিরাপত্তা, মানবিক সহযোগিতা ও ত্রাণ বিতরণ (HADR), সমুদ্রবিষয়ে আঞ্চলিক সহযোগিতার সম্ভাবনা এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনা। এই দুইদিনের সেমিনারের মধ্য দিয়ে IONS রাষ্ট্রগুলির সমন্বিত সমস্যা, নিরাপত্তা ভাবনা এবং ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার বিষয়ে দিকনির্দেশনা অত্যন্ত সম্যকভাবে পরিস্ফুট হয়েছে। এটি নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, সমুদ্র নিরাপত্তা বিষয়ে এই অঞ্চলের ভবিষ্যত কর্মপন্থা প্রণয়নে ও বাস্তবায়নের পথে বাংলাদেশ নৌবাহিনী আয়োজিত এই সেমিনারের বিভিন্ন আলোচ্য ও শিক্ষণীয় বিষয় ভবিষ্যতে বিশেষ অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

IONS নৌপ্রধানগণের সম্মেলন (IONS Conclave of Chiefs) ২০১৬ এর উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ: বাংলাদেশ নৌবাহিনীর নেতৃত্বে ২০১৬ এর কনক্লেভ আঞ্চলিক নিরাপত্তা সম্পর্কোন্নয়নে বিশেষ কার্যকরী ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সভাপতিত্বে এটির সফল কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে এই অঞ্চলের সমুদ্রবিষয়ক নিরাপত্তা ব্যবস্থায় বাংলাদেশের অবস্থান হয়েছে আরও সুদৃঢ়। এবারের সম্মেলনে পূর্ব নির্ধারিত নানা নীতিনির্ধারণী বিষয় ছাড়াও তাৎক্ষণিক বিভিন্ন বিষয়ে তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা অত্যন্ত ফলপ্রসূভাবে সম্পন্ন করা হয়। সভায় বাংলাদেশ নৌবাহিনীর কিছু উল্লেখযোগ্য প্রাপ্তির বিবরণ দেয়া যেতে পারে।



IONS এর মূল সনদ (IONS Charter of Business): মূল সনদটি ২০১৪ এ কার্যকরী হওয়ার পর থেকে গত দুই বছর বিভিন্ন সদস্যরাষ্ট্র এটিতে বিভিন্ন গৌণ অসঙ্গতি লক্ষ্য করে এবং পরিমার্জনের প্রয়োজন বোধ করে। ফলতঃ এবারের সভায় এ সকল প্রস্তাবিত সংশোধনী নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে এটির দ্বিতীয় সংস্করণ ইতিমধ্যে বাংলাদেশ নৌবাহিনী IONS সচিবালয় হতে প্রকাশ করা হয়েছে। সংশোধিত বিষয়গুলির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ছিল সদস্যপদ লাভের জন্য ১২ মাস সময়সীমার ধারাটি রহিত করা। পূর্বের নিয়মানুযায়ী সনদ কার্যকরী হবার ১২ মাসের মধ্যে যে সকল রাষ্ট্র আনুষ্ঠানিক সম্মতি জ্ঞাপন করবে তাদেরই সদস্য পদ লাভ করার কথা ছিল। কিন্তু এতে বিভিন্ন কারণে বাদ পড়ে যাওয়া আঞ্চলিক রাষ্ট্রগুলির জন্য এবার IONS এর দ্বার উন্মুক্ত হলো। একই প্রথা আঞ্চলিক পর্যবেক্ষক রাষ্ট্রগুলির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। এই সংশোধনের কার্যকারিতার দৃষ্টান্তস্বরূপ তাৎক্ষণিকভাবে কেনিয়ার সদস্যপদ অনুমোদন করা হয়।

সভাপতি পরিবর্তনের পদ্ধতি: পূর্বে IONS এর সভাপতিত্বের পরিবর্তনের ধারার কোন প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি ছিল না। এবারের সভায় বাংলাদেশ নৌবাহিনীর উদ্যোগে ও প্রস্তাবনায় বৃহত্তর ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলকে চারটি ভৌগোলিক উপ-অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়। এগুলি হল দক্ষিণ এশীয়, পশ্চিম আফ্রিকীয়, পশ্চিম এশীয় (মধ্যপ্রাচ্য) এবং দক্ষিণ পূর্ব এশীয় ও অস্ট্রেলিয় রাষ্ট্রসমূহ। এখন হতে এই চারটি উপ-অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলির মধ্য থেকে ধারাবাহিক ভাবে সভাপতি নির্বাচনের মধ্য দিয়ে সব সদস্যের সুষম উপস্থাপন ও অধিকার নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। এর ফলে অপেক্ষাকৃত উন্নত বা শক্তিশালী দেশগুলির আধিপত্য বিস্তারের সুযোগ রহিত হবে এবং সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে। বাংলাদেশ নৌবাহিনীর এই উদ্যোগ সকলের ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করে।

পর্যবেক্ষক সদস্যপদ: এই সভায় IONS এর পর্যবেক্ষক সদস্য পদের জন্য মোট ছয়টি প্রার্থিতা আলোচিত হয় এবং তন্মধ্যে তিনটি রাষ্ট্রের বিষয়ে উপস্থিত সকল সদস্য একমত পোষণের মাধ্যমে IONS এ নতুন পর্যবেক্ষক সদস্য হিসেবে রাশিয়া, স্পেন ও জার্মানি অন্তর্ভুক্ত হয়। পরবর্তীতে আরও দুটি দেশ ইতালি ও নেদারল্যান্ডকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রার্থিতার আবেদন এই সভায় অনুমোদিত হয়নি। ফলাফল হিসাবে এখন IONS এর পর্যবেক্ষক সদস্য রাষ্ট্রের সংখ্যা দাঁড়াল মোট ০৯টি।

IONS তথ্য, যোগাযোগ ও প্রকাশনা: বিভিন্ন IONS প্রকাশনা, ওয়েবসাইট পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ IONS বার্ষিক রচনা প্রতিযোগিতা প্রভৃতি বিষয়ে এই সভায় আলোকপাত করা হয়। ফলতঃ ভবিষ্যতে বিভিন্ন শিক্ষামূলক ও বুদ্ধিবৃত্তিক কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব বাংলাদেশ নৌবাহিনীর তত্ত্বাবধানে পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এর পাশাপাশি IONS এর ওয়েব পোর্টালটির ব্যবস্থাপনা ভারত ও বাংলাদেশের দুটি পৃথক ওয়েব সাইটের মাধ্যমে চালু রাখার বিষয়েও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আগ্রহী পাঠকগণ ions.mil.navy.bd এই ঠিকানায় উল্লেখিত ওয়েব সাইটটি হতে বিভিন্ন তথ্যাদি জানতে পারবেন।

IONS ওয়ার্কিং গ্রুপের (IWG) কার্যক্রম: IONS ওয়ার্কিং গ্রুপগুলি মূলত IONS এর সামষ্টিক প্রচেষ্টার মূল ধারক ও বাহক। সমন্বিত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে এই IWG গুলি আঞ্চলিক সমুদ্রবিষয়ক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বুদ্ধিবৃত্তিক, নীতি নির্ধারণী ও আনুষঙ্গিক নানা বিষয়ে অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে। এবারের কনক্লেভে তিনটি পূর্ব নির্ধারিত ওয়ার্কিং গ্রুপ মানবিক সহযোগিতা ও ত্রাণ বিতরণ (HADR), সামুদ্রিক জলদস্যুতা প্রতিরোধ (Counter Piracy) এবং তথ্য আদান-প্রদান ও পারস্পরিক কর্মপন্থা উন্নয়ন বিষয়ে (Information Sharing and Interoperablity) তাদের প্রতিবেদন পেশ করে। HADR সংক্রান্ত ওয়ার্কিং গ্রুপটি একটি খসড়া নির্দেশনা উপস্থাপন করে যেটি সদস্য রাষ্ট্রগুলির পর্যবেক্ষণ সাপেক্ষে চূড়ান্ত প্রকাশনার পথে রয়েছে। এটি নিঃসন্দেহে ভারত

মহাসাগরীয় রাষ্ট্রগুলির জন্য সম্মিলিতভাবে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে মানবিক সহযোগিতা ও আন্তর্জাতিক ত্রাণ তৎপরতা পরিচালনায় বহুলাংশে সহায়ক হবে। অন্য দুটি গ্রুপও একইভাবে তাদের সংশ্লিষ্ট বিষয় সংক্রান্ত নির্দেশনা প্রস্তুতির পথে অগ্রসর হচ্ছে। এছাড়াও এই IWG গুলির কর্মপরিধির মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন অনুশীলন অথবা প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা ও আয়োজনের মাধ্যমে IONS রাষ্ট্রসমূহের নৌবাহিনীগুলির আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কর্মপরিধি ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা করা। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এবারের সভায় বেশ কিছু সংখ্যক নতুন সদস্য রাষ্ট্র বিভিন্ন ওয়ার্কিং গ্রুপে নতুন সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এছাড়াও আরেকটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হল, পূর্বের জলদস্যুতা দমন (Counter Piracy) গ্রুপটির কার্যপরিধি বৃদ্ধির পাশাপাশি এটিকে নতুনভাবে সমুদ্রবিষয়ক নিরাপত্তা বা Maritime Security IWG হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে। আশা করা যায় যে, দক্ষিণ আফ্রিকা ও তানজানিয়ার যৌথ সভাপতিত্বে ১২ সদস্য রাষ্ট্রের এই ওয়ার্কিং গ্রুপটি বৃহত্তর ভারত মহাসাগরীয় এলাকার সামগ্রিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা উন্নয়নে কার্যকরী কর্মপন্থা ও ফলপ্রসূ সুপারিশ প্রদানে সক্ষম হবে। এর পাশাপাশি বিভিন্ন সদস্য রাষ্ট্র তাদের অভিজ্ঞতা, দক্ষতা ও প্রযুক্তি অন্যান্যদের সাথে ভাগ করে নেয়ার আগ্রহ দেখিয়েছে। উদাহরণ হিসেবে সিঙ্গাপুর ও ফ্রান্স তাদের পরিচালিত সমুদ্রবিষয়ক নিরাপত্তা তথ্য কেন্দ্রের (Maritime Security Information Centre) অভিজ্ঞতা অন্যান্য সদস্যদের প্রয়োজনে কাজে লাগানোর প্রস্তাব দিয়েছে। এই আলোচনার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ নৌবাহিনী IONS সচিবালয় হিসেবে এরই মধ্যে ওয়ার্কিং গ্রুপগুলির জন্য পরিমার্জিত নীতিমালার কর্মপরিধি প্রকাশ করেছে। সবকিছু মিলিয়ে ভবিষ্যতে এই ওয়ার্কিং গ্রুপগুলি বাংলাদেশ নৌবাহিনীর নেতৃত্বকালীন সময় আরও কার্যকরী অবদান রাখতে পারবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করা যায়।

কোড ফর আনপ্ল্যান্ড এনকাউন্টার অ্যাট সী (Code of Unplanned Encounters at Sea) বা CUES: গত ২০১৪ সালের এপ্রিলে চীনে অনুষ্ঠিত ওয়েস্টার্ন প্যাসিফিক নেভাল সিম্পোজিয়াম (Western Pacific Naval Symposium) সংক্ষেপে WPNS এর দ্বিবার্ষিক সভায় প্রশান্ত মহাসাগরীয় ২১টি দেশের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ও সম্মতিতে Code for Unplanned Encounters at Sea সংক্ষেপে CUES নামে একটি সনদ অনুমোদিত হয়। এটি সমুদ্রে নিয়োজিত বিভিন্ন রাষ্ট্রের নৌবাহিনীর মধ্যকার অনির্ধারিত সাক্ষাতের সময় অনভিপ্রেত উত্তেজনা নিরসনের জন্য অনুসৃত একটি ঐচ্ছিক কার্য প্রকরণ। এতে উক্ত সময়ে ব্যবহার উপযোগী জাহাজের গতিবিধি নির্দেশনা, দ্রুত যোগাযোগের সংকেত প্রভৃতি সকলের ব্যবহারের জন্য লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। বিজ্ঞ মহলের মতে, এটির ব্যবহারের ফলে দক্ষিণ চীন সাগরের মতো বিরোধপূর্ণ সমুদ্র এলাকায় সহসা সংঘাতের সম্ভাবনা বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে। এটির প্রকাশকারী সংস্থা WPNS এই প্রকাশনাটির ব্যবহার অন্যান্য নৌবাহিনীর জন্যও উন্মুক্ত রেখেছে। এবারের কনক্লেভে সর্বসম্মতিক্রমে এই প্রকাশনাটি IONS এর সদস্য রাষ্ট্রগুলির ব্যবহারের জন্য অনুমোদন দেয়া হয়। ফলে ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের নৌবাহিনীগুলি আরও নিরাপদে সমুদ্রে কার্যক্রম পরিচালনায় সক্ষম হবে।

বহুজাতিক অনুশীলন IMMSAREX (IONS Multilateral Maritime Search and Rescue Exercise): বাংলাদেশ নৌবাহিনী ২০১৬ এর কনক্লেভে প্রথমবারের মতো IONS রাষ্ট্রসমূহের অংশগ্রহণে একটি সমুদ্র অনুশীলনের প্রস্তাবনা পেশ করেছে। বাংলাদেশের সভাপতিত্বের সময় IONS এর সমুদ্রভিত্তিক ব্যবহারিক অনুশীলন কার্যক্রম শুরুর উদ্যোগ নিঃসন্দেহে কৃতিত্বের দাবি রাখে। সভায় উপস্থিত সকলেই এই উদ্যোগকে স্বাগত জানান। মূলত সমুদ্রে বিপদগ্রস্ত উড়োজাহাজ বা জাহাজের অনুসন্ধান ও উদ্ধারকে (Maritime Search and Rescue) কেন্দ্র করে এই অনুশীলনটির রূপরেখা সাজানো হয়েছে। এটির নাম প্রস্তাব করা হয়েছে IONS মাল্টিল্যাটারাল মেরিটাইম সার্চ এন্ড রেসকিউ বা সংক্ষেপে IMMSAREX। সম্প্রতি বিভিন্ন বিমান দুর্ঘটনার পরবর্তী অনুসন্ধান





প্রচেষ্টায় আন্তর্জাতিক উদ্যোগের কার্যকারিতা এই অনুশীলনকে আরও সময়োপযোগী করে তুলেছে। এই অনুশীলনটি আগামী ২০১৭ এর শেষভাগে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর তত্ত্বাবধানে IONS রাষ্ট্রসমূহের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

ভবিষ্যত নেতৃত্ব: ২০১৬ সভায় ভবিষ্যতের জন্য IONS এর বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনায় দায়িত্ব ও নেতৃত্বের পথরেখা চূড়ান্ত করা হয়েছে। ইরান এই সভায় পরবর্তী ২০১৮-২০ সালের সভাপতির দায়িত্ব পালনের বিষয়টি চূড়ান্ত করেছে এবং ২০১৮ এর মার্চ/এপ্রিলে তেহরানে IONS ২০১৮ অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা ব্যক্ত করেছে। আঞ্চলিক নিরাপত্তা সংগঠনের ভবিষ্যত নেতৃত্বে ইরানের ভূমিকার প্রতি সকল মহলের উৎসুক দৃষ্টি রয়েছে। এছাড়া ইরানের পরবর্তী সভাপতির দায়িত্বের জন্য ফ্রান্সকে এই সভায় নির্বাচিত করা হয়েছে এবং তার পরের বারের জন্য থাইল্যান্ড প্রাথমিকভাবে আগ্রহ প্রকাশ করেছে যা তেহরানে চূড়ান্ত করা হবে। নিঃসন্দেহে এই সকল নির্বাচন IONS এর বর্তমান বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সুযোগ্য নেতৃত্বের পাশাপাশি ভবিষ্যতে সফল নেতৃত্বের ধারাবাহিকতার আশ্বাস প্রদান করেছে।

উপসংহার

বর্তমান ভূ-রাজনৈতিক বাস্তবতায় একটি সহযোগিতামূলক সামুদ্রিক নিরাপত্তা সংগঠনের গঠনকাঠামো এবং কার্যকারিতা বাস্তবায়ন করা প্রশ্নাতীতভাবেই অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। বিশেষত এই ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলির চিন্তা, মনন, রাজনৈতিক দর্শন, ধর্ম ইত্যাদিতে ব্যাপক বৈপরীত্যের কারণে সাধারণ কোনো ধারণা সর্বগ্রাহ্য করে তোলা আরও দুষ্কর। এই বাঁধা পেরিয়ে IONS এর উত্থান ও সংস্থান নিঃসন্দেহে একটি যুগান্তকারী ঘটনা।

বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ব্যবস্থাপনায় ২০১৬ এ ঢাকায় সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে IONS ২০১৬ এর সম্মেলন। আমাদের জন্য আরও গুরুত্বপূর্ণ প্রাপ্তি অথবা কর্তব্যযোগ ঘটেছে এই সম্মেলনের মধ্য দিয়ে, কেননা বাংলাদেশ নৌবাহিনী আগামী দুবছর IONS এর কর্ণধার হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে। এর আগে অর্থাৎ ২০১২-১৪ সালে এই দায়িত্ব পালন করেছে অস্ট্রেলিয়া। প্রথম বিশ্বের প্রতিভূ একটি নৌবাহিনীর ঠিক পরবর্তী সময়ে দায়িত্বভার গ্রহণ বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জন্য ভিন্ন মাত্রার একটি চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করেছে। তবে এই পর্যায়ে যথেষ্ট বিনয়ের সাথে বলা যায় যে, বিগত সম্মেলনের আয়োজক হিসাবে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর পারঙ্গমতা আন্তর্জাতিক ও জাতীয় অঙ্গনে যথেষ্ট প্রশংসা লাভ করেছে। ফলশ্রুতিতে আগত বিভিন্ন নৌপ্রধান ও সমুদ্র বিষয়ক নিরাপত্তা বোদ্ধাগণ বাংলাদেশের নেতৃত্বে এই সংগঠনটির গতিশীলতা ও উন্নতির সম্ভাবনার বিষয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। দেশের ভাবমূর্তি বিশ্বের দরবারে আরও উজ্জ্বল করে তোলার প্রত্যয় নিয়েই বাংলাদেশ নৌবাহিনী IONS এর সকল কার্যক্রম পরিচালনা করে চলেছে।

তথ্যসূত্র

১। IONS কনক্লেভ অফ চীফস্ ২০১৬ এর সংক্ষেপিত নথি, তারিখ ১৩ জানুয়ারি ২০১৬, বাংলাদেশ নৌবাহিনী IONS সচিবালয় কর্তৃক প্রকাশিত।

২। আইসিসি আইএমবি জলদস্যুতা ও সমুদ্রে সশস্ত্র ডাকাতি শীর্ষক প্রতিবেদন ২০১৫, আইসিসি, লন্ডন কর্তৃক জানুয়ারি ২০১৬ এ প্রকাশিত।

৩। ReCAAP আইএসসি মাসিক প্রতিবেদন এপ্রিল ২০১৬, ReCAAP তথ্য কেন্দ্র, সিঙ্গাপুর কর্তৃক প্রকাশিত।

৪। The state of Maritime Piracy Report ২০১৪ অর্থনৈতিক ও মানবিক মূল্য শীর্ষক প্রতিবেদন, ২০১৫ এ Oceans Beyond Piracy কর্তৃক যুক্তরাষ্ট্র হতে প্রকাশিত।

৫। নিনকিক, ডোনা কে। Maritme Terriosim: How Real is the threat? অনলাইনে প্রকাশিত

fairobserver.com/region/north_america/maritime-terrorism-how-real-threat, জুলাই ২০১৬।

৬। The ISPS Code and Maritime Terriosim অনলাইন প্রকাশিত cimsec.org/isps-code-maritime-terriosim/12098, ১৫ জুলাই ২০১৪, সেন্টার ফর ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম সিকিউরিটি, মেরিল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র হতে প্রকাশিত।

৭। আলী, কমডোর মীর এরশাদ Relevance of IONS as a Cooperative Security Construct – A Critical analysis, বাংলাদেশ নৌবাহিনী জার্নাল, বিশেষ সংস্করণ IONS ২০১৬, জানুয়ারি ২০১৬, নৌসদর দপ্তর ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।

৮। চেলানী ব্রহ্মা। Worlds geopolitical center of gravity shift to Indian Ocean অনলাইন এ প্রকাশিত chellaney.net/2015/07/01/worlds-geopolitical-center-of-gravity-shift-to-indian-ocean, নিকি এশিয়ান রিভিউ, টোকিও, জাপান।

৯। সিনহা ডি কে। Factors which Affected the Geopolitics of the Indian Ocean অন লাইনে প্রকাশিত yourarticalelibrary.com/india-2/factors-which-affected-the-geopolitics-of-the-indian-cean/42453/।

১০। কাপলান, রবার্ট ডি। Centre Stage for the 21st Century অন লাইনে প্রকাশিত foreignaffairs.com/ articales/east.asia/2009-03-01/ center-stage-21st-century, ফরেন এ্যাফেয়ার্স ম্যাগাজিন, কাউন্সিল অন ফরেন রিলেশন্স, নিউয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র হতে প্রকাশিত।



কমান্ডার সারওয়াত হোসেন, (এনডি), পিএসসি, বিএন ০১ জানুয়ারি ১৯৭৭ সালে পাবনা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক অধ্যয়ন পাবনা ক্যাডেট কলেজ হতে সম্পন্ন করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি ১৯৯৫ সালে বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে যোগদান করেন এবং ১৯৯৭ সালে এক্সিকিউটিভ শাখায় কমিশন লাভ করেন। চাকুরী জীবনে সাধারণ পেশাগত প্রশিক্ষণের পাশাপাশি তিনি দেশে এবং বিদেশে বিভিন্ন কোর্স সম্পন্ন করেছেন। তন্মধ্যে ইউএস কোস্টগার্ড হতে ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম অফিসার্স কোর্স, বাংলাদেশ নেভাল একাডেমি হতে জুনিয়র স্টাফ কোর্স, ভারতীয় নৌবাহিনী হতে নেভিগেশন এন্ড ডাইরেকশন স্পেশালাইজেশন কোর্স, স্কুল অব মেরিটাইম ওয়ারফেয়ার এন্ড ট্যাকটিস হতে বেসিক অফিসার্স ওয়ারফেয়ার কোর্স উলেখযোগ্য। তিনি ডিফেন্স সার্ভিসেস কমান্ড এন্ড ষ্টাফ কলেজ, মিরপুর এবং ইউএস নেভাল ওয়ার কলেজ, রোড আইল্যান্ডের একজন স্নাতক। এছাড়াও তিনি বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ প্রফেশনালস হতে 'ডিফেন্স স্টাডিজ' বিষয়ে স্নাতোকত্তর ডিগ্রী লাভ করেছেন এবং শান্তি ও মানবাধিকার উন্নয়ন বিষয়ে স্নাতোকোত্তর ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে অধ্যয়নরত। তিনি ২০১২ সাথে লাইবেরিয়াতে জাতিসংঘ মিশনে সামরিক পর্যবেক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ নৌবাহিনী আইওএনএস সচিবালয়ে উপসচিব হিসেবে দায়িত্বরত। তিনি ব্যক্তিজীবনে বিবাহিত এবং এক কন্যা সন্তানের জনক। অবসর সময়ে তিনি আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, নিরাপত্তা এবং সামরিক ইতিহাসের বিষয়ে পড়াশোনা করেন। কমান্ডার সারওয়াত বাংলাদেশ নৌবাহিনীর বিভিন্ন জাহাজ ও স্থাপনাসমূহে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়া স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধিনে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডে চাকুরি করেছেন।



'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'-এর আলোকে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের জন্য শিক্ষণীয় কিছু বিষয়

লেঃ কর্নেল মোঃ কামরুল হাসান পিএসসি, জি, আর্টিলারী

ভূমিকা

স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা এবং বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তার অভাবনীয় আত্মত্যাগী এবং আত্মপ্রত্যয়ী নেতৃত্বে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ নামের একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। কিন্তু স্বাধীনতা অর্জনের ৪র্থ বৎসরেই এই দেশের মাটিতেই কিছু বিপথগামী ও উচ্চাভিলাসী সামরিক সদস্যের হাতে তিনি সপরিবারে শাহাদাৎবরণ করেন। বঙ্গবন্ধুর শাহাদাৎবরণের দীর্ঘ ২৯ বৎসর পরে ২০০৪ সালে তার লেখা ডায়েরি উদ্‌ঘাটিত হয় এবং তার আলোকেই 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' নামে একটি বই মুদ্রিত হয়। এই বইটিতে বঙ্গবন্ধুর বিপ্লবী রাজনৈতিক জীবনের বিভিন্ন দিক অত্যন্ত সাবলীল ভাষায় ফুটে উঠেছে। একজন মানুষ তার স্বপ্ন বাস্তবায়নে কতটা আত্মপ্রত্যয়ী ও আত্মত্যাগী হতে পারেন তা বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' বইটি না পড়লে কারো পক্ষে অনুধাবন করা সম্ভব হবে না।

সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের জীবনধারা ও কর্মপরিধি সমাজের অন্য যেকোনো পেশায় নিয়োজিত মানুষের চেয়ে অনেকাংশেই ভিন্ন। নিজ পেশাগত দায়িত্বসমূহ যথার্থভাবে এবং সফলতার সঙ্গে পালনের জন্য সশস্ত্র বাহিনীর প্রত্যেকটি সদস্যের জন্য কিছু চারিত্রিক গুণাবলি অর্জন করা অত্যন্ত আবশ্যক। সশস্ত্র বাহিনীর বিভিন্ন প্রশিক্ষণে এসকল গুণাবলি অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও প্রেরণা প্রদান করা হয়, কিন্তু কেউ এসকল গুণাবলি অর্জনে স্বেচ্ছায় আত্মনিয়োগ না করলে কোনো ভাবেই এ সকল গুণ আত্মস্থ করা সম্ভব নয়। 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' বিশ্লেষণে দেখা যায় বঙ্গবন্ধু ছিলেন এ সকল গুণাবলিসম্পন্ন মানুষের একটি আদর্শ উদাহরণ। 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' বইটিতে বিভিন্ন ঘটনাবলির মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর এসকল গুণাবলি সাবলীলভাবে ফুটে উঠেছে। এই রচনাটিতে বিশেষ কয়েকটি ঘটনা আলোচনার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর কিছু গুণাবলিকে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের অনুধাবনের নিমিত্তে উপস্থাপনের প্রয়াস নেয়া হয়েছে। আশা করা যায়, জাতির পিতার জীবনের ঘটনাবলি সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদেরকে স্বপ্রণোদিত হয়ে এসকল গুণাবলি অর্জনে উদ্বুদ্ধ করবে।

দেশপ্রেম

দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করাই সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান কাজ। আর এই কাজে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগের জন্য সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিটি সদস্যকে নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হওয়া একান্ত প্রয়োজন। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজের জীবনকে বিলিয়ে দেয়ার এক জ্বলন্ত উদাহরণ হলো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। যদিও বঙ্গবন্ধুর দেশপ্রেমের উদাহরণ হিসেবে কোনো ঘটনা উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই, তবুও বঙ্গবন্ধুর একটি উক্তি সকল দেশপ্রেমিক সামরিক সদস্যের জন্য পাথেয় হয়ে থাকতে পারে। একবার বঙ্গবন্ধু জেলে থাকা অবস্থায় অনশন শুরু করেন। এর ফলশ্রুতিতে তাঁর স্বাস্থ্যের এতই অবনতি হয় যে, যে কোনো সময় মারাত্মক কিছু ঘটে যেতে পারত। এ সময় সিভিল সার্জন এসে তাকে অনশন ভাঙার অনুরোধ করলে তিনি বলেন, "অনেক লোক আছে, কাজ পড়ে থাকবে না। দেশকে ও দেশের মানুষকে ভালবাসি, তাদের জন্যই জীবন দিতে পারলাম, এই শান্তি"।[১] উল্লেখ্য, একবার জেল থেকে ফেরত আসার পর বঙ্গবন্ধুর বাবা বঙ্গবন্ধুকে লন্ডনে আইন বিষয়ে

১ শেখ মুজিবুর রহমান, অসমাপ্ত আত্মজীবনী (ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০১২), পৃঃ ২০৪।

পড়াশোনার জন্য যাওয়ার প্রস্তাব দিলে বঙ্গবন্ধু দেশের মানুষের প্রতি দায়িত্ববোধ থেকে সে প্রস্তাব অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে ফিরিয়ে দেন।[২] সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিটি সদস্য এ ধরনের নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হতে পারলে তাদের পক্ষে দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় ও সার্বিক উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখা সম্ভব হবে।

কর্তব্যপরায়ণতা

কর্তব্যপরায়ণতা প্রতিটি মানুষের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ এবং এই শিক্ষা বঙ্গবন্ধু ছোটবেলা থেকেই পারিবারিকভাবে লাভ করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর পিতা তাকে বলেছিলেন 'Sincerity of purpose and honesty of purpose থাকলে জীবনে কখনও পরাজিত হবে না'।[৩] বঙ্গবন্ধু এ কথাটি সবসময় মনে রেখেছেন এবং জীবনের প্রতিটি কাজে এর প্রতিফলন ঘটাতে সচেষ্ট ছিলেন। সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিটি সদস্যের এ কথাটির তাৎপর্য অনুধাবন সাপেক্ষে দায়িত্ব পালনকালে এর বাস্তবায়ন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কোনো কাজের উদ্দেশ্য যদি সৎ হয় এবং তা অর্জনের জন্য কর্মস্পৃহা যদি অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে জাগরিত হয়, তাহলে সেই কাজে ব্যর্থতার সম্ভাবনা খুবই কম। আর কোনো কারণে ব্যর্থ হলেও সকলের সহানুভূতিশীল দৃষ্টি পাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। ব্যক্তিস্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে দায়িত্ব পালনকারী সদস্যগণ কখনোই সংগঠনের সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পারে না। যে কোনো দায়িত্ব পালনের সময় ব্যক্তিগত লাভের চেয়ে সংগঠনের উন্নয়নকে প্রাধান্য দেয়া (যা Honesty of purpose এর প্রতিফলন ঘটায়) সশস্ত্র বাহিনীর প্রত্যেকটি সদস্যদের একান্ত কর্তব্য। সংগঠনের প্রতিটি সদস্য যদি এই শিক্ষায় উজ্জীবিত হয়ে তাদের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে তাহলে সংগঠনের দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নের সাথে সাথে প্রতিটি সদস্যেরও সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত হবে।

সাহসিকতা

বঙ্গবন্ধুর সাহসিকতার ব্যাপারে বাঙালি জাতির সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। বঙ্গবন্ধু জীবনে জেলহাজতকে কোনো দিন ভয় পাননি। তিনি জানতেন, তিনি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তার সকল কর্মকাণ্ড জনগণের কল্যাণের জন্যই পরিচালিত। একবার থানার দারোগা বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে তাকে গ্রেফতার করতে আসছে এ খবর পেয়ে তাঁর ফুফাতো ভাই তাঁকে বললেন, "মিয়াভাই পাশের বাসায় একটু সরে যাও না"। তার এই প্রস্তাবের উত্তরে বঙ্গবন্ধু বললেন, "যাব না, আমি পালাব না। লোকে বলবে আমি ভয় পেয়েছি"।[৪] বঙ্গবন্ধু জীবনে পালানোর রাজনীতি করেননি, তাকে কখনও প্রহরী নিয়োগ করে জেলে নিয়ে যেতে হয়নি, বরং পুলিশও জানত যে, বঙ্গবন্ধুকে খবর পৌঁছে দিলেই (গ্রেফতার ওয়ারেন্ট ইস্যু সাপেক্ষে) তিনি সময়মতো থানায় চলে আসবেন। সাহসিকতা সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিটি সদস্যদের জন্য অত্যাবশ্যকীয়, কারণ রণাঙ্গনে শত্রুর সরাসরি ফায়ারের সামনে তাদেরকে নির্দ্বিধায় এগিয়ে যেতে হবে। বাঙালি বীরের জাতি, জন্মলগ্ন থেকেই এ জাতি তার প্রতিটি দাবি আন্দোলন ও যুদ্ধের মাধ্যমে আদায় করে নিয়েছে। ভাষা আন্দোলন এবং স্বাধীনতাযুদ্ধের মতো দুটি গৌরবময় ইতিহাস যে জাতির রয়েছে, সে জাতির সাহসিকতা নিয়ে নতুনভাবে আলোচনা করার প্রয়োজন নেই। তবুও জাতির এ গৌরবজ্জ্বল ইতিহাসের আলোকে নিজেকে যোগ্য করে গড়ে তোলা সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিটি সদস্যের একান্ত কর্তব্য, যাতে ভবিষ্যতেও যে কোনো দুর্যোগে সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা যায়।

---

২ Ibid, পৃঃ ১২৫।
৩ Ibid, পৃঃ ২১।
৪ Ibid, পৃঃ ১২।



সহমর্মিতা

যে কোনো সংগঠনের উন্নয়নের জন্য সংগঠনের সদস্যদের মধ্যে সহমর্মিতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ থাকা একান্ত আবশ্যক। সশস্ত্র বাহিনী এর কোনো ব্যতিক্রম নয়। সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যগণ দিনের অধিকাংশ সময় একই সাথে থাকে এবং তাদের মধ্যে সহমর্মিতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ থাকা অন্যান্য অনেক সংগঠনের চেয়ে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। সহমর্মিতার কারণে যে কোনো বিপদে কর্মী ও নেতারা বঙ্গবন্ধুর কাছেই আসতেন। একবার মওলানা ভাসানীর চিকিৎসার প্রয়োজন হলে সরকার তার কেবিন খরচ দিতে রাজি হলো না। কেবিনে থাকার জন্য প্রতিদিন প্রায় এক শত পঞ্চাশ টাকার প্রয়োজন ছিল, যা জোগাড় করা দুঃসাধ্য জেনেও বঙ্গবন্ধু তাকে কেবিনে যেতে বললেন এবং টাকার বন্দোবস্ত করতে লাগলেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে বিভিন্ন মানুষের কাছে সাহায্য চেয়ে টাকা জোগাড় করেছিলেন।[৫] একবার বঙ্গবন্ধু এবং ইয়ার মোহাম্মদ খান এক সাথে জেলে ছিলেন। হঠাৎ করে বঙ্গবন্ধুর মুক্তির আদেশ হলে ইয়ার মোহাম্মদ খানকে ভিতরে রেখে মুক্তি পেতে বঙ্গবন্ধুর প্রচণ্ড কষ্ট হচ্ছিল। তাই তিনি তাকে বললেন "হয় তোমরা মুক্তি পাবা নতুবা আবার আমি জেলে আসব"।[৬] এ সকল ঘটনা তাঁর সহযোদ্ধাদের প্রতি সহমর্মিতার বিরল দৃষ্টান্তই বহন করে।

দূরদর্শিতা

বঙ্গবন্ধু একজন অত্যন্ত দূরদর্শিতাসম্পন্ন নেতা ছিলেন। দূরদর্শিতা যে কোনো নেতৃস্থানীয় মানুষের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় গুণ। দূরদর্শিতাসম্পন্ন নেতৃত্বই সংগঠনের সামগ্রিক এবং দীর্ঘস্থায়ী কল্যাণ নিশ্চিত করতে পারে। যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে জয়লাভের পর শহীদ সোহরাওয়ার্দী আইনমন্ত্রীর দায়িত্ব নিলে বঙ্গবন্ধু কিছুটা হতাশ হয়ে পড়েন। এমতাবস্থায় বঙ্গবন্ধু তাঁর সঙ্গে দেখা করলে তিনি জানান যে, মন্ত্রিসভায় যোগদান না করলে মিলিটারিকে শাসনভার দিয়ে দেয়ার ভয় দেখিয়ে তাকে মন্ত্রিসভায় যোগদান করতে বাধ্য করা হয়েছে। একথা শুনে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, "এই ষড়যন্ত্রের রাজনীতিতে আপনার যোগদান করা উচিত হয় নাই। আপনি বুঝতে পারবেন"।[৭] পরবর্তীসময় দুই তিন দিনের ঘটনাপ্রবাহ থেকে বঙ্গবন্ধুর এই ভবিষ্যতবাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলে প্রতীয়মান হয়। এভাবে বিভিন্ন সময়ে দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়ে বঙ্গবন্ধু তখনকার অনেক প্রবীণ নেতাকে দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। প্রতিটি সশস্ত্র বাহিনীকে ভবিষ্যত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হয়। আর এজন্য প্রয়োজন ভবিষ্যত যুদ্ধের সম্ভাব্য ধরন ও প্রকৃতি সঠিকভাবে অনুধাবন করা। এজন্য সশস্ত্র বাহিনীর নেতৃত্বস্থানীয় সদস্যগণকে অবশ্যই দূরদর্শী হতে হয়, যাতে তারা ভবিষ্যৎ সংঘাতসমূহের সম্ভাব্য ধরণ ও প্রকৃতি নিরুপণ করে নিজ বাহিনীকে সেই সংঘাতসমূহে সফলতার সাথে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত করতে পারে। বঙ্গবন্ধু তার জীবনে বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃস্থানীয় বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালনকালে সুনিপুণ দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন, যা "অসমাপ্ত আত্মজীবনী" বইটিতে খুবই সাবলীলভাবে প্রকাশ পেয়েছে। তাই এ বইটি পড়লে সশস্ত্র বাহিনীর যে কোনো সদস্য দূরদর্শী হতে যথেষ্ট উৎসাহ পাবে এবং এ গুণটি অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় অনেক জ্ঞান লাভ করতে পারবে।

গ্রহণযোগ্যতা

সহকর্মীদের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করা যে কোনো মানুষের জন্য একটি বড় প্রাপ্তি। সকলেই চায় তার আশেপাশের মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করতে। বঙ্গবন্ধু সবসময়ই তার আশেপাশের সকলের কাছে গ্রহণযোগ্যতা অর্জনে সমর্থ হয়েছিলেন।

---

৫ শেখ মুজিবুর রহমান, Op Cit, পৃঃ ২১৯।
৬ Ibid, পৃঃ ২৮৫।
৭ Ibid, পৃঃ ২৮৬।

ইসলামিয়া কলেজে অধ্যয়নকালে তিনি বিনা নির্বাচনে দুই বৎসর ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক হন।[৮] কারণ তিনি সকলের কাছেই গ্রহণযোগ্য ছিলেন। একবার বঙ্গবন্ধু নৌকায় করে টুঙ্গিপাড়া যাচ্ছিলেন। যাত্রাকালে তিনি ঘুমিয়ে পড়েন এবং ঘুম থেকে জেগে তিনি জানতে পারেন যে, তাদের নৌকা ডাকাতের কবলে পড়েছিল। কিন্তু ডাকাতরা যখন জানতে পারে যে, নৌকায় বঙ্গবন্ধু আছেন তখন ডাকাতরা মাঝিকে আঘাত করে চলে যায়। আঘাত করার কারণ ছিল কেন মাঝি শুরুতেই নৌকায় বঙ্গবন্ধুর অবস্থানের কথা ডাকাতদের অবগত করেনি।[৯] বঙ্গবন্ধু যখন নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত নেন তখন তার কাছে তেমন টাকা-পয়সা ছিল না। কিন্তু তিনি যখন প্রচারণার জন্য কোনো গ্রামে যেতেন তখন জনসাধারণ শুধু তাকে ভোট দেয়ারই ওয়াদা করতেন না বরং তাকে বসিয়ে পানদানের পান এবং নজরানা হিসেবে হাদিয়া দিত।[১০] বঙ্গবন্ধু তার আশেপাশের মানুষের কাছে কতটা গ্রহণযোগ্য ছিলেন তা বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তে উল্লেখিত এ ধরণের অনেক ঘটনা থেকে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। গ্রহণযোগ্যতা অর্জনের জন্য সহযোগিতার মনোভাব থাকা এবং অন্যের জন্য নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য উৎসর্গ করার মতো সদিচ্ছা থাকা অত্যন্ত জরুরি। বঙ্গবন্ধু নিয়মিতভাবে এ সকল গুণ প্রদর্শন করেই সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছিলেন। সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যগণকেও নিজেদের পরিমণ্ডলে গ্রহণযোগ্যতা অর্জনের জন্য বঙ্গবন্ধুকে অনুসরণ করে পরোপকারী ও সহযোগিতার মনোভাব গড়ে তুলতে হবে।

নির্ভরযোগ্যতা

বঙ্গবন্ধু স্বাভাবিকভাবে সকলের নিকট অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ছিলেন। যে কোনো দুঃসাধ্য কাজ সম্পাদনের জন্য বঙ্গবন্ধুই ছিলেন সকলের নিকট একমাত্র ভরসা। একসময় মুসলিম লীগের কিছু এম এল এ টাকার বিনিময়ে অন্য রাজনৈতিক দলে যোগদানের সম্ভাবনা দেখা দিল এবং এদের মধ্যে একজন ছিলেন রংপুরের এম এল এ। এই পরিস্থিতির মাঝে এক সময় ফজলুর রহমান সাহেব বঙ্গবন্ধুকে ডাকলেন এবং বললেন, "আপনাকে এই বারটার সময় আসাম-বেঙ্গল ট্রেনে রংপুর যেতে হবে। মুসলিম লীগের একজন এম এল এ, যিনি খাঁন বাহাদুরও ছিলেন, তাঁকে নিয়ে আসতে হবে। টেলিগ্রাম করেছি, লোকও পাঠিয়েছি তবু আসছে না, আপনি না গেলে অন্য কেউই আনতে পারবে না"।[১১] এ ধরনের ঘটনা আরো অনেকবারই ঘটেছে, যা বঙ্গবন্ধুর উপর সকলের একান্ত নির্ভরযোগ্যতারই পরিচয় বহন করে। সশস্ত্র বাহিনীর সকল সদস্যের উচিত নিজ কর্মক্ষমতা ও কর্তব্যপরায়ণতা দ্বারা চারপাশের সকলের নিকট নির্ভরযোগ্য হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার চেষ্টা করা।

দক্ষ সংগঠক

সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদেরকে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন কার্যক্রম/অনুষ্ঠান আয়োজনের দায়িত্ব পালন করতে হয়। এজন্য তাদের প্রত্যেকের দক্ষ সংগঠক হওয়া আবশ্যক। বঙ্গবন্ধু ছোটবেলা থেকেই সকলের নিকট দক্ষ সংগঠক হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের সময় গোপালগঞ্জে একটি বিশাল সভা করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। বঙ্গবন্ধু স্বপ্রণোদিত হয়ে উক্ত সভার আয়োজনের দায়িত্ব নেন এবং অতি অল্প খরচে পাঁচ হাজার লোক বসতে পারে এতবড় প্যান্ডেল তৈরি করেন। প্যান্ডেল তৈরি করার জন্য তিনি নৌকার বাদাম ব্যবহার করেন।[১২] এভাবে তাকে যখনই কোনো দায়িত্ব দেয়া হত, তিনি কোনো সমস্যা না দিয়ে বরং নিজের উদ্ভাবনী শক্তিকে কাজে লাগিয়ে আন্তরিক পরিশ্রমের মাধ্যমে তা সমাধা

৮ শেখ মুজিবুর রহমান, Op Cit,পৃঃ ৩৮।
৯ Ibid, পৃঃ ১২৫।
১০ Ibid, পৃঃ ২৫৫।
১১ শেখ মুজিবুর রহমান, Op Cit, পৃঃ ৩৪।
১২ Ibid, পৃঃ ২০।



করতেন। 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তে বঙ্গবন্ধুর জীবনের এ ধরনের অনেকগুলো ঘটনা ফুটে উঠেছে যা সংগঠক হিসেবে তার দক্ষতার স্বীকৃতি বহন করে। তাই এই বইটি পড়লে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যগণ নিজেদেরকে দক্ষ সংগঠক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় অনেক জ্ঞান অর্জন করতে পারবে।

ভুল স্বীকার করার ক্ষমতা এবং সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ

কাজ করলে ভুল হয় এবং নিজ ভুল স্বীকার করে পরবর্তীতে সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ সকলেরই কর্তব্য। কিন্তু অনেকেই এ বিষয়টি অনুধাবনে ব্যর্থ হয় এবং অযথা নিজের ভুলকে চাপা দেয়ার চেষ্টা করে। এ ব্যাপারে বঙ্গবন্ধু বলেন, "আমি চিন্তা ভাবনা করে যে কাজটা করব ঠিক করি তা করেই ফেলি, যদি ভুল হয় সংশোধন করে নেই। কারণ যারা কাজ করে তাদের ভুল হতেই পারে, যারা কাজ করে না তাদের ভুলও হয় না"।[১৩] মিল্লাত প্রেস বন্ধ করার বিষয় একবার বঙ্গবন্ধু হাশিম সাহেবের সাথে বাক বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন। কিন্তু পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধু হাশিম সাহেবের কাছে যেয়ে বলেন, "আপনি মনে কিছু করবেন না। আমার এভাবে কথা বলা অন্যায় হয়েছে। আপনি যা ভাল বোঝেন তাই করুন"।[১৪] এ ঘটনা থেকে সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিটি সদস্যের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। বঙ্গবন্ধুর মতো একজন বড় নেতা যে কোনো পরিস্থিতিতে নিজ ভুল স্বীকার করে নিতে পারলে সমাজের অন্য যে কোনো মানুষের জন্য এ কাজে কুণ্ঠাবোধ করার কোনো কারণই থাকতে পারে না। সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদেরকে সারাদিনে অনেক দায়িত্ব পালন করতে হয় এবং এর মধ্যে কিছু ভুলত্রুটি হওয়াটাই স্বাভাবিক। এই ভুলত্রুটিকে চাপা না দিয়ে পরবর্তী দিনে শোধরানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করাটাই প্রত্যেকটি বিবেকবান মানুষের নিকট হতে প্রত্যাশিত। তবে এ ব্যাপারে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষেরও ভুল ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখে তা উন্নয়নের জন্য সুযোগ দেয়ার মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে। তাহলেই সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যগণ নিজ ভুল স্বীকার করে তা উন্নয়নের প্রচেষ্টা গ্রহণের জন্য অনুপ্রাণিত হবে।

তথ্যের গোপনীয়তা সম্পর্কে সচেতনতা

তথ্যের গোপনীয়তার তাৎপর্য অনুধাবন এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করা সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিটি সদস্যের জন্য আবশ্যক। বঙ্গবন্ধু এ ব্যাপারে কতটা সতর্ক ছিলেন তা তার 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' থেকে বোঝা যায়। এই বইটিতে বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনার ক্রমানুসারে বঙ্গবন্ধু জীবনের একটি মিটিং-এর কথা উল্লেখ করে বলেন, "ক্যাবিনেট আলোচনা শুরু হলো। অনেক বিষয়ে আলোচনা হয়, সে কথা আমার পক্ষে বলা উচিত না। কারণ ক্যাবিনেট মিটিংয়ের খবর বাইরে বলা উচিত না"।[১৫] এই ডায়েরিসমূহ বঙ্গবন্ধু জেলে অবস্থানকালে লিখেছিলেন এবং এখানে ক্যাবিনেট মিটিং-এর আলোচনার বিষয়সমূহ উল্লেখ করলে কখনোই তার জবাবদিহিতার সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু তারপরেও বঙ্গবন্ধু তা করেন নাই। সংবেদনশীল তথ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বঙ্গবন্ধু কতটা সতর্ক ছিলেন, তা তাঁর এ ধরনের লেখনি থেকে সহজেই অনুমেয়। তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষার জন্য প্রতিটি তথ্যের গুরুত্ব অনুধাবন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান যুগে সামাজিক যোগাযোগ ব্যবস্থার আবির্ভাবের ফলে তথ্যের নিরাপত্তা বেশি হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। ফলশ্রুতিতে তথ্যের গোপনীয়তা সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন হওয়া সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিটি সদস্যের জন্য বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তা সত্ত্বেও ইদানীং প্রায়শঃই এ ব্যাপারে

---

১৩ Ibid, পৃঃ ৮০।
১৪ Ibid, পৃঃ ৮০।
১৫ শেখ মুজিবুর রহমান, Op Cit, পৃঃ ২৬৫।

সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের মধ্যে শিথিলতা পরিলক্ষিত হয়। দেশের নিরাপত্তা এবং সশস্ত্র বাহিনীর ভাবমূর্তিকে ক্ষুণ্ন করে এ ধরণের অনেক ছবি/তথ্য ইদানীং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেখা যায়। সশস্ত্র বাহিনীর প্রত্যেক সদস্যকে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে, যাতে তাদের যথেষ্ট জ্ঞানের অভাবে ও ভুলের কারণে কোনো সংবেদনশীল তথ্য প্রকাশিত হয়ে দেশের নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন হয়ে না পড়ে।

সামাজিকতা

সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিটি সদস্য বৃহত্তর সমাজেরই অংশ। তাই সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের সামাজিক রীতি-নীতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন এবং তা পালনে যথেষ্ট সচেষ্ট থাকা একান্ত প্রয়োজন। বঙ্গবন্ধু সামাজিক রীতি-নীতি সম্পর্কে অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। একবার চীন সফরকালে তিনি একটি বাসায় যেয়ে জানতে পারলেন বাসায় বসবাসকারী দম্পতি সদ্য বিবাহিত। তৎক্ষণাৎ সামাজিক রীতি-নীতি রক্ষার জন্য বঙ্গবন্ধু উক্ত দম্পতিকে কিছু উপহার দেয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। কিন্তু সেই মুহূর্তে বঙ্গবন্ধুর নিকট কোনো উপহার ছিল না। হঠাৎ করে বঙ্গবন্ধু তার হাতের আংটিটির দিকে নজর পড়ল এবং ভদ্র মহিলাকে সেই আংটিটি উপহার দিলেন। ভদ্র মহিলা প্রাথমিকভাবে উপহারটি নিতে না চাইলেও বঙ্গবন্ধু তাকে অনেক অনুনয় করে উপহারটি নিতে রাজি করিয়েছিলেন।[১৬] মাতৃভূমির সামাজিক রীতি-নীতি সম্পর্কে ভালো ধারণা প্রদানের জন্য বঙ্গবন্ধু নিজ হাতের আংটিটি উপহার দিতে সামান্য দ্বিধাবোধ করেননি। সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যগণ বর্তমানে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রম অথবা বিভিন্ন বৈদেশিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহনের নিমিত্তে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গমণ করে। দায়িত্ব পালনকালে তারা বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও সামাজিক রীতি-নীতি আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে উপস্থাপনের সুযোগ পায়। বিদেশে দায়িত্ব পালনকালে সশস্ত্র বাহিনীর সকল সদস্যের নিজ দেশের সংস্কৃতি ও সামাজিক রীতি-নীতি সঠিকভাবে উপস্থাপন করা উচিত। আর এজন্য তাদের দেশের সংস্কৃতি ও রীতি-নীতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন যেমনি প্রয়োজন, তেমনি দেশের সংস্কৃতির প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাবোধ থাকাও আবশ্যক। সঠিক জ্ঞান ও যথেষ্ট শ্রদ্ধাবোধই সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যগণকে বিদেশে দায়িত্ব পালনকালে নিজ দেশের সংস্কৃতি ও সামাজিক রীতি-নীতি সঠিকভাবে উপস্থাপনে উৎসাহিত করবে।

পরিবারের সদস্যদের নিজ আদর্শে উদ্বুদ্ধকরণ

যে কোনো মানুষকে জীবনে সফল হওয়ার জন্য তার পরিবারের বিশেষ করে পিতা-মাতা ও স্ত্রীর সহায়তা ও সহানুভূতি অত্যন্ত প্রয়োজন। এদিক থেকে বঙ্গবন্ধু অত্যন্ত ভাগ্যবান ছিলেন। তিনি সবসময় তাঁর পিতা ও স্ত্রীর নিকট হতে সার্বিক সহায়তা পেয়েছেন। তাকে সহায়তা করতে যেয়ে তাঁর স্ত্রী যে আত্মত্যাগ করেছেন, তা বাংলার ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। একবার থানায় দেখা করতে এসে বঙ্গবন্ধুর স্ত্রী তাঁকে বললেন, 'জেলে থাক আপত্তি নাই, তবে স্বাস্থ্যের দিকে নজর রেখ। তোমাকে দেখে আমার মন খুব খারাপ হয়ে গেছে। তোমার বোঝা উচিত আমার দুনিয়ায় কেউ নাই। ছোটবেলায় বাবা মা মারা গেছেন। আমার কেউ নাই, তোমার কিছু হলে বাঁচব কি করে'।[১৭] স্ত্রীর কাছ থেকে এরকম ভালবাসা যে কোনো মানুষের জীবনে এগিয়ে চলার জন্য অপার শক্তি যোগাতে বাধ্য। সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদেরকে তাদের পেশাগত জীবনে সফলতা অর্জন করতে হলে তাদের পরিবারকে এ ধরনের আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের পরিবারের সদস্যগণও যদি একইভাবে তাদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়, তাহলে পারিবারিক অনেক সমস্যা সমাধান অনেকটা সহজ হবে। যে কোনো সমস্যা বা চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আগেই সশস্ত্র বাহিনীর

১৬ শেখ মুজিবুর রহমান, Op Cit, পৃঃ ২৩২।
১৭ Ibid, পৃঃ ১৯১।



সদস্যগণকে তাদের পরিবারের সদস্যদেরকে সামরিক বাহিনীর রীতি-নীতি, পেশাগত প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদান করে এর জন্য প্রয়োজনীয় আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

উপসংহার

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছোটবেলা থেকেই জীবনের সকল ক্ষেত্রে সফলতার স্বাক্ষর রেখেছেন। তার জীবনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' বইটিতে সাবলীল ভাষায় তুলে ধরা হয়েছে। প্রতিটি মানুষের আত্মোন্নয়নের জন্য একজন পথিকৃৎ-এর প্রয়োজন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রতিটি বাঙালির জন্য যুগ যুগান্তরের পথিকৃৎ হয়ে থাকবেন। শুধুমাত্র স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য তিনি তার পুরো জীবন বিলিয়ে দিয়েছেন এবং বাঙালি জাতিকে একটি স্বাধীন দেশ উপহার দিয়েছেন। তাই এখন দেশকে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের দেশে পরিণত করা বাঙালি জাতির নৈতিক দায়িত্ব। বাঙালি জাতির প্রতিটি মানুষ যদি তার আদর্শে বলীয়ান হয়ে দেশ গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করে, তাহলে বাংলাদেশের জন্য বিশ্ব মানচিত্রে উন্নত রাষ্ট্র হিসেবে স্থান করে নেয়া হবে সময়ের ব্যাপার মাত্র। বঙ্গবন্ধুর মতো নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে সকলে দেশের উন্নয়নে সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করলেই বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হবে।

বর্তমানে সশস্ত্র বাহিনীর শান্তিকালীন কার্যক্রম শুধুমাত্র সেনানিবাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং দেশ গঠনের প্রতিটি অঙ্গনে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের সাবলীল অংশগ্রহণ এখন প্রাত্যহিক ঘটনা। দেশের যে কোনো দুর্যোগ এবং আপদকালীন সময়ে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদেরকে সাধারণ মানুষের পাশে পাওয়া যায়। দেশের অন্যান্য উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডেও সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের ভূমিকা সকলের কাছে প্রশংসা কুড়িয়েছে। এসকল দায়িত্ব আন্তরিকতা ও সততার সঙ্গে পালনের জন্য সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যগণের উপরে আলোচিত গুণাবলি অর্জন করা অত্যাবশ্যক। আশা করা যায় 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' বইটি পড়লে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা এ সকল গুণাবলি অর্জনে প্রয়োজনীয় উৎসাহ পাবে এবং দেশ ও জাতির সেবার লক্ষ্যে তাদের অর্জিত দায়িত্ব পালনে আরও উদ্যমী হবে।



লেঃ কর্নেল মোঃ কামরুল হাসান, পিএসসি, জি, ১১ ডিসেম্বর ১৯৯৭ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর 'কোর অব আর্টিলারি' এ কমিশন লাভ করেন। তিনি আর্টিলারি রেজিমেন্টের বিভিন্ন রেজিমেন্টাল পদে দায়িত্ব পালন ছাড়াও সদর দপ্তর ৭১ পদাতিক ব্রিগেড এ জিএসও-৩ এবং ডিজিএফআই এ জিএসও-২-এর দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ইউএন মিশন-এ UNMIL ফোর্স হেডকোয়ার্টারে স্টাফ অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ডিফেন্স সার্ভিস কমান্ড এন্ড স্টাফ কলেজ, মিরপুর এবং নেপাল আর্মি কমান্ড এন্ড স্টাফ কলেজ-এর গ্রাজুয়েট। তাছাড়া তিনি ঢাকা ইউনিভার্সিটির আইবিএ হতে এমবিএ (এক্সিকিউটিভ) ডিগ্রী এবং ত্রিভুবন ইউনিভার্সিটি, কাঠমুন্ডু হতে মাস্টার্স ইন স্ট্রাটেজিক স্টাডিজ ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি বর্তমানে সদর দপ্তর আর্টডক এ জিএসও-১ হিসেবে কর্মরত আছেন।

চতুর্থ প্রজন্মের যুদ্ধ, বৈশ্বিক সন্ত্রাসবাদ এবং সশস্ত্র বাহিনীর প্রস্তুতি

লেঃ কর্নেল আবু রুবেল মোঃ শাহাবুদ্দিন এএফডব্লিউসি, পিএসসি, জি, আর্টিলারি

ভূমিকা

'শান্তিতে সমরের জন্য প্রস্তুতি'– চিরাচরিত এই সামরিক স্লোগানটি ভবিষ্যৎ যুদ্ধের ধাঁচ আন্দাজ করে তার জন্য নিরন্তর প্রস্তুতি নেবার কথা বলে। জার্মান জেনারেল ফ্রাঙ্ক ওয়ালটার বলেছিলেন, "যারা গত দিনের যুদ্ধটি হতে শেখে না তারা নিশ্চিত আগামীদিনের যুদ্ধটিতে পরাজিত হবে।" সামরিক ইতিহাসবেত্তাদের হিসেবে যুদ্ধের ধারা বিচারে তিনটি প্রজন্ম পার হয়ে গেছে। শেষ প্রজন্মটি অর্থাৎ তৃতীয় প্রজন্মের যুদ্ধের শুরু হয়েছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মধ্যভাগে– অর্থাৎ ১৯১৮ সনে। প্রায় শত বৎসর পর আর একটি প্রজন্মের যুদ্ধের ছায়ায় বদলে যাচ্ছে বিশ্বের সকল প্রান্তের মানুষের জীবনযাত্রা। এটি চতুর্থ প্রজন্মের যুদ্ধ। বিশ্বযুদ্ধের মতো ভয়াবহ আর ধ্বংসাত্মক না হলেও এর প্রভাব বিশ্ববাসীকে ভারাক্রান্ত করার সামর্থ রাখে। আর এর ব্যাপকতা বিশ্বযুদ্ধের চেয়েও বেশি- অর্থাৎ ইউরোপ, আমেরিকা, এশিয়া, আফ্রিকা সর্বত্রই। রাষ্ট্রযন্ত্রের অকার্যকারিতা প্রমাণ করতে এই প্রজন্মের যুদ্ধ ব্যক্তি নিরাপত্তার মৌলিক অধিকারে আঘাত হানছে। ব্যক্তি নিরাপত্তাকে নাজুক করে রাষ্ট্র নিরাপত্তার গ্রহণযোগ্যতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করাটাই চতুর্থ প্রজন্মের যুদ্ধের লক্ষ্য। আর এই যুদ্ধের বড় কুশলীবরা হচ্ছে বিশ্বময় ছড়িয়ে থাকা সন্ত্রাসীরা।

বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় যুদ্ধ ঘোষণার ক্ষমতা কেবল স্বীকৃত রাষ্ট্রেরই রয়েছে। রাষ্ট্রব্যবস্থা এমনই, যার একটি সুচিহ্নিত ভূমি আছে। যার সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য একটি সামরিক শক্তি আছে যারা রাষ্ট্রযন্ত্র দ্বারা যুদ্ধ করার কাজে পরিচালিত। সন্ত্রাসবাদ রাষ্ট্রের এই ব্যবস্থাগুলোকেই চ্যালেঞ্জ করছে। তারা যুদ্ধের ব্যাপারে রাষ্ট্রের একক ক্ষমতাকে অস্বীকার করছে অথচ তাদের কোনো সুনির্দিষ্ট সামরিক বাহিনী নেই। তারা রাষ্ট্রের সীমানাকে অস্বীকার করছে অথচ তাদের কোনো সুনির্দিষ্ট সীমানা দখলের চিন্তা নেই। তারা ভিন্ন কিছু মতবাদ প্রতিষ্ঠা করতে চায়। আর রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রসমূহের রাজনৈতিক নেতৃত্বকে বোঝাতে চায় যে, রাষ্ট্রের অভীষ্ট রাজনৈতিক ও সামরিক লক্ষ্য অর্জন কখনোই সম্ভব নয় অথবা সেটা অর্জনে তাদের বড় মূল্য দিতে হবে যা জনগণ সরাসরি মেনে নেবে না। তারা রাষ্ট্রের ভরকেন্দ্রকে (Centre of Gravity) সামরিকভাবে নয় বরং পরোক্ষভাবে আক্রমণ করতে চায়। তারা চায় রাষ্ট্রযন্ত্রের ক্রমাগত রক্তক্ষরণ, অর্থনৈতিক কার্যকারিতা বাধাগ্রস্থ করে জনগণের আস্থা নষ্ট করত। আর এর জন্য সামনাসামনি যুদ্ধ তারা কখনোই করে না। কারণ এ যুদ্ধটি সামরিক যুদ্ধ নয়, বরঞ্চ এ যুদ্ধটি একটি মতবাদ বা ভিন্ন আদর্শের যুদ্ধ।

বিগত প্রজন্মের যুদ্ধসমুহ ও চতুর্থ প্রজন্মের যুদ্ধের উন্মেষ

যুদ্ধ একটি স্বীকৃত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা যা রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে রাষ্ট্রের দাবী বা অধিকার আদায়ে অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। প্রথম প্রজন্মের যুদ্ধে এই ধারণাটি স্বীকৃত রূপ নেয়। সঠিক নেতৃত্ব আর শৃঙ্খলার মাধ্যমে সুনিয়ন্ত্রিত সামরিক বাহিনী দ্বারা রাষ্ট্রের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন ছিল প্রথম প্রজন্মের যুদ্ধের ধারণা। যুদ্ধরত প্রতিপক্ষের সারিবদ্ধ যোদ্ধারা কর্মকর্তার নেতৃত্বে নির্দিষ্ট যুদ্ধের ময়দানে মাস্কেট আর তোপ নিয়ে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ত আর খুব দ্রুতই হতাহতের সংখ্যা নিরূপণের মাধ্যমে



(Attrition) যুদ্ধের ফলাফল নির্ধারিত হত। দ্বিতীয় প্রজন্মের যুদ্ধেও রাষ্ট্র পরিচালিত বিশাল সেনাবাহিনী সুনিয়ন্ত্রিতভাবে কর্মকর্তাদের অধীনে যুদ্ধ পরিচালনা করত, এ যুদ্ধে শুধু প্রযুক্তির উন্নয়নের সমন্বয় ঘটলো পরোক্ষ কামান সহায়তা আর দ্রুত সামরিক যোগাযোগের। মেশিনগান, রাইফেল, যুদ্ধবিমান, ট্যাংক প্রভৃতির জন্য যুদ্ধ আর নির্ধারিত গন্ডিতে সীমাবদ্ধ রইল না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে কামান, মেশিনগান আর অন্যান্য বিধ্বংসী অস্ত্রের হাত থেকে রক্ষা পেতে উদ্ভাবিত মরীচা-যুদ্ধের (Trench Warfare) জন্য দ্বিতীয় প্রজন্মের যুদ্ধ থমকে গেল, ব্যাপক স্থবিরতা দেখা দিল যুদ্ধের ময়দানে। হতাহতের সংখ্যা হলো অপরিমেয়। আর সে অভিজ্ঞতাকে ঝালিয়ে নিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আবির্ভূত হলো তৃতীয় প্রজন্মের যুদ্ধ যার মূলমন্ত্র ছিল সামনাসামনি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ এড়িয়ে শত্রুর পেছনে মূল লক্ষ্যবস্তু বা ভরকেন্দ্রে বিধ্বংসী ফায়ার ও অন্যান্য সামরিক শক্তি দ্বারা আঘাত হেনে দ্রুত লক্ষ অর্জন করা (Indirect Approach)।

তৃতীয় প্রজন্মের এই যুদ্ধ চলছিল স্নায়ুযুদ্ধের শেষ সময় পর্যন্ত; দু'-একটা গেরিলা যুদ্ধ বাদে প্রায় সকল বড় যুদ্ধই ছিল এ ধারার। বড় বড় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর বিলোপের পর আর স্নায়ুযুদ্ধ শেষে সন্ত্রাসবাদের উন্মেষ নিয়ে অনেক তত্ত্ব রয়েছে। তবে এটা সত্য যে, চতুর্থ প্রজন্মের যুদ্ধে সন্ত্রাসবাদীরা রাষ্ট্রের সুনিয়ন্ত্রিত শক্তিশালী সামরিক বাহিনীর ট্যাংক, কামান, বিমানবহরের সাথে যুদ্ধ করে টিকতে না পেরে নতুন আঙ্গিকে কিছু সনাতন কৌশলের আশ্রয় নিল। অরাষ্ট্রীক শক্তিগুলো (Non State Actors) তখন বেছে নিল অপপ্রচার, মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ, গুপ্তহত্যা, আতংকবাদ, সামাজিক এবং ধর্মীয় বিভাজনকে। চতুর্থ প্রজন্মের যুদ্ধে সরাসরি প্রতিপক্ষ রাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীর সাথে রাষ্ট্র পরিচালিত যুদ্ধের নীতি আর রইল না। যুদ্ধ ও সীমাবদ্ধ রইল না কোনো ভৌগোলিক সীমানায়। বিতর্কিত মতবাদের কারণে সন্ত্রাসবাদ শেকড় গাঁথা শুরু করল অরক্ষিত ব্যবস্থায় সমাজ ব্যবস্থা বৈশ্বীকরণের এ যুগে পৃথিবী যেমন একটি উন্মুক্ত ভূমি, মানুষ যেমন এক বাধাহীন, ভৌগোলিক সীমাহীন প্রাণী, তেমনিভাবে সন্ত্রাসবাদও ছড়িয়ে পড়ল গোত্র, রাষ্ট্রের সীমানা পেরিয়ে সর্বত্র।

চতুর্থ প্রজন্মের যুদ্ধের স্বরূপ

বৈশ্বিক ব্যপ্তি ও প্রযুক্তি কেন্দ্রিক যুদ্ধ: চতুর্থ প্রজন্মের যুদ্ধের ব্যপ্তি সব স্থানে, সব সময়ে, সব পরিস্থিতিতে চলমান। এ এমনই এক যুদ্ধ যেখানে যুদ্ধ আর শান্তির মাঝে দেওয়ালটা প্রায়ই অদৃশ্য। সবখানেই অঘোষিত যুদ্ধের দামামা অথচ দৃশ্যমান যুদ্ধ নয় সবখানেই রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ কিন্তু সর্বত্রই তা অনিয়ন্ত্রিত। এ যুদ্ধে কোনো নির্দিষ্ট যুদ্ধক্ষেত্র নেই, নেই সম্মুখ যুদ্ধ বা আপাত নিরাপদ পেছন এলাকা। এখানে যোদ্ধা ও অযোদ্ধা, সামরিক ও অসামরিক এমন কোনো শ্রেণিবিভাগ নেই। সামাজিক, ধর্মীয়, কৃষ্টি, অর্থনীতি, রাজনীতি সর্বত্রই চলছে যুদ্ধ। তৃতীয় প্রজন্মের যুদ্ধ যেমন গতি পেয়েছিল আধুনিক প্রযুক্তির ছোঁয়ায়, চতুর্থ প্রজন্মের যুদ্ধও তেমনি প্রযুক্তি কেন্দ্রিক। এখানে অল্প কিছু যোদ্ধা একবিংশ শতাব্দীর প্রযুক্তি নিয়ে বিংশ শতাব্দীর এক ব্রিগেড সেনাদলের সমান ধ্বংসাত্মক কাজ করতে সক্ষম। দূরনিয়ন্ত্রণ প্রযুক্তি, নিচ্ছিদ্র যোগাযোগ ব্যবস্থা, ইন্টারনেট যোগাযোগ, কৃত্রিম ইন্টেলিজেন্স, স্যাটেলাইট যোগাযোগ ও বাস্তব চিত্র প্রদর্শন প্রভৃতি এ যুদ্ধকে আরো ধ্বংসাত্মক করে দিয়েছে। এক্ষেত্রে যুদ্ধের স্ট্রাটেজিক্যাল, অপারেশনাল এবং ট্যাকটিক্যাল যুদ্ধক্ষেত্রের ধাপগুলো আর থাকছে না। বরং সামান্য কৌশলগত আক্রমণ বড় মাপের বৈশ্বিক আঘাতের অনুভূতি দিচ্ছে।

বিভক্তি নির্ভরতা আর ব্যতিক্রমী সামরিক চিন্তাধারা: চতুর্থ প্রজন্মের যুদ্ধে সন্ত্রাসীরা আরো অভিনব কিছু পন্থা বেছে নিয়েছে। তারা প্রতিপক্ষের সামরিক

শক্তিকে বিভক্ত করে, তাদের মধ্যে আদর্শিক মতভেদ তৈরি করে সেই সামরিক শক্তির মাধ্যমে রাজনৈতিক শক্তিকে দুর্বল করছে। তারা আপাত নিরীহ দৃষ্টিকোণ থেকে বপন করছে বিভক্তিমূলক ধর্মীয় মতাদর্শ অথবা রাজনৈতিক অসন্তুষ্টি। তাদের সামরিক চিন্তা ধারণাটাও ব্যতিক্রমধর্মী। তাদের মাঝে অফিসার, সৈনিক, যোদ্ধা-অযোদ্ধা শ্রেণিবিভাগ নেই। নেই কড়াকড়ি আদেশ নিয়ন্ত্রণ আর সময়মতো আদেশমাফিক কাজ করে যাওয়ার বাধ্যবাধকতা। প্রতিপক্ষ যখন ট্যাংক, মিসাইল, গোলাবারুদ, আদেশ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রভৃতির পেছনে কোটি কোটি ডলার ব্যয় করছে, তখন সন্ত্রাসীরা শুধু ল্যাপটপ আর ক্রেডিট কার্ড দিয়ে আইডিয়া নির্ভর যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। প্রতিপক্ষ যখন বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার খরচ করে রাডার ফাঁকি দেওয়া বিমান বা জাহাজ কিনছে, তখন তারা সাধারণ একটা ট্রাক নিয়ে সব নজরদারিকে ফাঁকি দিয়ে সংবেদনশীল লক্ষ্যে হানা দিয়ে অভিষ্ট করার পাশাপাশি বিশ্বের নজর কাড়ছে। লক্ষ্য অর্জনের পাশাপাশি, এরা একটি দেশের কৃষ্টি, ধর্ম, সামাজিক মূল্যবোধ, রাজনৈতিক ঐক্য প্রভৃতিতে আঘাত হানার জন্য বেছে নিচ্ছে মাদক, ধর্মীয় উন্মাদনা, আর্থিক প্রলোভন, কুসংস্কার প্রভৃতিকে। আর এগুলো দুরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্রের চেয়ে মারাত্মক; সমগ্র মানব সমাজই যার আওতার ভিতরে।

লক্ষ্যসমূহ: চতুর্থ প্রজন্মের যুদ্ধে সামরিক বাহিনীর ক্ষতিসাধন মূল লক্ষ্য নয়। এর উদ্দেশ্য হলো নীতি নির্ধারকদের মনোবলকে আঘাত করা। সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতাকে দুর্বল করা এবং চূড়ান্তভাবে সন্ত্রাসবাদীদের অভীষ্ট ধারায় সিদ্ধান্ত আদায় করা। এদের সার্বজনীন ভাষা আতংকজনক হলেও তা এক এক পরিসরে এক এক রকম। কারো কাছে এরা দাতা ও উদ্ধারকর্তা, কারো কাছে এরা মুক্তিযোদ্ধা, করো কাছে এরা দুঃশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর অথবা কারো কাছে এরা ধর্মযোদ্ধা। কিন্তু অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য একটাই, পরিকল্পিত সন্ত্রাসবাদের মাধ্যমে সমাজ ব্যবস্থার ক্রমাগত অস্থিতিশীলতার ফাঁকে ফাঁকে দেশের স্বীকৃত রাজনৈতিক কাঠামোকে দেশের ভেতরে ও বাইরে থেকে চাপের মুখে ফেলে তাদের উদ্দেশ্য হাসিল করা। বৃহত্তর পর্যায়ে তাদের কৌশল হচ্ছে রাষ্ট্রযন্ত্রের উপর রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক চাপ প্রয়োগ করে- বিনিয়োগকে নিরুৎসাহিত করা, অর্থনৈতিক অগ্রসরতাকে থমকে দেওয়া, জনমনে ক্ষোভের সঞ্চার করা আর আতংক ছড়িয়ে নৈরাজ্যের সৃষ্টি করা। আর এ যুদ্ধের বলি হয় নিরস্ত্র সাধারণ জনগণ। এটা সরকারের উপর বড় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চাপ তৈরি করে। সরকারকে ঢেলে সাজাতে হয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা, প্রচুর অর্থ ব্যায় করতে হয় নতুন কৌশল ও সরঞ্জামের পেছনে। জনগণ ও অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান এবং বিনিয়োগকে নিশ্চিত রাখতে ক্রমাগত মনোযোগ আর অর্থ ব্যয় করতে হয়। ক্রমে রাষ্ট্রযন্ত্র হয়ে পড়ে দুর্বল আর পরনির্ভরশীল।

চতুর্থ প্রজন্মের যুদ্ধের কলাকৌশল

মিডিয়া ও প্রচারণানির্ভর যুদ্ধ: চতুর্থ প্রজন্মের যুদ্ধে একটি কৌশলকে উভয় পক্ষই সমান গুরুত্ব দেয়। সেটি হলো প্রচারণা। যে কোনো সন্ত্রাসী হামলার ক্ষয়ক্ষতি করার সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য হলো একটি বার্তা দেওয়া – 'কেউই নিরাপদ নয়'। আর সে বার্তা পৌঁছে দেবার সবচে বড় উপায় হচ্ছে গণমাধ্যমগুলো। আজকের গণমাধ্যমগুলোর ব্যাপক স্বাধীনতা এমন প্রচারকে আরো তরান্বিত করছে। প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ প্রচারের স্বার্থে খবরগুলোর সত্যতা যাচাই না করে, এর তাৎপর্য না বুঝে, সাথে সাথে হামলাগুলোর উন্মুক্ত প্রচার সন্ত্রাসীদের উদ্দেশ্যকে সার্থক করে দিচ্ছে। সন্ত্রাসী হামলার বিভীষিকাময় রক্তাক্ত দেহ, ধ্বংসস্তুপ বা নিরাপত্তা বাহিনীর সশস্ত্র চলাচল, ব্যাপক তল্লাশি, ধরপাকড় প্রভৃতির খবর জনগণকে অস্থিরতা আর





নিরাপত্তাহীনতার অনুভূতি দিচ্ছে। আর সেটাই সন্ত্রাসীদের মূল উদ্দেশ্য। গণমাধ্যম হয়ে যাচ্ছে সন্ত্রাসীদের তথ্য সংগ্রহ ও মূল্যায়নের (Feedback and Analysis) মাধ্যম। গণমাধ্যমের দায়িত্বহীন ব্যাপক প্রচারের কারণে ছোট ছোট ঘটনা গুরুত্ব পেয়ে যাচ্ছে।

আন্তর্জাতিক চাপ সৃষ্টি: রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি যখন মূল লক্ষ্য, তখন তা আদায় করার জন্য বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মহলকে প্রভাবিত করার পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে তৎপর হচ্ছে সন্ত্রাসীরা। ধরা যাক, একটি দেশে বিদেশিদের নিরাপত্তা ও বিনিয়োগের মাঝে একটি বড় সম্পর্ক বিদ্যমান। আর নিরাপত্তাহীনতা বিনিয়োগকে বাধাগ্রস্ত করবে। তারা এখানে দুইভাবে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে কাবু করতে চাইবে–সরাসরি বিদেশিদের নিরাপত্তাকে প্রশ্নবিদ্ধ করা আর বৈশ্বিক সংস্থাকে প্রভাবিত করা বা এই বার্তা দেওয়া যে বিষয়োক্ত দেশে বৈদেশিক বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ। আর এ যুদ্ধে তারা হাতিয়ার হিসেবে বেছে নেবে স্বদেশি, বিদেশি বা আঞ্চলিক সন্ত্রাসীদের, যারা আপাতদৃষ্টিতে সাধারণ জনগণ, পর্যটক, ছাত্র, ধর্ম প্রচারক প্রভৃতি। মাঝে মাঝে কিছু স্বীকৃত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, ধর্মীয় সংগঠন, রাজনৈতিক দল যাদের একটি আপাতঃ বাহ্যিক গ্রহণযোগ্যতা আছে তারাও জড়িয়ে পড়ছে সন্ত্রাসীদের চক্রে।

ইন্টারনেট নির্ভর প্রযুক্তি ও সংবেদনশীল বার্তার ব্যবহার: প্রাথমিক আন্দোলনের প্রচার ও প্রসারের জন্য ইন্টারনেট এবং মোবাইলফোনে যোগাযোগ ব্যবস্থা সন্ত্রাসীদের প্রথম পছন্দ। এরা বিভিন্ন সুরক্ষিত অ্যাপস ও সাংকেতিক ভাষা ব্যবহারে দক্ষ। এদের অসংখ্য ওয়েবসাইট থাকে, যার একটি মুছে ফেলা হলে আর একটি সক্রিয় হয়। ধরপাকড় বেড়ে গেলে, মিছিল, সমাবেশ রুখে দিলে এরা অনলাইন কনফারেন্স, ব্লগ, ফেসবুক প্রভৃতির মাধ্যমে নিজেদের যোগাযোগ ও দিকনির্দেশনা অব্যাহত রাখে। অনলাইনে শনাক্ত হওয়া এড়াতে ছদ্মনামে অথবা সাধারণ নামে ব্লগ বা ওয়েবসাইট খোলা হয়। প্রায়শ কোন চালু ব্লগ বা অনেক আলোচিত শেয়ার করা ফেসবুকের পাতায় ছদ্মনামে মন্তব্য দিয়ে বা লিংক দিয়েও এরা যোগাযোগ করে থাকে। সংবেদনশীল কোন ইস্যু যেমন ধর্মীয় যুদ্ধ, অবৈধ আগ্রাসন, নির্যাতন, শিশু ও নারী হত্যা প্রভৃতির ছবি ও পোস্ট ব্যবহার করে এরা সংবেদনশীল আবহ তৈরি করে। পরবর্তীতে সে সব পেজ থেকে কর্মী সংগ্রহ করা হয় বা সে সব পেজেই বিভিন্ন প্রচারণা বা সংবেদনশীল বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া হয়। তবে ঢালাওভাবে একই রকমের বার্তা সবাইকে দেওয়া হয় না। বৈশ্বিক কিছু সাধারণ বার্তা থাকলেও সেগুলোকে অঞ্চল বা দেশ এবং সে দেশের সংবেদনশীল জনগণের মূল্যবোধ বা ধর্মানুভূতি অনুযায়ী সংগঠিত করা হয়। কোথাও বার্তাটি হয়তো ধর্মীয় অধিকার নিয়ে, কোথাও গোত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব আবার কোথাও কোনো নাজুক রাজনৈতিক নীতি নিয়ে। এরা সবসময় একটা ইস্যু খুজে বের করে যা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে এবং যার পেছনে উল্লেখযোগ্য জনগোষ্ঠীর একটি প্রচ্ছন্ন সমর্থন থাকে।

অহিংসা ও হিংসার সমন্বিত ব্যবহার: মাঝে মাঝে চতুর্থ প্রজন্মের যুদ্ধে হিংসাকে সুপ্ত রেখে আপাত শান্তিপূর্ণ বা অহিংসাপূর্ণ আন্দোলন চালানো হয়। সেখানে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী, শিশু, মহিলা, ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী, প্রভৃতি যাদের উপর নিরাপত্তা রক্ষীদের আচরণ গণমাধ্যমে ঝড় তুলতে পারে তাদেরকে ব্যবহার করা হয়। রাষ্ট্রকে বেকায়দায় ফেলে জনসমর্থন অর্জনের এটাও বহুল ব্যবহৃত কৌশল। আর এরা খুঁজে বেছে নেয় সমাজের এমন একটা অংশকে যাদের পর্যাপ্ত দিক নির্দেশনা নেই, যারা বিভ্রান্ত কিন্তু উদ্যমী, যারা মাদকাসক্ত কিন্তু মেধাবী, যারা ধনী কিন্তু লক্ষ্যহীন, যারা

ধর্মের ব্যাপারে খুবই আগ্রহী কিন্তু সুনির্দিষ্ট কোন পথনির্দেশনা পাচ্ছে না—এমন উঠতি বয়সের তরুণদের। আর হঠাৎ করে বিখ্যাত হয়ে যাওয়া, ধর্মযুদ্ধে শহিদ হওয়া, তুচ্ছ এক নাম না জানা ব্যক্তি থেকে সমাজ ও বিশ্বকে নাড়িয়ে দেওয়া এমন উন্মাদনার কৌশলকে কাজে লাগায় সন্ত্রাসীরা। পাশাপাশি বিভ্রান্ত তরুণদের দ্বারা রাষ্ট্রের ভেতরে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার ব্যক্তিদের হত্যা বা আক্রমণ তাদেরকে সে দেশ ত্যাগ করার তাগাদা দেয়। ইরাক থেকে জাতিসংঘ তার বিভিন্ন সহযোগী সংস্থা নিয়ে ঠিক এমনইভাবে চলে গিয়েছিল।

অনির্দিষ্ট আদেশ, নিয়ন্ত্রণ, যোগাযোগ ও অর্থনৈতিক কাঠামো: চতুর্থ প্রজন্মের এ যুদ্ধে প্রথাগত কোনো সুনির্দিষ্ট আদেশ ও নিয়ন্ত্রণ কাঠামো দেখা যায় না। এটি কখনো কখনো একক ব্যক্তি কেন্দ্রিক নেতৃত্বে চলে, আবার কখনো কখনো এতে একাধিক নেতৃত্বের ছায়া দেখা যায়। আর নেতৃত্বগুলো এমনভাবে প্রস্তুত থাকে যে, একজনকে নিশ্চিহ্ন করলে সাথে সাথে আর একজন তার শূন্যতা পূরণ করে ফেলে। ক্রেডিট কার্ড, হুন্ডি, এনজিও ফান্ড, চাঁদা, দাতব্য সংগঠনের দান, প্রভৃতির মাধ্যমে তারা নির্বিঘ্নে অর্থ লেনদেন করে। সাধারণ আর্থিক লেনদেন, ই-মেইল, ক্ষুদেবার্তা ইত্যাদি আদান-প্রদানের মাধ্যমেই হয়ে যায় সন্ত্রাসীদের অর্থের বিনিময় আর আতংক সৃষ্টির আদেশ ও নিয়ন্ত্রণ। ধারণা, তত্ত্ব, টার্গেট লিস্ট, উপায়, হাতিয়ার সব কিছুই এখন উন্মুক্ত ইন্টারনেটে। একজনের শুধু প্রয়োজন একটা ল্যাপটপ বা মোবাইল, ইন্টারনেট সংযোগ, ক্রেডিট কার্ড বা টাকা লেনদেনের জন্য বিশ্বস্ত বাহক। এভাবেই সন্ত্রাসীরা সাধারণ জনগণের দৈনন্দিন কার্যকলাপের মাঝে মিশে থেকে ঘটিয়ে দেয় বড় ধরনের সন্ত্রাসী আক্রমণ।

দীর্ঘায়িত যুদ্ধ আর ক্রমাগত চাপ: কৌশলগতভাবে চতুর্থ প্রজন্মের যুদ্ধের উদ্দেশ্য রাজনৈতিক নেতৃত্বকে বিধ্বস্ত করা। তাদেরকে আতংকিত করা, ক্লান্ত করা,ব্যর্থ করা। দীর্ঘমেয়াদি সন্ত্রাস চালিয়ে যাওয়াটাই তাদের যুদ্ধ। যত বেশি রক্তপাত, যতো বেশি হত্যাকাণ্ড, ততো প্রশ্ন, ততো মতবিরোধ। প্রতিনিয়ত নাটকীয় ঘটনার জন্ম দেওয়ার সাথে আরো নাটকীয়ভাবে সরকারের ব্যর্থতাকে গণমাধ্যমে তুলে ধরাটা তাদের একটি কৌশল। আর ধর্মীয় শিক্ষায়, অর্থনৈতিক অঙ্গনে, সামাজিক দীক্ষায়, বিভিন্ন প্রচলিত রীতিনীতি, ধ্যানধারণার ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে অনুপ্রবেশের মাধ্যমে পুরো জাতিকে তাদের আদর্শের দিকে প্রভাবিত করাটা তাদের দীর্ঘমেয়াদি কৌশল। যুদ্ধকে দীর্ঘায়িত করার উদ্দেশ্য হলো রাষ্ট্রকে এই বার্তা দেওয়া যে, এত দীর্ঘায়িত যুদ্ধ পরিচালনা করা রাষ্ট্রের জন্য দুরূহ বা এ যুদ্ধের দায়ভার সামাজিক, রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিকভাবে এতই গুরুতর যে, তা বহন করা রাষ্ট্রের জন্য অসম্ভব। সামগ্রিক পরিস্থিতি আরো জটিল হয় যখন রাষ্ট্র একই সাথে জড়িয়ে পড়ে কোনো আঞ্চলিক যুদ্ধে বা গৃহযুদ্ধে। সেক্ষেত্রে একসাথে অনেকগুলো ফ্রন্টে প্রথাগত এবং অপ্রথাগত হুমকি মোকাবেলা করতে যেয়ে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা ভীষণ নাজুক হয়ে পড়ে।

চতুর্থ প্রজন্মের যুদ্ধের বৃহৎ পরিসরের নীতিকৌশল

স্পর্শকাতরতা, ধৈর্য, সহনশীলতা আর জনসম্পৃক্ততা: যেহেতু সন্ত্রাসী যোদ্ধারা মিশে থাকে জনগণের সাথে, তাই শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এদের চিহ্নিত করার কোনো সুযোগ নেই। তাই সামরিকভাবে সন্ত্রাসীদের মোকাবেলা করাটা মাঝে মাঝে বেশ স্পর্শকাতর হয়ে দাঁড়ায়। প্রথাগত যুদ্ধে যোদ্ধাদের সাথে সাধারণ জনগণের ক্ষয়ক্ষতির ঘটনা পারিপার্শ্বিক ক্ষতি (Collateral Damage) হিসেবে চালিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু এ যুদ্ধের কোনো অভিযানে নিহতদের যথাযথভাবে সন্ত্রাসী হিসেবে প্রমাণ না





করতে পারলে তা সন্ত্রাসীদের কুপ্রচারণার জন্য বড় খোরাক হয়ে দাঁড়ায়। আর প্রথাগত যুদ্ধের মতো এক বিশাল অভিযানে এক সপ্তাহ, এক মাস বা এক বৎসরেও এ সন্ত্রাসী যুদ্ধ শেষ হবার নয়। চতুর্থ প্রজন্মের যুদ্ধে ধৈর্য, মনোবল অক্ষুন্ন রাখা, প্রচার মাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণ, অব্যহত জনসমর্থন, রাজনৈতিক সমর্থন, আন্তর্জাতিক সমর্থন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে প্রতিনিয়ত কৌশলের অভিযোজন ও পরিবর্তন, অভ্যন্তরীণ আস্থা, প্রভৃতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জনগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি যেহেতু তাদের লক্ষ্য, তাই তাদের সাথে নিয়ে সামগ্রিকভাবে যুদ্ধে এগিয়ে গেলে যতো দীর্ঘমেয়াদিই হোক তার ফলাফল গণতান্ত্রিক সরকারের ঝুলিতেই আসবে। আর যদি ধৈর্যহীনতা ও সামরিক অভিযান চালিয়ে দ্রুত সিদ্ধান্তে পৌছানোর তাগিদ থাকে, তবে তা জনমনে বিভ্রান্তি আর বিভাজন এনে দেবে। নিজস্ব বাহিনীর রক্তপাত মেনেও আপাত দৃষ্টিতে নিরীহ নাগরিকের রক্তপাতের পরিমাণ কমাতে হবে। নিরাপত্তা বাহিনীকে খুব তাড়াতাড়ি হেলমেট খুলে সাধারণ জনগণের সাথে মিশে যেতে হবে। সাধারণ জনগণকে নিয়ে সন্ত্রাসীদের প্রতিহত করতে হবে। নিরাপত্তা বাহিনী যত বেশি মাঠে থাকবে, যত বেশি গোলাগুলি আর রক্তাক্ত পরিণতি হবে তত সন্ত্রাসীদের বার্তাটি বৈশ্বিক আলোচনার রূপ পাবে। উত্তর আয়ারল্যান্ডে ব্রিটিশ সশস্ত্র বাহিনী সফল হয়েছিল, সেখানে তারা নিজেরাই হতাহত হয়েছিল বেশি, বিদ্রোহীরা নয়।

দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা: মনে রাখতে হবে, সময় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক চতুর্থ প্রজন্মের যুদ্ধে। সময়ের সাথে সাথে রাজনৈতিক মননশীলতার পরিবর্তন যখন এ যুদ্ধের অভীষ্ট লক্ষ্য তখন সেই আঙ্গিকেই দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নিয়ে এগোতে হবে রাষ্ট্রকে। আর সে যুদ্ধটি হতে হবে কিছু নির্দিষ্ট পরিমণ্ডলে নৈতিকতা, সামাজিক নিরাপত্তা ও বৈষম্যহীনতা, রাজনৈতিক অধিকার, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও সর্বোপরি জাতিগত সহমর্মিতা নিয়ে। আর এ সকল ক্ষেত্রসমূহে যদি রাষ্ট্রযন্ত্রের সুচিন্তিত নীতিকৌশল ও সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা থাকে তবে দীর্ঘমেয়াদি এ যুদ্ধে জনগণ তাদের পাশে থাকবে আর একদিন সন্ত্রাসীরা একাকী হয়ে পড়বে। তাদের বোধোদয় তখন সময়ের ব্যাপার। আর এর জন্য রাষ্ট্রকে কষ্টকর অপেক্ষার রজনী পার করতে হবে। বুঝতে হবে, সন্ত্রাসী যোদ্ধারা ছোট ছোট সম্মুখযুদ্ধে জিততে চায় না, তারা সামগ্রিকভাবে যুদ্ধের শেষ পরিণতিতে এগিয়ে থাকতে চায়–যেটা হলো রাজনৈতিক পট পরিবর্তন। তাই জনগণকে এ যুদ্ধের জন্য তৈরি করে, আশ্বস্ত করে, সাথে নিয়ে এগোলেই সন্ত্রাসী যোদ্ধাদের সে অভিলাষ ব্যর্থ হবে নচেৎ নয়। আর এ যুদ্ধের সফলতা নির্ভর করবে সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসনের যৌথ সমন্বয়ে একটি সুপরিকল্পিত অভিযানের মাধ্যমে। খুব নিবিড়ভাবে কাজ করে যেতে হবে রাজনৈতিক নেতৃত্ববৃন্দকে। সমন্বয় করতে হবে একই সাথে সামরিক, প্রশাসনিক, পুলিশ, গোয়েন্দা এবং জনমতকে।

সশস্ত্র বাহিনীর প্রস্তুতি

দ্রুত মোতায়েনযোগ্য ইউনিট, প্রযুক্তি নির্ভরতা ও মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধে পারদর্শিতা: চতুর্থ প্রজন্মের যুদ্ধ যখন আসন্ন বা চলমান তখন এ প্রশ্ন প্রাসঙ্গিক যে আজকের তৃতীয় প্রজন্মের যোদ্ধারা এ যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধের জন্য কি প্রস্তুত? চতুর্থ প্রজন্মের যুদ্ধ অত্যাসন্ন সেটা মেনে নিয়ে এর স্তর গুলোকে চিনতে হবে, তৈরি করতে হবে যথাযথ প্রতিরোধ সক্ষমতা। ভারী সমরাস্ত্র আর বিশাল বহরের সেনাদলের চেয়ে বিশেষায়িত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইউনিটগুলো হবে এ যুদ্ধের জন্য বেশি কার্যকরি। ইউনিটগুলোকে হতে হবে দ্রুত মোতায়েনযোগ্য এবং স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেবার

ক্ষমতাসম্পন্ন। প্রচুর পরিমাণ তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণ করার মতো সক্ষম ব্যক্তিত্ব ও সরঞ্জাম থাকতে হবে। নিচ্ছিদ্র যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকতে হবে, থাকতে হবে যথাযথভাবে গণমাধ্যমকে নিষ্ক্রিয়করণ অথবা কাজে লাগানোর সক্ষমতা। পাশাপাশি যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও নেতৃত্বের থাকতে হবে যুদ্ধ এবং প্রযুক্তি দু'টির উপরেই সমান দখল। যুদ্ধক্ষেত্রে সঠিক টার্গেট নির্বাচন, দ্রুত নিধনের আদেশ প্রদান, বাস্তবায়ন, মূল্যায়ন, প্রচারণা, প্রপাগান্ডা প্রভৃতি সব দ্রুত করে ফেলতে হবে। সঠিক সময়ে সঠিক ইউনিটটি নির্ধারণ করে তাদের মিশন নির্দেশক আদেশ প্রদান, শত্রুর সর্বশেষ পরিকল্পনা জেনে তার পাল্টা ব্যবস্থা নেওয়া আর সঠিক তথ্যটা বেছে নেওয়া হবে বড় চ্যালেঞ্জ। মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ হবে চতুর্থ প্রজন্মের যুদ্ধে সামরিক বাহিনীর জন্য সবচেয়ে বড় যুদ্ধক্ষেত্র। তাই ফর্মেশনগুলোতে মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের সামর্থ্য তৈরি করা, মিডিয়া নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে নিজস্ব মনস্তাত্ত্বিক বার্তাগুলো প্রতিপক্ষ এবং জনগণের মাঝে দ্রুত পৌঁছে দেওয়া, প্রভৃতির ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা, প্রশিক্ষণ ও জনবল থাকতে হবে। একইভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রতিপক্ষের আক্রমণের ভয়াবহতা অথবা যুদ্ধ ক্ষেত্রের ধ্বংসাত্মক পরিণতির ব্যাপক প্রচারণা বন্ধের ব্যবস্থা নিতে হবে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম গুলোতে থাকতে হবে সঠিক নজরদারি। তৈরি রাখতে হবে পাল্টা এক দলকে যারা এসব মাধ্যমে সন্ত্রাসীদের রুখে দেবে। মনে রাখতে হবে একটি টিভি চ্যানেল বা একটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম হতে পারে একটা বড় মাপের সামরিক বাহিনীর চেয়েও বেশি শক্তিশালী আর কার্যকরী, যেমনটি হয়েছিল সম্প্রতি তুরস্কের ব্যর্থ সামরিক অভ্যুত্থানের সময়।

জনসম্পৃক্ততা, গোয়েন্দাসামর্থ্য ও কাউন্টার টেরোরিজমে সক্ষমতা বৃদ্ধি: ক্ষুদ্র, দ্রুত মোতায়েনযোগ্য হালকা অস্ত্রে সজ্জিত ইউনিটগুলোকে ছড়িয়ে দিতে হবে সর্বত্র। তবে তাদের সাথে থাকবে পাবলিক রিলেশন্স ইউনিট। খুব দ্রুত মিশে যেতে হবে সাধারণ জনতার সাথে। ইনসার্জেন্সি অপারেশনের মতো এখানেও জনগণকে সাথে নিয়ে আসতে হবে খুব তাড়াতাড়ি। জনগণের মনোভাব, অভ্যাস, রীতি-নীতি প্রভৃতিকে খুব তাড়াতাড়ি জেনে সে অনুযায়ী কাজ করতে হবে। জনগণকেই সামরিক বাহিনীর রক্ষার ভার দিতে হবে। পুলিশ, ভিডিপি ও আনসার সদস্যরা অনেক তথ্যের উৎস। এরা ও অন্যান্য তৃণমূল বাসিন্দাদেরকে বিশ্বস্ততার সাথে যুক্ত করতে হবে, তাদেরকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে হবে। পাশাপাশি নিজস্ব সামরিক বাহিনীর মধ্যে সঠিকভাবে ঐক্য ও চেইন অব কমান্ড বজায় রাখতে হবে যে কোনো মূল্যে। ভেদাভেদ আর ভিন্ন মতাদর্শ রুখতে হবে। সমরবিদদের একটা দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা আর দূরদৃষ্টি থাকতে হবে। যখন তখন যেখানে সেখানে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া, অনর্থক রক্তপাত, নির্বিচারে হত্যা, গ্রেফতার আর হয়রানি করা যাবে না। যত পারা যায় অভিযানে বা যুদ্ধে অসামরিক জনগণের ক্ষয়ক্ষতি বা পারিপার্শ্বিক ক্ষতি এড়িয়ে চলতে হবে। ইন্টারনেট নজরদারি, মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ পরিচালনা, দ্রুত কাঙ্ক্ষিত তথ্যের সম্প্রচার এবং অনাকাঙ্ক্ষিত তথ্যের অপপ্রচার রোধ, গণমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণ ও যথাযথ সংবাদ প্রচারে উদ্বুদ্ধ করা, বিভিন্ন মোবাইল ও ইন্টারনেট অ্যাপস্ সম্পর্কে নজর রাখা ইত্যাদির ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট নীতি প্রণয়ন করতে হবে। ফর্মেশনগুলোর সাধারণ সৈনিকদের কাউন্টার টেরোরিজমের উপর সম্যক ধারণা দেওয়া, ছোটখাট বিশেষায়িত অপারেশনের উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া, হালকা অস্ত্রে সজ্জিত দ্রুত মোতায়েনযোগ্য ইউনিট চিহ্নিত করে প্রস্তুত রাখা ও এ ব্যাপারে স্থায়ী নির্দেশাবলী তৈরি করা প্রভৃতিকে গুরুত্ব দিতে হবে। স্থানীয় অসামরিক প্রশাসন, পুলিশ, অন্যান্য বাহিনী এবং গোয়েন্দা সংস্থার সাথে নিয়মিত সমন্বয় ও ইন্টেলিজেন্স আদান-প্রদানের রীতি প্রচলন করতে হবে।





উপসংহার

সশস্ত্র বাহিনীর প্রশিক্ষণ বা অপারেশনে সাধারণ জনগণের সাথে সম্পৃক্ততার অবকাশ থাকে না। কিন্তু চতুর্থ প্রজন্মের যুদ্ধে জনসম্পৃক্ততা, জনমত, স্থানীয় জনগণ ও তাদের কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক মতবাদ প্রভৃতির ব্যাপারে সম্যক ধারণা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই চতুর্থ প্রজন্মের যুদ্ধের উপর প্রশিক্ষণের পাশাপাশি সশস্ত্র বাহিনীকে প্রচুর জনকল্যাণমূলক কাজে সম্পৃক্ত থাকতে হবে। জনগণের সাথে মিশতে হবে বেশি বেশি করে। নিয়মিত জনসংযোগ কার্যকলাপের মাধ্যমে দূরত্ব কমাতে হবে, তৈরি করতে হবে আস্থা আর নির্ভরতার ইস্পাত কঠিন বন্ধন। আর নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও সন্ত্রাসীদের কৌশলের সার্বক্ষণিক মূল্যায়ন করে ক্রমাগত অভিযোজিত করতে হবে নিজেদেরকে নতুন নতুন পাল্টা কৌশলে।

এটা মেনে নিতে হবে যে, বৈশ্বিক পট পরিবর্তনের ধারায় এমন যুদ্ধ যে কোনো মুহূর্তেই আসন্ন হতে পারে। আর সঠিকভাবে এ যুদ্ধের পূর্ব প্রস্তুতি না নিয়ে শুধুমাত্র ট্যাংক, কামান, বিমান নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লে চতুর্থ প্রজন্মের যুদ্ধে চূড়ান্ত বিজয় সম্ভব হবে না। পারিপার্শ্বিকতা, চলতি ভূ-রাজনৈতিক ধারা, অব্যাহত সন্ত্রাসবাদের লক্ষ্যসমূহ, কার্যকলাপ প্রভৃতিকে যথাযথভাবে মূল্যায়ন করে তৈরি করতে হবে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাসমূহ। এক বা একাধিক হুমকি মূল্যায়ন (Threat Analysis) করে সে অনুযায়ী বিভিন্ন আঙ্গিকের (রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক প্রভৃতি) ভবিষ্যৎ কার্যপ্রণালী (Shelf Plan) পল্লত করে রাখতে হবে। এ যুদ্ধ যেমন একদিনে শুরু হয় না, তেমনি একদিনেও শেষ হয় না-এটা মেনেই দীর্ঘমেয়াদি প্রস্তুতি নিতে হবে আমাদের সকলকে।



লেফটেন্যান্ট কর্নেল আবু রুবেল মোঃ শাহাবুদ্দিন, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, জি, আর্টিলারি ১৬ জুন ১৯৯৫ সালে আর্টিলারি রেজিমেন্টে কমিশন লাভ করেন। তিনি মিরপুর ডিফেন্স সার্ভিসেস কমান্ড অ্যান্ড স্টাফ কলেজ ও হালিশহর স্কুল অব আর্টিলারি হতে যথাক্রমে মাস্টারস অব ডিফেন্স এবং মাস্টারস অব সায়েন্স (টেকনিক্যাল) সম্পন্ন করেছেন। এছাড়াও তিনি ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ, মিরপুর হতে মাস্টারস অব ফিলোসফি (প্রথম পর্ব) সম্পন্ন করেছেন। লেফটেন্যান্ট কর্নেল শাহাবুদ্দিন আর্টিলারি রেজিমেন্টের বিভিন্ন দায়িত্বের পাশাপাশি পদাতিক ব্রিগেডের জিএসও-৩ (অপস), পদাতিক ডিভিশনের জিএসও-২ (অপস) এবং ফোর্স হেডকোয়ার্টারস (UNAMID) এর জিএসও-২ (অপস অ্যান্ড ট্রেনিং) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি স্কুল অব আর্টিলারিতে সিনিয়র ইনস্ট্রাক্টর গানারী (ফিল্ড) এবং ওআইসি, অফিসার্স গানারী স্টাফ কোর্স, ফিল্ড-১৬ এর দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বর্তমানে সেনাসদর, জিএস শাখা, সামরিক গোয়েন্দা পরিদপ্তরের জিএসও-১ হিসেবে দায়িত্বরত এবং ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজের তত্ত্বাবধানে মাস্টারস অব ফিলোসফি (২য় পর্ব) সম্পন্ন করছেন।

ইসলামের দৃষ্টিতে সশস্ত্র বাহিনীর মর্যাদা

অধ্যাপক মুহম্মদ মাসুম চৌধুরী

বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী আমাদের গর্ব ও জাতীয় ঐক্যের প্রতীক। দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন, মুক্তিযুদ্ধোত্তর দেশ গঠন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা এবং জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে সততা ও দক্ষতার সাথে সশস্ত্র বাহিনী দায়িত্ব পালনের কারণে বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল।

বাঙালির হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ অর্জন, 'স্বাধীনতা'। ১৯৭১ সালে বাঙালির স্বাধীনতা আন্দোলনে সেনা, নৌ, বিমান বাহিনী সম্মিলিতভাবে হানাদার বাহিনীর ওপর আক্রমণ করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করে। সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের রক্ত বেসামরিক জনগণের রক্তের সাথে ১৯৭১ সালে এক নদীর এক স্রোতে মিশে গেছে, কেউ কোনোদিন আর পৃথক করতে পারবে না। ইতিহাসের পাতা ছেঁড়া যায়, মোছা যায় না। সশস্ত্র বাহিনী বাংলাদেশের ইতিহাসের অংশ। তাদের আত্মত্যাগ অজর, অমর, অক্ষয়, অব্যয় হয়ে থাকবে মহাপ্রলয়ের শেষ রজনী পর্যন্ত।

ইসলাম ও সশস্ত্র বাহিনী

মহান আল্লাহ পাক মহানবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মানব জাতির জন্য উত্তম আদর্শ হিসেবে প্রেরণ করেছেন। তিনি ছিলেন একাধারে নবী, আদর্শ পিতা, রাষ্ট্রনায়ক ও সেনাপতি। ঈমান নিয়ে নিরাপদে স্বদেশে বেঁচে থাকার জন্য তিনি দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের নিরাপত্তা বিধানে অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকা পালন করেন এবং সাহাবীগণকে সে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি মনে করতেন বহিঃশত্রুর দ্বারা আক্রান্ত না হলে তিনিও আক্রান্ত হবেন না, টিকিয়ে রাখা যাবে ঈমান। দেশের ধর্ম, শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি টিকিয়ে রাখতে হলে টিকিয়ে রাখতে হয় দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব। ইসলামে স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষার গুরুত্ব ব্যাপক।

মহানবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেশকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ হতে মুক্ত রাখতে সদা তৎপর থাকতেন। দেশের উপর বহিঃশত্রু যদি হামলা করে তার মোকাবিলায় সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণ করছে কি না তাও তদারকি করতেন। হামলার আশংকা না থাকলেও দেশের সীমান্ত পাহারা দেয়ার জন্য কিছু মানুষকে নিয়োজিত রাখা তিনি কর্তব্য মনে করতেন। মহানবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার পর প্রতিনিয়ত মদিনার সীমান্ত পাহারার জন্য সার্বক্ষণিক জনবল নিয়োজিত রাখতেন। যে দিন হামলার আশংকা করতেন সে দিন অতিরিক্ত বাহিনী নিয়োজিত করতেন।

প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "আল্লাহর পথে সীমান্ত পাহারা দেয়া দুনিয়া ও দুনিয়ার উপর যা কিছু আছে তার চাইতেও উত্তম।" (সহীহ বুখারি ও মুসলিম)

তিনি আরো ইরশাদ করেছেন, 'একদিন একরাত দেশের সীমান্ত পাহারা দেয়া একমাস রোজা ও নামাজ আদায়ের চেয়ে অধিক উত্তম। এই দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় সে যদি মৃত্যুবরণ করে তারপরও সে পুণ্য তাঁর জন্য জারি থাকবে, তাঁর রিজিক সেখানে প্রাপ্ত হবে। কবরের আজাব ও বিপদ হতে সে নিরাপদ থাকবে। (সহীহ বুখারি ও মুসলিম)





খন্দকের যুদ্ধে মদিনা রক্ষা করার জন্য মহানবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরাম যে অসাধারণ ভূমিকা পালন করেন, তা দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ইসলামের শত্রুদের ইচ্ছা ছিল মদিনা আক্রমণ করত: ধ্বংস সাধন। মদিনা ধ্বংস হলে ইসলাম ধর্ম টিকে থাকবে না। এজন্য মহানবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবিদের সাথে পরামর্শ করেন, কিভাবে ওদের আক্রমণ হতে মদিনাকে রক্ষা করা যায়। বিখ্যাত সাহাবী হযরত সালমান ফারসী (রা:) বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! পারস্যবাসী বহিঃশত্রু কর্তৃক আক্রমণের শিকার হলে তারা খন্দক বা পরিখা খনন করে'। প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কথা শুনে সিদ্ধান্ত নিলেন মদিনার যে দিকে অরক্ষিত ছিল সে দিকে পরিখা খনন করবেন। সেদিন এই পরিখা খননের কারণেই বিশাল কাফের বাহিনী মদিনার কোনো ক্ষতি সাধন করতে পারেনি। আল্লাহর হাবীব হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার সহচরগণ সম্মিলিতভাবে এই পরিখা খননে অংশগ্রহণ করেন। এই পরিখা খনন করতে গিয়ে সাহাবায়ে কিরামগণ অনেক কষ্ট পান। তাদের দুঃখ দুর্দশা দেখে মহানবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহান আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করলেন, 'হে আল্লাহ! পরকালের জীবনই একমাত্র জীবন, সুতরাং তুমি ক্ষমা করো আনসার ও মুহাজিরদের।'

মহানবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'মৃত্যুর পর প্রত্যেক ব্যক্তির আমল স্থগিত হয়ে যায়, কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে দেশ রক্ষার পাহারায় থাকে তাঁর আমল ব্যতীত। তাঁর আমল কিয়ামত পর্যন্ত বৃদ্ধি হতে থাকবে এবং সে কবরের আজাব ও কবরের সমস্ত বিপদ হতে মুক্ত থাকবে।' (সুনান আবু দাউদ ও তিরমিজি শরিফ) তিনি আরও ইরশাদ করেন, 'আল্লাহর পথে একদিন সীমান্ত পাহারা দেয়া হাজার দিনের অন্য ইবাদতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।' (তিরমিজি শরিফ)

যে ব্যক্তি দেশের জন্য যুদ্ধাস্ত্র প্রদান অথবা যুদ্ধরত সৈনিকের খোঁজখবর রাখে না সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। হযরত আবু উমামা (রা:) হতে বর্ণিত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'যে ব্যক্তি যুদ্ধ (দেশ ও ন্যায়ের) করেনি বা কোনো যোদ্ধার জন্য অস্ত্র তৈরি করে দেয়নি অথবা যোদ্ধার পরিবারের খোঁজখবর নেয়নি, মহান আল্লাহ পাক কিয়ামতের পূর্বে ঐ ব্যক্তির উপর কঠিন মুসিবত নাজিল করবেন।' (আবু দাউদ শরিফ, মিশকাত শরিফ পৃষ্ঠা ৩৩১)

আল্লাহর নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জাহান্নামের আগুন দুটি চোখ স্পর্শ করবে না, যে চোখ আল্লাহ পাকের ভয়ে কান্না করে এবং যে চোখ আল্লাহর রাস্তায় (সীমান্ত পাহারা, দেশরক্ষা জানমাল রক্ষায়) দাঁড়িয়ে থেকে রাত্রি যাপন করেন।' (তিরমিজি শরিফ, মিশকাত, পৃষ্ঠা-৩৩২)

মহানবী হযরত মোহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরোক্ত অমর বাণীসমূহ হতে আমাদের আত্মস্থ হয় যে, বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের যে কঠিন দায়িত্ব পালন করছেন, তা ব্যাপক মর্যাদা ও ফজিলতপূর্ণ কাজ। দেশপ্রেম না থাকলে মানুষ দায়িত্বশীল হতে পারে না। দার্শনিক প্লেটোর কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, সর্বোচ্চ দেশপ্রেম কী? তিনি বলেছেন, 'প্রত্যেকের নিজের দায়িত্বটা সুচারুরূপে পালন করাই সর্বোচ্চ দেশপ্রেম।'

দেশপ্রেম ছাড়া দায়িত্বশীল সৈনিক হওয়া যায় না। মহানবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের স্বদেশকে গভীর ভালোবাসতেন বলেই দেশরক্ষায় জীবন উৎসর্গ

করতে উৎসাহিত করতেন। জন্মভূমি মক্কা হতে তাঁকে নিজ সম্প্রদায়ের মানুষ বের করে দেবেন তা মেনে নেওয়া ছিল তাঁর পক্ষে কঠিন। স্বদেশের প্রতি তার ছিল গভীর ভালোবাসা এবং নিজ সম্প্রদায়ের প্রতি ছিল প্রচণ্ড অনুরাগ। মক্কা হতে মদিনায় হিজরতের প্রস্তুতির পূর্বে তিনি মক্কাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'তুমি কতই না উত্তম শহর! তুমি কতই প্রিয় আমার! যদি তোমার সম্প্রদায় আমাকে বের করে না দিত আমি কোনোদিন তোমাকে ত্যাগ করতাম না।' (তিরমিজি শরিফ)

বিখ্যাত সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আদী ইবনে হামরা হতে বর্ণিত আছে, তিনি বললেন, 'আমি মহানবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খাযওয়ারাহ নামক স্থানে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি, "আল্লাহর কসম! হে মক্কা! তুমি আল্লাহর জমিনের মধ্যে সর্বোত্তম। আমি তোমার কোল হতে বের হতে যদি বাধ্য না হতাম, কখনো তোমাকে ত্যাগ করতাম না।" (তিরমিজি ও ইবনে মাজা শরিফ)

মক্কা নগরী ত্যাগ করলেও কখনো ত্যাগ করতে পারেননি মক্কা ও মক্কার মানুষের প্রেম। মক্কার কাবা, আরাফাত, মিনা, মুযদালিফার হেরা গুহার প্রেম। কীভাবে তিনি ত্যাগ করবেন হযরত ইব্রাহিম (আঃ)'র অমর স্মৃতির প্রতি ভালোবাসা! এই পবিত্র ভূমিতে তিনি আর কোনোদিন আসতে পারবেন না? মহান আল্লাহ পাক তাঁর হাবীবের দ্বিধাদ্বন্দ্বের নিরসন করতে ঘোষণা করলেন, "নিশ্চয়ই তোমার প্রতি যিনি কোরআনকে বিধান করেছেন তিনি (আল্লাহ) তোমাকে প্রত্যাবর্তন স্থলে (মক্কায় ফিরিয়ে) আনবেন।" (সূরা: কাসাস, আয়াত: ৮৫)

প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন মক্কায় ধর্ম প্রচারক, মদিনায় রাষ্ট্রনায়ক। তিনি জন্মভূমিকে যে রূপ ভালোবাসতেন তদ্রূপ আবাসভূমি মদিনার ভালোবাসা হৃদয়ে সৃষ্টির জন্য মহান আল্লাহ পাকের নিকট প্রার্থনা করতেন। প্রার্থনায় বলতেন, "হে আল্লাহ! হযরত ইব্রাহিম (আঃ) তোমার বান্দা, তোমার বন্ধু এবং তোমার নবী আর আমিও তোমার বান্দা, বন্ধু এবং নবী। তিনি তোমার নিকট মক্কার জন্য দোয়া করেছেন আর আমি তোমার নিকট মদিনার জন্য দোয়া করছি, যেরূপ হযরত ইব্রাহিম (আঃ) মক্কার জন্য দোয়া করতেন।"

হযরত আনাস (রা:) বর্ণনা করেছেন, মহানবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন প্রবাস হতে মদিনায় উপস্থিত হতেন তখন তিনি মদিনার প্রাচীরগুলো ঘুরে ঘুরে দেখতেন। এ সময় তিনি তাঁর সওয়ারী উটকে তাড়া করতেন। (সহীহ বুখারি ও মুসলিম শরিফ)

মদিনার প্রেম তাঁর অন্তরে জেগে ওঠার পরও মক্কা ও মক্কার মানুষের প্রতি ছিল অসাধারণ অনুরাগ। তার প্রমাণ মেলে মক্কা বিজয়ের দিন। যে মক্কাবাসী ২১ বছর সর্বশক্তি প্রয়োগ করে মুসলমানদের ওপর অমানসিক নির্যাতন করেছিল, সে মক্কার কাফিরদের হাতের মুঠোয় পেয়েও ক্ষমা করে দেন। আবু সুফিয়ান, হিন্দা, ওয়াহশীর মতো চরম শত্রুদেরও তিনি বুকে টেনে নেন। মক্কার শত্রুরা তো তখন জীবন চলে যাওয়ার প্রহর গুণছিল, সে মুহূর্তে তিনি মহামানবতার কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, "তোমাদের প্রতি আজ আমার কোন অভিযোগ নেই। নেই কোনো প্রতিশোধ ভাব। তোমরা মুক্ত। তোমরা আজ স্বাধীন।" (সীরাতে ইবনে হিশাম পৃষ্ঠা:৪৫৬)

মক্কা বিজয়ের পর প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো ঘোষণা করলেন, "এই নগরীকে আল্লাহ হালাল (পবিত্র) করেছেন সেদিন থেকে, যেদিন তিনি আসমান-জমিন সৃষ্টি করেছেন। এ নগরী কিয়ামত পর্যন্ত সম্মানিত থাকবে।" (তিরমিজি শরিফ)





সশস্ত্র বাহিনী ও মানবকল্যাণ

পবিত্র ইসলাম একটি সুন্দর বিধানের নাম। এ বিধানে মানবকল্যাণ মহান এক ইবাদত। অনেকে নামাজকে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত মনে করলেও মানবকল্যাণকে তেমন গুরুত্ব দেয় না। মানবকল্যাণের ওপর গুরুত্বারোপ করতে ইসলামের বিধান হলো নামাজের পূর্বে আজানে হাইয়া আলাস্ সালাহ (নামাজের জন্য এসো) বাক্যটি উচ্চারণের সাথে সাথে হাইয়া আলাল ফালাহ (কল্যাণের জন্য এসো) বাক্যটি উচ্চারণ করতে হয়। নবজাতক শিশুর জন্মের পরই আজানের মাধ্যমে কল্যাণের কথা স্মরণ করে দিতে হয়।

পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ পাক ৮২ বার "ওয়াকিমুসসালাহ ওয়াউতুজ্জাকাত" অর্থাৎ নামাজ কায়েম করো যাকাত প্রদান করো, কথাটি ঘোষণা করেছেন। যেখানেই নামাজের কথা সেখানে অসহায় মানুষের কল্যাণে যাকাতের কথা বলা হয়েছে। এতে আত্মস্থ হয় যে, শুধু নামাজ-রোজা ইবাদত নয়, মানবকল্যাণও মহান ইবাদত।

নামাজ শেষে আমরা মহান আল্লাহর দরবারে মুনাজাতে পবিত্র কোরআনের যে আয়াত পাঠ করি তা হলো, "রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনিয়া হাসনাতাও ওয়াফিল আখিরাতি হাসানাতাও ওয়াকিনা আজাবান্নার।"

অর্থাৎ "হে আল্লাহ, তুমি আমাদের দুনিয়ার কল্যাণ দাও, আখিরাতের কল্যাণ দাও এবং জাহান্নামের আগুন হতে রক্ষা করো।" (সূরা:আরাফ, আয়াত-২৩)

এই পবিত্র আয়াতে দুনিয়ার কল্যাণের কথা আগে বলা হয়েছে, কারণ দুনিয়াটা ঠিক না থাকলে আখিরাত ঠিক থাকে না।

মহানবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এক সাহাবী জানতে চেয়েছিলেন, সর্বোত্তম ব্যক্তি কে? তিনি বললেন "রুন্নাস ইয়ান ফেউন্নাস" যিনি মানুষের কল্যাণ করেন তিনিই সর্বোত্তম। অন্য এক হাদিসে তিনি এরশাদ করেছেন, "যিনি মহামানবতার সেবায় নিজের জীবনকে নিঃশেষে বিলিয়ে দেন তিনিই মহামানব।"

মহামানব নয় নেহায়েত সাধারণ ও স্বাভাবিক মানুষ খুঁজে পাওয়া বর্তমানে কঠিন, যে সব মানুষ সমাজের বা মানুষের উপকার না করলেও অপকার করে না, যে অন্যায় করে না, যে ঘৃণা করে না, এমন মানুষ যখন আমরা খুঁজছি তখনি বাংলাদেশের দেশপ্রেমিক সশস্ত্র বাহিনী দেশ বিদেশে শান্তি রক্ষায় নিজের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে অপরের কল্যাণে আনন্দ পান। বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীদের সততা, দেশপ্রেম, মানবপ্রেম, শৃঙ্খলা, সাহসিকতা, কর্তব্যপরায়ণতা শুধু দেশে নয়, বিশ্বে আজ প্রশংসিত। বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী আজ দুনিয়ার বুকে বীর প্রসবিনী। এটি শুধু আমার কথা নয়, পবিত্র কোরআনেরও মহান ঘোষণা। মহান আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করেছেন, "কুন্তু খায়রা উম্মাতি উখরিজাত লিন্নাস" –অর্থাৎ "তোমাদের শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছে যাতে মানুষের (সর্বধর্মের) কল্যাণ করো"। মানুষ কল্যাণের মাধ্যমে হয় শ্রেষ্ঠ জাতি বা 'আশরাফুল মাখলুকাত' সৃষ্টির সেরা জীব। অকল্যাণ নিকৃষ্ট।

ফার্সি ভাষার প্রধান কবি হযরত শেখ সাদী (রহঃ) লিখেছেন, "গাধা নিকৃষ্ট এক প্রাণী। মানুষ মানুষকে গাধা বলে গালি দেয়। এই গাধা মানুষের কল্যাণ ছাড়া অকল্যাণ করে না। মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব হয়ে যদি মানুষের অকল্যাণ করে তখন সে গাধার চেয়ে নিকৃষ্ট, আর কল্যাণ করলে সে সৃষ্টির সেরা জীব।"

মহানবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন মাত্র তেইশ বছর। আর মানবতার কল্যাণ সাধন করেছেন সমগ্র জীবন। তার শিক্ষা হলো, মানুষের সেবাই উত্তম ইবাদত। যে মুসলমান ধর্মের অন্যান্য বিধান পালন করে অথচ মানব কল্যাণ করে না, সে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের বড় অংশ ত্যাগ করে ক্ষুদ্র অংশকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছে।

মহানবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রহমত ও কল্যাণকামী বলে পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করা হয়েছে। মহান আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন, "নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের নিকট এক রাসূল এসেছে। তোমাদেরকে যা বিপন্ন করে তা তার জন্য কষ্টদায়ক। তোমাদের জন্য তিনি কল্যাণকামী, মুমিনদের প্রতি দয়াবান এবং পরম দয়ালু"। (সূরা: তাওবা, আয়াত: ১২৮)

উপরোক্ত আয়াতে মহানবী হযরত মোহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কল্যাণকামী ও দয়ালু বলে ঘোষণা করা আমাদের জন্যও কতর্ব্য। কারণ কল্যাণ মুসলমানের ঈমানের অংশ।

সাভারে রানা প্লাজা ধ্বসে সহস্রাধিক মানুষের মৃত্যু হয়। ৯ পদাতিক ডিভিশনের নেতৃত্বে সেনা, নৌ, বিমান বাহিনী, পুলিশ, আনসার, বিজিবিসহ সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন সংগঠনের যৌথ সহযোগিতায় উদ্ধার অভিযান সফল ভাবে সম্পাদন হয়। ধ্বংসপ্রাপ্ত একটি ভবন থেকে ২,৪৩৮ মানুষ জীবিত উদ্ধার এক বিরল ও অসাধারণ ঘটনা। সামরিক ও বেসামরিক যৌথ সহযোগিতায় দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য আমাদের সশস্ত্র বাহিনী সব সময় প্রস্তুত থাকে। ২০০৭ সালে প্রবল বন্যা, সিডর, আইলার মতো বড় প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় আমাদের দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনী সেনানিবাসে বসে থাকে নি, সাধারণ মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। বন্যাকবলিত এলাকায় সুপেয় পানির ব্যবস্থা ও বিভিন্ন রোগের ঝুঁকি হতে রক্ষার মুখ্য কর্মসূচি তারা পালন করেন। বিমান বাহিনীর হেলিকপ্টার দ্বারা দ্রুত দুর্যোগপূর্ণ এলাকায় ত্রাণ ও ঔষধ পৌছিয়ে দেয়। এ সব সেবা-ধর্মী কাজে নৌবাহিনী সদস্যরাও পিছিয়ে ছিল না, তাঁদের নৌযান নিয়ে সমুদ্র ও নদীর তীরবর্তী দুর্গত এলাকায় গিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে। একদিন দুইদিন নয়, মাসের পর মাস সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা জনগণের পাশে থেকে কল্যাণ সাধনের অনেক দৃষ্টান্ত রেখেছে।

বন্যা পরিস্থিতির দিকে সার্বক্ষণিক দৃষ্টি রেখে বন্যাকবলিত মানুষের সাহায্য করতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর রয়েছে এক 'পর্যবেক্ষণ সেল'। সামরিক প্রকৌশলীগণ লোডার, ডোজার দ্বারা বালি পাথর ফেলে অনেক নদীভাঙন প্রতিরোধ করেছে। কঠিন দুর্যোগের সময় সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা দিন রাত পরিশ্রম করে মানুষের সেবা ও উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করে থাকেন।

দুর্যোগের সময় অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানো ইসলামের মহান শিক্ষা ও ইবাদত। দুর্যোগ কবলিত এলাকায় ধর্ম বর্ণ, শত্রুমিত্র পার্থক্য না করে সব মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করতে মহানবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ প্রদান করেছেন। হিজরতের ষষ্ঠ বছর মক্কা শহরে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে তিনি খুব ব্যথিত চিত্তে দুর্ভিক্ষকবলিত মক্কাবাসীর জন্য পাঁচশত দিরহামের ত্রাণসামগ্রী প্রেরণ করেছিলেন। অথচ এই মক্কার কাফিরগণ ছিল তার চরম শত্রু। এই শত্রুদের বিপদের কথা শুনে তিনি খুশি না হয়ে মর্মাহত হন। (সূত্র ড. হামীদুল্লাহ, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর যুদ্ধ ও প্রতিরক্ষা কৌশল শীর্ষক প্রবন্ধ; সীরাত স্মারক, ১৪২২ হিজরি)

আমাদের ভুলে গেলে চলবেনা, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রথম সর্বধর্মের মানুষের সেবক, তারপর (চল্লিশ বছর পর) ধর্ম প্রচারক। তিনি সর্বধর্ম ও মতের মানুষের সেবা করেছেন বলেই তার প্রচারিত ধর্ম মানুষ গ্রহণ করেছে।

প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুয়ত প্রাপ্তির কথা তিনি প্রথম জানালেন স্ত্রী খাদিজাকে (রা:)। হযরত খাদিজা (রা:) বললেন, "আল্লাহ আপনাকে কখনো অসম্মান করবেন না, কারণ আপনি অসহায়, দুঃস্থ, শোষিত মানুষের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন, আত্মীয়-স্বজনের সাথে উত্তম ব্যবহার করেছেন, মেহমানকে মর্যাদা দিয়েছেন।" (প্রাগুক্ত, কিতাবুল যাদইল ওয়াহরি, হাদিস নং ৩, ১ খ পৃঃ ৪)





মহানবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়ত প্রকাশিত হওয়ার আগেও ব্যাপক সেবামূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিলেন যা আমরা হযরত খাদিজাতুল কোবরার (রাঃ) বর্ণনা হতে জানতে পারি। বাংলাদেশের দেশপ্রেমিক সশস্ত্র বাহিনী বিভিন্ন সময় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ, দুর্যোগ মোকাবিলা, জাতীয় নির্বাচনে দায়িত্ব পালন, জাতীয় ভোটার আইডি কার্ড তৈরী, বঙ্গবন্ধু সেতু নজরদারী সন্ত্রাস দমন, পার্বত্য চট্টগ্রামে কাউন্টার ইনসারজেন্সি অপারেশন, পাওয়ার স্টেশন স্থাপন, কি পয়েন্ট ইনস্টলেশনের নিরাপত্তার দায়িত্ব পালনসহ সব কাজই মানবকল্যাণের মহান ব্রত নিয়ে সম্পাদন করে থাকেন।

মহানবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ অনুসরণ করতে চাইলে নামাজ, রোজা, হজ্জের মতো মানবকল্যাণে আত্মনিয়োগ করতে হবে। তিনি সব সময় মানবতার কল্যাণে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা প্রদান করতেন। প্রিয়নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "সৃষ্টি জগৎ আল্লাহর পরিবারভুক্ত। ঐ ব্যক্তি মহান আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয়, যে তার পরিবারের অধিক কল্যাণ করে। (মিশকাত শরিফ, হাদিস নং-৪৭৮১)

তিনি আরো ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করে না, মহান আল্লাহ তার প্রতি দয়া করেন না।" (জামে-আত-তিরমিজি, হাদিস নং -১৮৭২)

আরেক হাদিসে বর্ণিত আছে, "তোমরা পৃথিবীবাসীর প্রতি অনুগ্রহ করো, আল্লাহ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করবেন।" (প্রাক্তন, হাদিস নং-৩৭৫)

প্রতিটি মানুষ একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। মানুষ অপরের উপর নির্ভরশীল হয়ে দুনিয়াতে আসে, বসবাস করে এবং দুনিয়া হতে বিদায় নেয়। মানুষ অপরের কল্যাণ সাধন বন্ধ করলে জাতি হিসেবে টিকে থাকতে পারবে না। তাই মহানবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষকে মানুষের প্রতি দয়াবান ও অনুগ্রহশীল হতে আহ্বান জানিয়েছেন। সে আহ্বানে সাড়া দিয়ে বিভিন্ন সময় আমাদের দেশপ্রেমিক সশস্ত্র বাহিনী মানবকল্যাণে আত্মনিয়োগ করেছেন, করবেন, ইনশাআল্লাহ।

সামরিক বাহিনীর সদস্যরা বন্যাকবলিত অঞ্চলে সুপেয় পানির ব্যবস্থা ও বিভিন্ন রোগের ঝুঁকি হতে রক্ষায় যে ভাবে দায়িত্ব পালন করেন তা সত্যিই অসাধারণ পুণ্যময় কাজ। মহানবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থ ব্যক্তিদের সেবা করার নির্দেশ দিয়ে ঘরে বসে থাকেননি, নিজ হাতে রুগ্ন ব্যক্তির সেবা করতেন। কোনো অসুস্থ ব্যক্তির খবর শুনলে তার বাড়িতে গিয়ে খোঁজ–খবর নিতেন এবং সেবা করতেন। অসুস্থ মানুষের কপালে হাত রাখতেন, দোয়া করতেন এবং তার পছন্দের খাবারের কথা জেনে তা এনে খেতে দিতে চেষ্টা করতেন। তিনি সাহাবীদের বলতেন, "তোমরা অসুস্থ ব্যক্তির সাথে দেখা করো"। (বুখারি শরিফ, হাদিস নং- ৫২৪৬)

অসুস্থ ব্যক্তি ধনী, গরিব, মুসলিম, অমুসলিম, আত্মীয়, অনাত্মীয় যেই হোক প্রিয়নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পার্থক্য না করে সাধ্যমতো সেবা করতেন। মদিনার এক ইয়াহুদির সন্তান অসুস্থ হলে তিনি তার বাড়িতে গিয়ে তার খোঁজ-খবর নেন।

তৃষ্ণার্ত মানুষের পিপাসা নিবারণ করা ইবাদত। বন্যাকবলিত অসহায় মানুষের মাঝে সুপেয় পানির ব্যবস্থা করা মহাপুণ্যের কাজ (যা আমাদের সশস্ত্র বাহিনী করে থাকেন)। মহানবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে তৃষ্ণার্তকে পানি পান করাবে, আল্লাহ পাক তাকে পবিত্র পানীয় পান করাবেন।" (আবু দাউদ শরিফ)

এক সাহাবী মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির হয়ে বললেন, "হে আল্লাহর রাসুল! আমার মা দুনিয়াতে নেই, তার কল্যাণের জন্য আমি উত্তম কী করতে পারি? প্রিয়নবী মাহবুবে খোদা হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ

করলেন, তার জন্য একটি সুপেয় পানির কূপ খনন করে তৃষ্ণার্তদের মাঝে পানি বিলিয়ে দাও।" (আবু দাউদ শরিফ)

বন্যাকবলিত অঞ্চলে বাংলাদেশের সামরিক ও বেসামরিক যৌথ সহযোগিতায় তৃষ্ণার্ত মানুষের পিপাসা নিবারণে সুপেয় পানির যে ব্যবস্থা করেন তার মাধ্যমে প্রিয়নবী হযরত মোহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহান উপদেশ বাস্তবায়ন হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তির পর সরকারের ব্যাপক উন্নয়নের পাশাপাশি সেনাবাহিনীর উন্নয়ন কর্মকাণ্ড প্রশংসিত হয়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থা, শিক্ষা, চিকিৎসা, কৃষি, কর্মসংস্থান, বাঙালি ও পাহাড়ীদের মধ্যে খেলাধূলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উন্নয়ন সবার চোখে পড়ার মতো জন কল্যাণমূলক কাজ।

বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত জলসীমায় সব ধরণের আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব বাংলাদেশ নৌবাহিনী ও কোস্টগার্ডের। সমুদ্রে যে কোনো ধরণের বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ, চোরাচালান নিয়ন্ত্রণ, জলদস্যু নিয়ন্ত্রণ ও অবৈধ সব ধরণের জনবল, মালামাল অনুপ্রবেশ এবং বহির্গমন প্রতিরোধ নৌবাহিনীর নেতৃত্বে হয়ে থাকে। এসব হিতকর্ম দেশ ও মানবকল্যাণকে কেন্দ্র করে হয়ে থাকে। মানুষ দেশ ও দেশের মানুষের কল্যাণের মধ্যদিয়ে জীবনের পরিধি বৃদ্ধি করতে পারে। সৈয়দ মুজতবা আলী বলেছেন, "জীবনটাকে লম্বায় বড় করা যায় না, পরিধিতে বাড়াতে চেষ্টা করুন"। আমরা মহান আল্লাহ পাকের নিকট হতে যতটুকু হায়াত নিয়ে এসেছি, তা টেনে লম্বায় বড় করতে পারব না কিন্তু মহামানবতার সেবার মাধ্যমে জীবনের পরিধিকে অনেক বৃদ্ধি করতে পারি।

ইসলাম ও শান্তিরক্ষী বাহিনী

ইসলাম অর্থ শান্তি, মুসলিম অর্থ শান্তিকামী। মহান আল্লাহ পাকের একটি নাম 'সালাম' অর্থ শান্তি, মহানবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলা হয় শান্তির অগ্রদূত। তিনি মদিনার যে পবিত্র ভূমিতে শুয়ে আছেন তার একটি নাম 'দারুস সালাম' বা শান্তির ঘর। তাঁর নবুয়ত প্রকাশিত হওয়ার আগেই তিনি আরবে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে 'হিলফুল ফুযুল' নামক সংগঠন গঠন করেছিলেন। এই সংগঠনের প্রধান লক্ষ্য ছিল, 'মক্কা নগরীতে কারো উপর অত্যাচার করা হলে সবাই সম্মিলিতভাবে সাহায্য করবে'। মানব ইতিহাসে একটি মহানবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এটি মহান এক দৃষ্টান্ত।

প্রিয়নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাণী নিয়ে কোনো দূতকে যখন অমুসলিম রাষ্ট্র প্রধানের নিকট প্রেরণ করতেন তখন সে দূত গিয়ে রাষ্ট্রপ্রধানকে বলতেন, "আসলিম তাসলাম" অর্থাৎ "শান্তিতে আসো, শান্তিতে থাকো"।

এক ইংরেজ লেখক লিখেছেন, "আমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণের আগে দুইজন মুসলমান দেখা হলে একটি আরবি বাক্য বলতে দেখি। আমি তাদের কাছে জানতে চাইলাম, তোমরা দেখা হলে কী যেন বলো? তারা আমাকে জানাল আমরা শান্তি বিনিময় করি। "আস্‌সালামু আলাইকুম বলি।" তিনি চিন্তা করলেন, ইউরোপ, আমরিকার মানুষরা দেখা হলে বলে 'গুডমর্নিং' সকালে ভালো থাকো বিকালে নয়, 'গুড ইভিনিং' বিকালে ভালো থাকো রাতে নয়, রাতে ভালো থাকে আগামীকাল নয়। ইসলাম ধর্মের নির্দেশ হলো একে অপরের সাথে দেখা হলে সাথে সাথে বলো 'আস্‌সালামু আলাইকুম', অর্থাৎ তোমার ওপর শান্তি বর্ষিত হউক, আজ নয়, কাল নয়, শুধু ইহকাল নয় অনন্তকাল শান্তি বর্ষিত হউক। সালামের পর মোসাফাহা (হাত মিলানো), তারপর মোয়ানাকা (গলাগলি) করা সুন্নাত। আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ (তোমার ওপর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক) বলে নামাজ শেষ করা ইসলামের বিধান।

মহান আল্লাহ পাক দুনিয়াতে ধ্বংসাত্মক কাজের বিপরীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার কথা বার বার



বলেছেন। তিনি পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করেছেন, "এবং তারা দুনিয়াতে ধ্বংসাত্মক কাজ করে বেড়ায় আর আল্লাহ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের পছন্দ করে না।" (সূরা: আল মায়িদা: আয়াত ৬৪)

মহানবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর অত্যাচার, অবিচার হয়েছে, তবু তিনি কোনোদিন কাউকে গালি দেননি, অভিশাপ দেননি, প্রতিশোধ নেননি, কাউকে আঘাত করেননি, কারো বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেননি, ক্ষতিসাধন করেননি, শুধু উচ্চারণ করেছেন, "আল্লাহুম্মা ইহদি কাওমি ফাইন্নাহুম লা ইয়ালামুন" অর্থাৎ "হে আল্লাহ! তুমি তাদেরকে হেদায়েত করা, তারা আমাকে বুঝেনি।" প্রিয়নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "মুমিনগণ সহনশীল ও নরম; যদি আকর্ষণ করা হয় তবে সে আকৃষ্ট হয়। আর যদি পাথরের ওপর উপবিষ্ট করানো হয় সে উপবিষ্ট হয়।" মহানবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শান্তি ও আদর্শের বাণী নিয়ে পৃথিবীতে আগমন করেছিলেন। তিনি শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য হুদাইবিয়ার সন্ধিতে 'রাসুলুল্লাহ' শব্দটি হযরত আলী (রাঃ) ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্বহস্তে কেটে দিয়েছিলেন। শান্তির জন্যই সে বছর তিনি যুদ্ধ না করে অনেকটা কাফিরদের পক্ষে সন্ধি করে মদিনায় ফিরে যান। অনেক মুসলমান সেদিন এ সিদ্ধান্তের সমালোচনা করলে তার সমর্থনে মহান আল্লাহ এ সন্ধি পরাজয় নয়, বরং নিশ্চিত জয় ঘোষণা করে কোরআনের আয়াত নাজিল করেন। পরবর্তী সময়ে এই কৌশলই পরাজয়ই নিশ্চিত করে মক্কা বিজয়।

শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল ধর্মের মানুষের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেই মদিনার রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করেছিলেন। তিনি মদিনায় বসবাসরাত ইয়াহুদিদের দশটি গোত্র, আওস ও খাযরায় গোত্রের বারটি উপগোত্র, মুসলমান ও পৌত্তলিকদের ঐক্যবদ্ধ করে মানব ইতিহাসের সর্বপ্রথম লিখিত সংবিধান 'মদিনা সনদ' সম্পাদন করে একটি নতুন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করেন। এই চুক্তিটি দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম অংশে ২৪টি ধারা এবং দ্বিতীয় অংশে ২৯টি ধারা। প্রথম অংশ মুসলমানদের অভ্যন্তরীণ সম্পর্ক এবং দ্বিতীয় অংশে আছে মদিনায় বসবাসরত সকল ধর্মের মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক। এই চুক্তির ২৬ নম্বর অনুচ্ছেদে স্পষ্ট লিখিত আছে, "বনু আওফের ইয়াহুদিরা মুসলমানদের সাথে একই জোটভুক্ত বলে গণ্য হবে। ইয়াহুদিদের জন্য তাদের ধর্ম, মুসলমানের জন্য তাদের ধর্ম, তাদের গোলামদের এবং তাদের নিজেদের ব্যাপারে একই কথা প্রযোজ্য হবে। তবে যে ব্যক্তি জুলুম বা অপরাধ করবে, সে তার নিজকে ছাড়া অন্য কাউকেই ক্ষতিগ্রস্ত করবে না"।

এই চুক্তির ফলে মদিনার মুসলিম অমুসলিম সকলে রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে মহানবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বীকার করে নেয়, মদিনার রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হয়, একটি আন্তর্জাতিক সমাজের সূচনা হয়, একটি বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠী ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম হয়, সকল ধর্মের স্বাধীনতা নিশ্চিত হয়, জুলুম, অত্যাচার নিষিদ্ধ হয়, গোত্রসমূহের কলহের অবসান হয়। ইসলাম শান্তির ধর্ম, মানবতার ধর্ম। মহানবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়ার মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁকে আমরা স্মরণ করি কিন্তু তার শান্তির পথ অনুসরণ করি না। স্মরণের মধ্যে যদি অনুসরণ না থাকে, সে স্মরণ ব্যর্থ হয়। কবি কাজী নজরুল ইসলাম লিখেছেন, "ভুলিয়া গিয়াছি তব আদর্শ তোমার দেখানো পথ।" আমাদের জাতীয় গৌরবের প্রতীক সশস্ত্র বাহিনী মহানবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেখানো শান্তির পথ ভুলে যাননি।

বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী বিশ্বব্যাপী জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী হিসেবে শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। ১৯৮৮ সাল হতে জাতিসংঘের অধীনে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর অসাধারণ ভূমিকা দেশের জন্য

বড় সম্মান বয়ে এনেছে।

অসাধারণ দেশপ্রেম, নেতৃত্বের প্রতি গভীর আস্থা, পেশাগত দক্ষতা ও শৃঙ্খলাবোধের কারণে বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বড় ধরণের সম্মান অর্জন করেছে।

আমাদের সশস্ত্র বাহিনী পৃথিবী নামক গ্রহটিতে শান্তি প্রতিষ্ঠায় অগ্রনী। একুশ শতকের বিজ্ঞান প্রযুক্তির যুগে বাংলাদেশ পৃথিবীর দূরের কোনো রাষ্ট্র নয়। সমগ্র পৃথিবীর কল্যাণ মানে বাংলাদেশেরও কল্যাণ।



মুহম্মদ মাসুম চৌধুরী। চট্টগ্রামের হাটহাজারী থানাধীন নাঙ্গলমোড়া ইউনিয়নের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১৯৬৮ সালের ২২ নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি চট্টগ্রাম গহিরা এফ কে জামিউল উলুম আলীয়া মাদরাসা হতে কৃতিত্বের সাথে আলিম (উচ্চ মাধ্যমিক) এবং চট্টগ্রাম সরকারী সিটি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ থেকে বিএ (অনার্স), এমএ পাশ করেন। ইসলামিক ফাউন্ডেশন চট্টগ্রাম বিভাগের ইমাম প্রশিক্ষণের সপ্তম ব্যাচে তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং বর্তমানে তিনি এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচির একজন দক্ষ প্রশিক্ষকের দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি একজন গবেষক, পিএইচডি ফেলো এবং চট্টগ্রামের বহুল প্রচারিত দৈনিক পূর্বদেশ ও আজাদী পত্রিকার নিয়মিত কলাম লেখক। চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত দৈনিক নয়া বাংলায় তিনি প্রতিদিন 'ইতিহাস এই দিনে' শিরোনামে কলাম লিখে ব্যাপক খ্যাতি অর্জন করেন। দুই যুগ ধরে দেশের বিভিন্ন সাময়িকী ও জার্নালে তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়ে আসছে। কয়েক বছর ধরে তিনি দৈনিক পূর্বদেশ পত্রিকার সহকারী সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বাঁশখালী মাস্টার নজির আহমদ (ডিগ্রী) কলেজের প্রাক্তন শিক্ষক এবং সমাজকর্মী ও চট্টগ্রাম আদর্শ লেখক ফোরামের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর লেখা প্রবন্ধ, নিবন্ধ ও কলাম দেশ বিদেশে পাঠকদের মধ্যে ব্যাপক সমাদৃত হওয়ায় তিনি বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত সভা-সেমিনারে আলোচক হিসেবে আমন্ত্রিত হয়েছেন। ভারতের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্বভারতী, রবীন্দ্র ভারতী, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও স্বনামধন্য অনেক প্রতিষ্ঠানে তিনি আমন্ত্রিত হয়ে বক্তব্য রেখেছেন। ছাত্র ও যুবকদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস-আত্মশক্তি ও অনুপ্রেরণা যোগাতে তিনি নিয়মিত বিভিন্ন কর্মশালায় অংশগ্রহণ ও কাউন্সেলিং করে যাচ্ছেন।



মুক্তিযুদ্ধ ও জাতীয়-আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ভূমিকা

উইং কমান্ডার মোঃ আসাদুজ্জামান, শিক্ষা

মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ভূমিকা

বাঙালি জাতির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সুদীর্ঘ দু'যুগের বেশি সময় ধরে সংগ্রাম করেছেন। তাঁর বিরামহীন আন্দোলন ও সংগ্রামী পথের সাথী ছিলেন বিমান বাহিনীর অনেক অকুতোভয় সদস্য। বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর এমনি একজন অকুতোভয় বীর শহীদ সার্জেন্ট এ কে এম জহুরুল হক। তিনি ছিলেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম অগ্রপথিক। তদানীন্তন পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর যেসব অকুতোভয় সদস্য পাকিস্তানি স্বৈরশাসন ও পরে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন তথা স্বাধীনতার দাবীতে স্বোচ্চার হয়েছিলেন সার্জেন্ট জহুরুল হক ছিলেন তাদের অন্যতম। ১৯৬৮ সালের 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য মামলা' নামক আগড়তলা ষড়যন্ত্র মামলার ৩৫ জন আসামির মধ্যে তিনি অন্যতম ছিলেন। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার কারনে তিনি কারাগারে ক্লোজ এ্যারেস্ট থাকা অবস্থায় ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ তারিখে পাকিস্তানি সেনাদের দ্বারা গুলিবিদ্ধ হন এবং শাহাদাত বরণ করেন। শুধু তাই নয় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উদাত্ত আহ্বানে সাড়া দিয়ে ১৯৭১ সালে সমগ্র জাতি যখন পরম আকাঙ্খিত স্বাধীনতা অর্জনে সর্বশক্তি নিয়োগ করে হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, তখন দেশকে শত্রুমুক্ত করতে বিমান বাহিনীর বীর যোদ্ধাগণ মুক্তিপাগল আপামর জনতার সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতাযুদ্ধে। নিজস্ব কোন যুদ্ধবিমান না থাকায় অনেকেই নিজেদের জীবন বাজী রেখে পাকিস্তান বিমান বাহিনী ত্যাগ করে সরাসরি মুক্তিবাহিনীর সাথে স্থলযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। মুক্তিযুদ্ধের ক্রান্তিলগ্নে ১৯৭১ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর নবগঠিত বিমান বাহিনীর সদস্যগণ ভারত সরকার কর্তৃক প্রদত্ত পুরনো এবং অসামরিক বিমান ও হেলিকপ্টারকে ব্যাপক সংস্কারের মাধ্যমে সামরিক যুদ্ধবিমানে রূপান্তরিত করে পাক হানাদার বাহিনীর উপর অসংখ্য সফল আক্রমণে তাদের যুদ্ধ করার ক্ষমতা বহুলাংশে হ্রাস করে। বিমান পরিচালনার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরণের অত্যাবশ্যকীয় যন্ত্রপাতি ছাড়াই নিজেদের জীবন বাজী রেখে বিমান বাহিনীর অকুতোভয় সদস্যগণ এই আক্রমণগুলো পরিচালনা করেছিলেন। যার ফলে আমাদের বিজয় তরান্বিত হয়। দেশের স্বাধীনতার জন্য অসীম সাহসিকতা ও অসাধারণ দক্ষতায় মুক্তিযুদ্ধকালীন সশস্ত্র বাহিনীর উপ-অধিনায়ক, বিভিন্ন সেক্টরের কমান্ডার ও সাব-সেক্টর কমান্ডার হিসেবে স্থল-যুদ্ধ পরিচালনায় অংশগ্রহণ ছাড়াও নিজেদের জীবনকে বিসর্জন দিতে কুণ্ঠাবোধ করে নি এই বাহিনীর সদস্যগণ।

১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে বিমান বাহিনীর বিভিন্ন পদবীর সদস্যগণ বিভিন্ন সেক্টরে সেক্টর কমান্ডার এবং ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের নিয়মিত সৈনিকদের সাথে সরাসরি সম্মুখযুদ্ধে লিপ্ত হন। মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে বিমান বাহিনীর ১১৩১ জন বীরযোদ্ধা নিয়মিতভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে বাহিনীকে করেছেন গর্বিত। তাঁদের মধ্যে ০১ জন বীরশ্রেষ্ঠসহ ২২ জন বীরযোদ্ধা মুক্তিযুদ্ধে সাহসী অবদানের জন্য বিভিন্ন বীরত্বপূর্ণ খেতাবে ভূষিত হন। দেশমাতৃকার শ্রেষ্ঠ সন্তান বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান ১৯৭১ সালের ২০ আগস্ট পাকিস্তানের মশরুর বিমান ঘাঁটি থেকে পাইলট অফিসার রশিদ মিনহাজকে দু আসন বিশিষ্ট একটি টি-৩৩ বিমান নিয়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণের জন্য রওনা হতে দেখে পূর্ব পরিকল্পনা মোতাবেক বিমানটি ছিনতাই করে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের পরিকল্পনা করেন। পরবর্তীতে ফ্লাইট লোফটেন্যান্ট মতিউর রহমান ও রশিদ মিনহাজের মধ্যে বিমানের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণের চেষ্টার সময় পাকিস্তান-ভারত সীমান্তের কাছাকাছি থাট্টা নামক স্থানে বিমানটি বিধ্বস্থ হলে

তিনি শাহাদত বরণ করেন। শহীদ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমানের দেশপ্রেম ও আত্মদানের স্বীকৃতি স্বরূপ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তাঁকে সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় খেতাব 'বীরশ্রেষ্ঠ' উপাধিতে ভূষিত করে। এছাড়াও উইং কমান্ডার খাদেমুল বাশার (পরবর্তীতে এয়ার ভাইস মার্শাল ও বিমান বাহিনীর প্রধান), স্কোয়াড্রন লীডার সুলতান মাহমুদ (পরবর্তীতে এয়ার ভাইস মার্শাল ও বিমান বাহিনী প্রধান) এবং স্কোয়াড্রন লীডার এম হামিদুল্লাহ খানসহ কয়েকজন বিভিন্ন সেক্টরে সেক্টর কমান্ডারসহ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। মুক্তিযুদ্ধের ৬ নং সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার ছিলেন তৎকালীন উইং কমান্ডার খাদেমুল বাশার। তাঁর অধীনে স্কোয়াড্রন লীডার সদরুদ্দীন অসীম (পরবর্তীতে এয়ার ভাইস মার্শাল ও বিমান বাহিনীর প্রধান) সাহসিকতার সাথে হাতিবান্ধা আক্রমণ করে পাক বাহিনীকে পরাস্ত করেন। এই সেক্টরে ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট ইকবাল অসীম সাহসিকতার সাথে পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। উইং কমান্ডার বাশারের সুচারু নেতৃত্বে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরের পূর্বেই এই সেক্টরের অর্ন্তভুক্ত সকল এলাকা শত্রুমুক্ত হয়। তিনি একজন বৈমানিক হয়েও অনবদ্য যুদ্ধকৌশল, দৃঢ় নেতৃত্ব এবং অসাধারণ গুণাবলীর কারণে মুক্তিযুদ্ধে বিজয় লাভের পর বাংলাদেশ সেনা বাহিনীর ৭২ পদাতিক বিগ্রেডের প্রতিষ্ঠাকালীন কমান্ডারের দায়িত্ব সফলভাবে পালন করেন যা একটি বিরল দৃষ্টান্ত। ১নং সেক্টরে যুদ্ধের ইতিহাসে স্কোয়াড্রন লীডার সুলতান মাহমুদ- এর অসাধারণ বীরত্বের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি কয়েকজন বিশেষ ট্রেনিংপ্রাপ্ত এবং কিছুসংখ্যক নিয়মিত সৈন্য নিয়ে ৩ অক্টোবর দুঃসাহসী অভিযান চালিয়ে শহর থেকে প্রায় মাইলখানেক দূরে মদুনা ঘাট বৈদ্যুতিক সাব-ষ্টেশন ধ্বংস করেন। চট্টগ্রাম এলাকার বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করার জন্য তাঁর এই একক অভিযান দৃষ্টান্ত স্বরূপ। একই সঙ্গে বহুসংখ্যক বৈদ্যুতিক পাইলনও উড়িয়ে দেন। এতে কাপ্তাই থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে পড়ে। স্কোয়াড্রন লীডার সুলতান মাহমুদ ডান পায়ে গুলিবিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও অসীম সাহসী মনোভাবের এর কারণে সফলভাবে অভিযানটি সম্পন্ন করতে সক্ষম হন। আরও উল্লেখ্য যে ১ নং সেক্টরের সেক্টর এ্যাডজুট্যান্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ফ্লাইং অফিসার শাখাওয়াত হোসেন। ১১ নং সেক্টরটি গঠিত ছিল ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল জেলা নিয়ে যার কমান্ডার ছিলেন তৎকালীন মেজর আবু তাহের (পরবর্তীতে কর্নেল) এবং উক্ত সেক্টরের মানকারচর সাব-সেক্টরের কমান্ডার ছিলেন স্কোয়াড্রন লীডার এম হামিদুল্লাহ খান। ১৯৭১ সালের ১৩ নভেম্বর মেজর তাহের গুরুতর আহত হলে স্কোয়াড্রন লীডার হামিদুল্লাহ খান সেক্টর কমান্ডারের দায়িত্ব পান এবং তাঁর অকুতোভয় মনোভাব, সাহসী যুদ্ধ পরিচালনার কারণে বিপুল সংখ্যক পাকিস্তানি সেনা হতাহত হয়ে অবশেষে পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হয়। এখানে উল্লেখ্য যে স্কোয়াড্রন লীডার হামিদুল্লাহ খানের অধীনে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর অকুতোভয় বিমানসেনা সার্জেন্ট ভুইয়ার নেতৃত্বে রেল ও সড়কপথে জামালপুরের সাথে ঢাকা ও ময়মনসিংহের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করার জন্য প্রায় ৫০০ মুক্তিযোদ্ধা পাঠানো হয় এবং সফল ভাবেই তারা এই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করার কাজটি সম্পন্ন করে যার ফলে পাক বাহিনীর চলাচল সীমিত হয়ে যায় যা মুক্তিযুদ্ধে আমাদের চূড়ান্ত বিজয়কে তরান্বিত করে। ৯ নং সেক্টরে ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট সলিম উল্লাহ অসীম সাহসিকতা ও দক্ষতার সাথে শমশেরনগর সাব-সেক্টর কমান্ডার হিসেবে পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে স্থলযুদ্ধে বিশেষ পারদর্শীতা প্রদর্শন করেন। এই সেক্টরের স্টাফ অফিসার হিসেবে ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট ফজলুল হক সফলভাবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া মুক্তিযুদ্ধকালীন ৪ নং সেক্টরে ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট নুরুল কাদের, ৮ নং সেক্টরে ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট ইকবাল রশিদ ও ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট জামাল উদ্দীন চৌধুরী সংগঠক ও সমন্বয়কারী হিসেবে সফলভাবে দায়িত্ব পালন করেন ।

বাংলার স্বাধীনতা সূর্য যখন মধ্য গগনে ঠিক সেই মুহূর্তে বিজয়কে ত্বরান্বিত করতে পাকিস্তান বিমান বাহিনীর পক্ষ ত্যাগকারী বাঙালি বৈমানিক, কারিগরী পেশার বিমানসেনা





এবং পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ার লাইন্স (পিআইএ)'র বেসামরিক বৈমানিকদের সমন্বয়ে তৎকালীন স্কোয়াড্রন লীডার সুলতান মাহমুদের নেতৃত্বে অসামান্য ত্যাগ ও তিতিক্ষায় জন্ম নেয় ঐতিহাসিক 'কিলো ফ্লাইট'। কিলো ফ্লাইটের বীর বৈমানিকদের বীরোচিত আকাশ যুদ্ধ দেশের স্বাধীনতা অর্জনে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে। পরবর্তীতে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ প্রাথমিকভাবে দুটি ফিক্সড উইং এয়ারক্রাফট এবং একটি রোটারী উইং এয়ারক্রাফট বাংলাদেশ বিমান বাহিনী গঠনের জন্য উপহার হিসেবে দেয়। ফিক্সড উইং এয়ারক্রাফটগুলোর একটি ছিল ডিসি-৩ (ডাকোটা) ও অপরটি ছিল ডিএইচসি-৩ (অটার) রোটারী উইং এয়ারক্রাফট এবং এ্যালুয়েট-III হেলিকপ্টার। ডিসি-৩ ডাকোটা বিমানটি যোধপুরের মহারাজার ব্যক্তিগত বিমান ছিল। এ বিমান তিনটি সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি নাগাল্যান্ডের ডিমাপুরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ের ৫০০০ ফুট দীর্ঘ একটি পরিত্যক্ত রানওয়েতে নিয়ে রাখা হয়। যেহেতু এ রানওয়েটি ব্যবহৃত হতো না কাজেই বিমান ওঠা-নামার জন্য প্রয়োজনীয় এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল, র‍্যাডার ইত্যাদি কিছুই ছিল না। প্রতিটি বিমানের জন্য তিনজন করে পাইলটকে নির্বাচন করা হয়। ভারতীয় বিমান বাহিনী কর্তৃক প্রদত্ত এই তিনটি বেসামরিক বিমানকে যথাযথ পরিবর্তন সাধন করে যুদ্ধের উপযোগী করে তোলা হয়। যুদ্ধে ব্যবহারের জন্য এগুলোতে কিছু সংযোজন ও কিছু বিয়োজন করতে হয়েছিল যা স্বাভাবিক সময়ে ছিল অকল্পনীয়। সাধারণ অবস্থায় এইসব বিমানকে যুদ্ধে ব্যবহারের অনুমতি দেওয়ার কোনো সুযোগই ছিল না। কিন্তু অন্য কোন উপায় না থাকায় এই তিনটি বিমানকে যুদ্ধে ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা হয়। ১৯৭১ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর পতাকা উত্তোলন করা হয়। নবগঠিত বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর সদস্যগণ ১৯৭১ সালের ৩ ডিসেম্বর মধ্যরাতে পাক-হানাদারদের উপর প্রথমে অটার বিমান এবং অ্যালুয়েট হেলিকপ্টারের মাধ্যমে আক্রমণ পরিচালনা করে। ১৯৭১ সালের ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত অটার বিমান এবং অ্যালুয়েট হেলিকপ্টারের মাধ্যমে ৪৫টির অধিক বিমান অভিযান সাফল্যের সাথে পরিচালনা করা হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে চট্টগ্রামের ইষ্টার্ন রিফাইনারির তেল ডিপো, নারায়ণগঞ্জের গোদনাইল তেল ডিপো, সিলেট, শ্রীমঙ্গল, কুমিল্লার দাউদকান্দি, নরসিংদী এবং ভৈরববাজারসহ বিভিন্ন এলাকায় সফল অপারেশনের মাধ্যমে পাক হানাদার বাহিনীর বিপুল ক্ষতিসাধন করতে সক্ষম হয়। এর ফলে শত্রুর অপারেশনাল কার্যক্রমের সক্ষমতাসহ যুদ্ধ পরিচালনার মনোবল হ্রাস পায় যা আমাদের মহান বিজয় অর্জনকে তরান্বিত করে। তাদের এই সাহসী পদক্ষেপ বাংলার স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগ করে নতুন মাত্রা।

স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ভূমিকা

মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের রণাঙ্গনে যে বিমান বাহিনীর জন্ম হয়েছিল, কালের পরিক্রমায় তা আজ একটি পরিপূর্ণ ও সুসজ্জিত বাহিনী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। প্রথম থেকেই জাতির প্রত্যাশাকে সর্বোচ্চ মানদণ্ডে রেখে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী আকাশ প্রতিরক্ষা ও আকাশ নিয়ন্ত্রণ এর মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তামূলক কর্মকাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। জাতীয় প্রয়োজনে আকাশ পথে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, দ্রুত ত্রাণ সরবরাহ এবং চিকিৎসা সেবা সহায়তা প্রদানে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী সকল সময়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে। বিশেষত: ভয়াবহ বন্যা, পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের আন্দোলন দমনে সহায়তাসহ অন্যান্য সঙ্কটপূর্ণ পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর সক্রিয় অংশগ্রহণ বিশেষভাবে সমাদৃত। এ ছাড়া দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং বিভিন্ন দুর্ঘটনা পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী সবার আগে অনুসন্ধান ও উদ্ধার তৎপরতায় অংশ নিয়ে থাকে। দুর্গম পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং উপকূলীয় অঞ্চলে দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে সকলের আগে ত্রাণ এবং চিকিৎসা সহায়তা নিয়ে উপস্থিত হয় বাংলাদেশ বিমান বাহিনী। দেশের

পাশাপাশি আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও বিশ্ব শান্তিরক্ষা এবং বিভিন্ন দেশে যে কোন দুর্যোগপূর্ণ এলাকায় বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর সদস্যগণ গত দুই যুগেরও বেশি সময় ধরে বিভিন্ন পর্যায়ে সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করে আসছে।

• **দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা:** বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ৫ নং বহর, ৮ নং বহর, ২১ নং বহর, ২৫ নং বহর ও ৩৫ নং বহর ফাইটার স্কোয়াড্রন নামে পরিচিত। আকাশ প্রতিরক্ষা এবং ট্যাকটিক্যাল এয়ার অপারেশন ইত্যাদি কার্যক্রম ছাড়াও বৈমানিকদের ফাইটার কনভারশন কোর্স পরিচালনায় এই বহরগুলো মূখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। এ ছাড়াও মাতৃভূমির স্বার্বভৌমত্ব রক্ষার্থে শত্রু বা অপরিচিত বিমানকে বাধা প্রদান, প্রয়োজনবোধে ভূ-পাতিত করা, শত্রুর বিমান ঘাঁটি/গুরুত্বপূর্ণ স্থানে আঘাত হানা, বোমারু বিমানকে সাহায্য করা, সেনা ও নৌবাহিনীকে সাহায্য করা, আর্মড রেকি, কমব্যাট এয়ার প্যাট্রোল মিশন ইত্যাদি ফাইটার স্কোয়াড্রনসমূহের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। এ সকল দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে স্কোয়াড্রনসমূহ নিয়মিত প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে বিভিন্ন বিমান মহড়া, যৌথ মিশন, ফ্লাইপাস্ট এবং সমরাস্ত্র মহড়ায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে থাকে।

• **পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠা:** বাংলাদেশ বিমান বাহিনী দেশের প্রয়োজনে সার্বক্ষণিকভাবে বহুমুখী এবং বিস্তৃত কার্যক্রমের মাধ্যমে জাতীয় নিরাপত্তা ও সংকট সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। বিমান বাহিনী, সেনাবাহিনী এবং সীমান্তরক্ষী বাহিনীকে দেশের দক্ষিণ-পূর্ব পার্বত্য অঞ্চলে বিশৃঙ্খলা দমন করতে সহায়তা প্রদান করে বর্তমান সরকারের ঐতিহাসিক 'শান্তি চুক্তি' বাস্তবায়নের মহান কার্যক্রমকে সমুন্নত করেছে। চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রেখে জাতীয় নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার মন্ত্রে দীক্ষিত বিমান বাহিনীর দৃঢ়প্রত্যয়ী ও অকুতোভয় বৈমানিকগণ দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় দুঃসাহসী সব অভিযান পরিচালনা করে আসছে যা পূর্বে অপারেশন 'আকাশপথ' এবং বর্তমানে অপারেশন 'শান্তির ঈগল' নামে অব্যাহত আছে। বাংলাদেশ বিমান বাহিনী দেশের যেকোন জরুরি পরিস্থিতিতে সাড়া দেয়া ছাড়াও দৈনন্দিন কার্যক্রমের মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় কর্তব্যরত সেনা, নৌ ও সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সদস্যদের জন্য রসদ বহন, জরুরি সৈনিক পরিবহন, আহত ও অসুস্থ সদস্যকে তাৎক্ষণিক উন্নত হাসপাতালে স্থানান্তর এবং শান্তিকালীন সময়ে যেকোন কার্যক্রমে সর্বাত্মক অংশগ্রহণ করছে।

• **জাতীয় পরিচয়পত্র/ভোটার আইডি কার্ড প্রস্তুত এবং সুষ্ঠুভাবে জাতীয় নির্বাচনসমূহ সম্পন্ন করার বিষয়ে সহায়তা:** বিমান বাহিনীর সদস্যরা বিভিন্ন সময় অনুষ্ঠিত জাতীয় নির্বাচনসমূহে বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা প্রদান করেছে। অপারেশন 'নবযাত্রা'র অধীনে জাতীয় পরিচয়পত্র/ভোটার আইডি কার্ড তৈরির কার্যক্রম পরিচালিত হয়। জাতীয় এ মহান ও গুরুত্বপূর্ণ কাজে অন্যান্য সংস্থার পাশাপাশি বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর কর্মকর্তা ও বিমানসেনাগণও প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া জাতীয় সংসদ নির্বাচন, উপজেলা নির্বাচন এবং সম্প্রতি ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনসমূহে প্রত্যন্ত এলাকায় ভোট গ্রহণ সংক্রান্ত সরাঞ্জামাদি পরিবহণ করে সুষ্ঠভাবে নির্বাচন পরিচালনায় সহায়তা করে আসছে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী।

• **মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট প্রদানে সহায়তা প্রদান:** বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে এবং আধুনিক বিশ্বের প্রয়োজনের সাথে তাল মেলাতে মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট প্রদানে বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশনায় বিমান বাহিনীর চৌকস সদস্যবৃন্দ একাজে নিয়োজিত রয়েছে। এছাড়াও প্রবাসীদের মধ্যে দ্রুততার সাথে মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট প্রদানের জন্য মধ্যপ্রাচ্য এবং এশিয়ায় অবস্থিত দূতাবাস ও হাইকমিশনসমূহে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর সদস্যদের নিয়োজিত করা হয় যার মাধ্যমে স্বল্প সময়ে এবং নির্ভুলভাবে বর্ণিত পাসপোর্টসমূহ প্রবাসীদের হাতে পৌছানোর ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।









● **জাতীয় দুর্যোগ মোকাবিলায় বিমান বাহিনীর কার্যক্রম:** যে কোন দুর্যোগময় মুহূর্ত মোকাবেলা করতে বিমান বাহিনী তার দৈনন্দিন কার্যক্রমের সাথে বছরের ৩৬৫ দিনই বিমান বাহিনীর মূল ঘাঁটিসমূহে ৩ টি হেলিকপ্টার ২৪ ঘন্টা উদ্ধার ও অনুসন্ধান (Search and Rescue) এর জন্য প্রস্তুত রাখে। আকাশ প্রতিরক্ষার সাথে সাথে বিমান বাহিনীর এই হেলিকপ্টারগুলো দেশের যে কোন স্থানের দুর্যোগ, মেডিকেল ইভাকুয়েশন, ক্যাজুয়ালটি ইভাকুয়েশন, উদ্ধার এবং অনুসন্ধান কার্যে সদা প্রস্তুত থাকে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বিপর্যস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থায় যেখানে সড়ক ও নৌ পথে পৌঁছানো দুষ্কর, সেসব স্থানে দ্রুততর সময়ে এবং সর্বাগ্রে হেলিকপ্টার ও পরিবহণ বিমান নিয়ে আর্ত মানবতার সেবায় এগিয়ে এসেছে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী। ১৯৮৫ সালে প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়ে উপকূলীয় দ্বীপ উড়িরচর অঞ্চলে বিমান বাহিনীর ত্রাণ বিতরণ ও উদ্ধার অভিযান সর্বজন স্বীকৃত। ১৯৮৫ সালে উড়িরচরের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়, ১৯৮৮ এবং ১৯৯৬ সালের দেশব্যপী ভয়াবহ বন্যা, দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া ১৯৯১ সালের সর্বনাশা জলোচ্ছ্বাস, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া ২০০৭ সালের ভয়ংকর ঘূর্ণিঝড় সিডর এবং ২০০৯ সালের ঘূর্ণিঝড় আইলাসহ অন্যান্য দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে বিমান বাহিনীর সক্রিয় অংশগ্রহণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

● **আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর কার্যক্রম:** বাংলাদেশ বিমান বাহিনী দেশের অভ্যন্তরে দুর্গত মানুষের সেবায় কাজ করার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী দুর্গত মানুষের সাহায্যার্থে বিভিন্ন দেশে ত্রাণ ও চিকিৎসা সামগ্রী পৌঁছে দিয়েছে। এ সকল কার্যক্রম আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের ভাবমূর্তিতে করেছে সমুন্নত।

• **ভারতের গুজরাটে ভূমিকম্প:** ২০০০ সালে ভারতের গুজরাটের ভূজ শহরে ভূমিকম্পের ধ্বংসলীলায় ক্ষতিগ্রস্ত বিপন্ন মানুষের সাহায্যার্থে ২০ দিন ব্যাপী ৩০টি মিশন পরিচালনা করে। এ সময় বিমান বাহিনীর সদস্যরা প্রায় ৫৭,০০০ কেজি ত্রাণ সামগ্রী ভারতের দুর্গত মানুষের মাঝে পৌঁছে দেয়।

• **শ্রীলংকা ও মালদ্বীপে সুনামী:** ২০০৪ সালে শ্রীলংকা ও মলদ্বীপে সংঘটিত সুনামী পরবর্তীতে বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশে দেশসমূহের ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যার্থে ২৯ দিন ব্যাপী প্রায় ১২১ ঘন্টার ৩৬টি উড্ডয়ন মিশন পরিচালনা করে। এ সময় বিমান বাহিনীর সদস্যরা ত্রাণসামগ্রী বহনের পাশাপাশি ১২৫ জন যাত্রী বহন করে।

• **পাকিস্তানে ভূমিকম্প:** বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশক্রমে ২০০৫ সালের অক্টোবরে পাকিস্তানে ঘটে যাওয়া প্রলয়ঙ্করী ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর সি-১৩০ বিমানে করে ১৫ জন যাত্রী এবং ১৮,৪৯১ কেজি ত্রাণসামগ্রী প্রেরণ করা হয়। উক্ত ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সাহায্যার্থে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী দুই দিন ব্যাপী তিনটি উড্ডয়ন মিশন পরিচালনা করে ।

• **মালদ্বীপের বন্যা:** বাংলাদেশ বিমান বাহিনী ২০০৭ সালে মালদ্বীপে সংঘটিত বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশে ছয় দিন ব্যাপী উড্ডয়ন মিশন পরিচালনা করে দেশের জন্য সুনাম বয়ে আনে।

• **মিয়ানমারে ঘূর্ণিঝড় নার্গিস:** গত ২ মে ২০০৮ স্মরণকালের ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় 'নার্গিস' এর আঘাতে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ মায়ানমারের জনগণের সাহায্যার্থে ৭ মে ২০০৮ তারিখে বাংলাদেশ সরকার প্রদত্ত ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে এবং উদ্ধার কাজে ও সহায়তা করতে মায়ানমারের উদ্দেশ্যে সি-১৩০ পরিবহন বিমান রওয়ানা হয়।

উল্লেখ্য যে, গত ৮ মে ২০০৮ তারিখে অনুরূপ আরেকটি বিমান সি-১৩০ পরিবহন বিমান ত্রাণ সামগ্রী ও উদ্ধারকারী দল নিয়ে মায়ানমার গমন করেন। মায়ানমারের ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সাহায্যার্থে ত্রাণ-সামগ্রী নিয়ে মোট ৫ দিন ব্যাপী প্রায় ১৪ ঘন্টার উড্ডয়ন মিশন পরিচালনা করে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর সি-১৩০ পরিবহন বিমান।

• **চীনে ভূমিকম্প:** গত ১২ মে ২০০৮ তারিখে চীনের চেংদু শহরে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ ভমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য বাংলাদেশ সরকার প্রদত্ত ত্রাণ সামগ্রী গত ২৮ মে ২০০৮ তারিখে বিমান বাহিনীর সি-১৩০ পরিবহন বিমানে করে চীনে প্রেরণ করা হয়। উক্ত ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যার্থে বিমান বাহিনী প্রায় ৯ ঘন্টা ৪০ মিনিটের উড্ডয়ন মিশন সম্পন্ন করে বাংলাদেশের ত্রাণ- সামগ্রী পৌঁছে দেয়।

• **জাপানে সুনামি:** ১১ মার্চ ২০১১ তারিখে ভূমিকম্প ও সুনামির আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত জাপানিদের পাশে দাঁড়াতে বাংলাদেশ সরকারের ৪ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল প্রায় ৬২৫৬ কেজি চিকিৎসা সামগ্রী, ওষুধ, কম্বল, শুকনো খাবার ও দুর্যোগ মোকাবেলার সরঞ্জাম নিয়ে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর একটি সি-১৩০ পরিবহণ বিমান ২৯ মার্চ ২০১১ তারিখে জাপানে গমন করে।

• **নেপালে ভূমিকম্প:** ২৫ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে নেপালে সংঘটিত প্রলয়ঙ্করী ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্থ মানুষদের জন্য মানবিক সহায়তা নিয়ে পাশে দাঁড়ায় বাংলাদেশ। বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের ব্যবস্থাপনায় চিকিৎসক দলসহ বিপুল পরিমাণ বিশুদ্ধ খাবার পানি, শুকনো খাবার, তাঁবু, কম্বল ও ঔষধসহ অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী নিয়ে ৪৬ সদস্যের একটি দল ২৬ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে বিমান বাহিনীর একটি সি-১৩০ পরিবহন বিমান নেপাল গমন করে। উল্লেখ্য, নেপালে বসবাসরত ৬৯ জন বাংলাদেশী নাগরিককে বিমান বাহিনীর ত্রাণবাহী বিমানের মাধ্যমে নিরাপদে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়। বাংলাদেশ বিমান বাহিনী ২দিন ব্যাপী প্রায় ২২ ঘন্টার উড্ডয়ন মিশনের মাধ্যমে ৬৬৮৮০ কেজি ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছে দিয়ে ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করে।

• **শ্রীলংকায় বন্যা ও ভূমিধস:** সম্প্রতি শ্রীলংকায় সংঘটিত ভয়াবহ বন্যা ও ভূমিধ্বসে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সাহায্যার্থে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী গত ২৭ মে ২০১৬ তারিখে ঔষধসহ ত্রাণসামগ্রী শ্রীলংকায় পৌঁছে দেয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের তত্ত্বাবধানে পানি বিশুদ্ধকরণ সরঞ্জাম, তাঁবু, জেনারেটর, ঔষধসহ অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী নিয়ে ১৯ সদস্যের একটি দল বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর একটি সি-১৩০ পরিবহন বিমানের মাধ্যমে শ্রীলংকায় গমন করে।

উপরোক্ত আন্তর্জাতিক মিশনসমূহ পরিচালনা করে বিপদে বন্ধুপ্রতীম দেশসমূহকে সাহায্য করার মহান ব্রতের বার্তা পৌঁছে দিয়েছে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী। ফলে বাংলাদেশের সাথে বন্ধুপ্রতীম দেশসমূহের কূটনৈতিক সম্পর্ক আরো সুদৃঢ় হয়েছে।

● **নারীর ক্ষমতায়নে অবদান:** কর্মক্ষেত্রে নারীর ক্ষমতায়ন এবং সম-অধিকার সুনিশ্চিত করতে ২০০০ সাল থেকে বিমান বাহিনীতে নিয়মিতভাবে মহিলা কর্মকর্তাগণ কমিশন লাভ করছেন। বর্তমানে বিমান বাহিনীর গর্বিত সদস্য হিসেবে মহিলা কর্মকর্তাগণ নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে তাদের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে চলেছেন। সম্প্রতি বিমান বাহিনী প্রথমবারের মত মহিলা সামরিক বৈমানিক নিয়োগ দেয়। ইতোমধ্যে কয়েকজন মহিলা কর্মকর্তা সামরিক বৈমানিক হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন এবং এ প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে।





● **জাতীয় শিক্ষা কার্যক্রম:** বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গনে বিএএফ শাহীন কলেজ একটি ঐতিহ্যমন্ডিত গৌরবময় নাম। দেশের ভবিষ্যত প্রজন্মকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে বিএএফ শাহীন কলেজ অগ্রণী ভূমিকা রেখে চলেছে। বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর বিভিন্ন ঘাঁটি সমূহে ৭ টি বিএএফ শাহীন স্কুল ও কলেজ রয়েছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোতে সর্বমোট ২০,৯৯৫ জন শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত আছে। জাতীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত পরীক্ষাসমূহে এসকল স্কুল ও কলেজের পাসের হার প্রায় শতভাগ। বাংলাদেশ বিমান বাহিনী পরিচালিত বিএএফ শাহীন স্কুল ও কলেজসমূহে বিমান বাহিনীর সদস্যদের সন্তান ছাড়াও স্থানীয় জনসাধারণের সন্তানরাও উন্নত পরিবেশে শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে উপকৃত হচ্ছে। বিএএফ শাহীন কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা উল্লেখযোগ্য সংখ্যক জিপিএ-৫ সহ শতভাগ পাশের হার অর্জন করে চলেছে।

● **জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী:** বিশ্ব-শান্তি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের অঙ্গীকার বাস্তবায়নে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে আসছে। ১৯৯৩ সাল থেকে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী এই পর্যন্ত ২৫টি শান্তিরক্ষা মিশনে অত্যন্ত সফলতার সাথে অংশগ্রহণ করেছে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের সুনাম বৃদ্ধি করেছে। শান্তিরক্ষা মিশনসমূহে শান্তিরক্ষায় নিয়োজিত বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর পরিবহন ও হেলিকপ্টার কন্টিনজেন্টসমূহ দীর্ঘ ১৮ বছর ধরে উড্ডয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। অদ্যাবধি, বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর সর্বমোট ৪২৩২ জন সদস্য শান্তিরক্ষার কাজে পৃথিবীর বিভিন্ন শান্তিরক্ষা মিশনে অত্যন্ত সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমানে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ৯ টি Mi-17 হেলিকপ্টার (৬ টি কঙ্গো প্রজাতন্ত্রে ও ৩ টি হাইতিতে)। তাছাড়া বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ৩ টি Mi-17 হেলিকপ্টারসহ ১১০ সদস্য বিশিষ্ট একটি নতুন কন্টিনজেন্ট হাইতিতে এবং ৩ টি Mi-17 হেলিকপ্টারসহ ২ টি নতুন কন্টিনজেন্ট মালিতে গমন করেছে। বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর হেলিকপ্টারগুলো জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে মোতায়েন, বিদ্রোহী মিলিশিয়া অধ্যুষিত অঞ্চলে অপারেশনাল কার্যক্রম ও প্রেফতার, ক্যাজুয়ালটি ইভাকুয়েশন, মেডিক্যাল ইভাকুয়েশন, বহুজাতিক বাহিনীর অপহৃত সৈন্য উদ্ধার, জরুরী অবস্থা মোকাবিলা করা, লজিস্টিক সহায়তা, নির্বাচনী কর্মকাণ্ডে সহায়তা ইত্যাদি কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। তাছাড়া বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ১ টি C-130 পরিবহন বিমান কঙ্গো প্রজাতন্ত্রে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে উড্ডয়ন পরিচালনা করছে। শুরু থেকে বিভিন্ন অপারেশনাল মিশনে দক্ষতা, ত্যাগ, সাহসিকতা, বিশ্বস্ততা ও পেশাদারিত্বের পরিচয় দিয়ে এই ইউনিটটি কঙ্গো শান্তিরক্ষী বাহিনীর একটি অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। সৈন্য পরিবহন, অনুসন্ধান ও উদ্ধার, নির্বাচনী কাজে সহায়তা, রসদ পরিবহন এই Unit এর উল্লেখযোগ্যা কার্যক্রমের অংশ। তাছাড়া শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর এয়ারফিল্ড সার্ভিসেস ইউনিটসমূহ অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল, ফ্লাইট ফলোয়িং, ওয়েদার ফোরকাষ্টিং, মুভমেন্ট কন্ট্রোল, এয়ারক্রাফট মার্শালিং, ফায়ার ফাইটিং, ফাষ্ট এইড ট্রিটমেন্ট সহায়তা দিয়ে আসছে।

মহান স্বাধীনতাযুদ্ধে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর সদস্যগণের অবদান সমগ্র জাতি তথা ভবিষ্যত প্রজন্মের নিকট দেশপ্রেমের এক অনন্য উদাহরণের সৃষ্টি করেছে যা বাঙালি জাতির ইতিহাসে একটি গৌরবময় অধ্যায় হিসেবে চির স্বরণীয় হয়ে থাকবে। এছাড়া বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর যুদ্ধকালীন এবং শান্তিকালীন কার্যক্রমের সাফল্য আজ দেশের গণ্ডি পেড়িয়ে বহির্বিশ্বেও ছড়িয়ে পড়েছে। প্রযুক্তি নির্ভর ও আধুনিক এ বাহিনী দেশের প্রয়োজনে ও সকল সময় জনগণের পাশে দাড়িয়েছে এবং ভবিষ্যতেও যেকোন সংকটে দেশের জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগের জন্যও সদা প্রস্তুত।

তথ্যসূত্র

১। বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ইতিহাস- ১৯৮৭।

২। ভূঁইয়া, মেজর কামরুল হাসান, বিহঙ্গের ডানা- মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী, জুলাই ২০১২।

৩। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, দলিলপত্র : দশম খণ্ড, তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ডিসেম্বর ২০০৩।

৪। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ইতিহাস, প্রথম খণ্ড. বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, মে ২০১৫।

৫। ডিসপ্লে বোর্ড, বিজয়কেতন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, ঢাকা সেনানিবাস।

৬। কবির, মোঃ শাহজাহান, বীর প্রতীক, একাত্তরের খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের বীরগাঁথা,ডিসেম্বর ২০১৫।

৭। বিমান বাহিনীর বিভিন্ন ঘাঁটি/উইং/স্কোয়াড্রন/ইউনিটসমূহ থেকে প্রাপ্ত তথ্য।

৮। উইকিপিডিয়া।

৯। ইন্টারনেট।



উইং কমান্ডার মোঃ আসাদুজ্জামান ২৮ জুন ১৯৯৯ তারিখে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীতে শিক্ষা শাখায় কমিশন লাভ করেন। তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক সম্মানসহ স্নাতকত্তোর এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমবিএ ডিগ্রি লাভ করেন। এছাড়া তিনি বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট থেকে 'পারসোনেল ম্যানেজমেন্ট' পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা সম্পন্ন করেন। তিনি দেশ বিদেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ সফলতার সাথে সম্পন্ন করেন। পেশাগত জীবনে তিনি বাংলাদেশ বিমান বাহিনী একাডেমি ও বিমান বাহিনী তথ্য ও নির্বাচনী কেন্দ্রসহ বিভিন্ন ঘাঁটিতে, বিমান সদরে অনুষ্ঠান ও কল্যান পরিদপ্তরে এবং স্কোয়াড্রন অধিনায়ক হিসেবে বিএনসিসিতে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন কঙ্গোতে দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে তিনি বিমান বাহিনী সদর দপ্তরে উপ-পরিচালক, শিক্ষা এবং সম্পাদক এয়ার রিজিয়ন, বাংলাদেশ স্কাউটস হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।



অগ্নি নির্বাপনে ব্যক্তি সামর্থ্য ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ আইয়ুব আনসারী, পিএসসি

সাধারণ

আগুন ও আগুনের ব্যবহার মানব সভ্যতার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আদিম সভ্যতা বা প্রস্তর যুগে মানুষ পাথরের সাথে পাথরের ঘর্ষণের মাধ্যমে আগুন সৃষ্টি করত। সে আগুন পাথরের তৈরি হাতিয়ারে ধার বা শান দেওয়া এবং বন্য প্রাণীর মাংস সিদ্ধ বা পুড়িয়ে খাবার উপযোগী করা, ইত্যাদি কাজে ব্যবহার করা হতো। সভ্যতার ক্রমবিকাশের সাথে সাথে আগুন উৎপাদন ও ব্যবহারে ভিন্ন মাত্রা যুক্ত হয়েছে। আগুন ছাড়া গৃহস্থালি কাজ তথা রান্না-বান্না, কলকারখানায় উৎপাদন, যান্ত্রিক যানবাহন ও বিভিন্ন যন্ত্রপাতি চালানো কল্পনাও করা যায় না। তবে প্রাচীন যুগে আগুন উৎপাদন পদ্ধতি এবং সীমিত ব্যবহারের তুলনায় আধুনিক শিল্পোন্নত যুগে অগ্নি উৎপাদন ও ব্যবহার বহুমাত্রিক এবং ব্যাপক। একটি দিয়াশলাইয়ের কাঠি, রান্নাঘরের বার্নার এবং গ্যাস লাইটার থেকে সৃষ্ট অগ্নিশিখা নিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের মাধ্যমে রান্না-বান্না বা কলকারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ব্যবহার করা হয়। আগুন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে তা মারাত্মক বিভীষিকা সৃষ্টি করে জানমালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতিসহ জনপদে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে পারে। জঙ্গল ফায়ার, আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাত, গ্যাসক্ষেত্রের আগুন, পেট্রোল পাম্প ও ট্যাংক লরির আগুন, তৈলকূপ, গোলাবারুদাগার, ইত্যাদিতে দুর্ঘটনায় সৃষ্ট অগ্নিকাণ্ড এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

সাধারণত যে কোনো অগ্নি দুর্ঘটনায় মানুষ পানি ব্যবহার করে অগ্নি নির্বাপনে সচেষ্ট হন। অজপাড়াগাঁয়ে কুঁড়েঘর, দোকানপাট বা ঐ ধরণের বসত বাড়ি ছাড়া আধুনিক যুগে শহরাঞ্চলে এবং ক্ষেত্র বিশেষে গ্রামে-গঞ্জে আবাসিক গৃহ, অফিস-আদালত, দোকানপাট, কলকারখানা ইত্যাদি স্থানে বৈদ্যুতিক বা গ্যাস সংযোগ থাকে। এসব স্থানে অগ্নি নির্বাপণে পানি ব্যবহার করা হলে আগুন নিভবে না বরং অগ্নি নির্বাপনকারীর ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। কেননা, পানি বিদ্যুৎ পরিবাহী এবং বৈদ্যুতিক অগ্নিকাণ্ডে পানি ব্যবহার করা হলে তড়িতাহত হয়ে নির্বাপণকারী মারা যেতে পারে। একইভাবে গ্যাসের আগুনে পানি ছিটানো হলে আগুন নিভবে না। কেননা গ্যাস বায়বীয় পদার্থ এবং গ্যাসের আগুন জ্বলতে থাকবে।

অনুরূপভাবে তরল পদার্থ বা তেলের আগুনে পানি দেয়া হলে তেল পানির উপরে ভেসে উঠবে এবং আগুন জ্বলতে থাকবে। সমুদ্রপৃষ্ঠে তেলবাহী জাহাজের তেল নিঃসরণ হয়ে পানির উপর আগুন জ্বলার দৃশ্য আমরা মাঝেমধ্যে দেখতে পাই। কেবলমাত্র শুকনো দ্রব্য, যেমন– খড়কুটা, আসবাবপত্র, কাপড়-চোপড় বা অন্যান্য কঠিন পদার্থ, যেগুলোর সাথে বিদ্যুৎ, গ্যাস বা তেলের সংযোগ নেই, সে সকল দ্রব্যের আগুন পানি দিয়ে সূচনালগ্নে ব্যক্তি পর্যায়ে কার্যকরভাবে নির্বাপণ করা সম্ভব।

আদিম যুগ থেকে এ পর্যন্ত মানুষের সৃষ্ট আগুন, দুর্ঘটনায় সৃষ্ট আগুন এবং অগ্নিনির্বাপণে ব্যবহার্য সামগ্রীর ধরণ বিশ্লেষণ করে আগুনকে ৪ ভাগে ভাগ করা যায়। যেমনঃ ক) কঠিন পদার্থের আগুন বা শুকনো দ্রব্যের আগুন, খ) তরল পদার্থ বা তেলের আগুন, গ) গ্যাস বা বায়বীয় পদার্থের আগুন এবং ঘ) বিদ্যুতের আগুন। যে কোনো স্থানে নিয়ন্ত্রণবিহীন আগুন বা দুর্ঘটনাক্রমে সৃষ্ট আগুন বর্ণিত যে কোনো এক প্রকারের বা একাধিক রকমের সমন্বয়ে সৃষ্ট আগুন হতে পারে। আধুনিক শহরে আবাসিক ভবন, অফিস-আদালত, দোকানপাট ও কলকারখানার দুর্ঘটনায় সৃষ্ট আগুন প্রথমতঃ এক প্রকারের হলেও অগ্নিকাণ্ডের

সাথে সাথে আগুন নিভানো বা নিয়ন্ত্রণ করা না গেলে তা অতি দ্রুত বহুমাত্রিক আগুনে রূপান্তরিত হতে পারে। কেননা, এ সকল স্থানে তেল, গ্যাস, বিদ্যুৎ ইত্যাদি বিদ্যমান থাকে। এ জন্য ব্যক্তি পর্যায়ে, ফায়ার ব্রিগেড বা প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগে অগ্নি নির্বাপণের পূর্বে অগ্নি স্থলের বিদ্যুৎ ও গ্যাস সংযোগ অবশ্যই বিচ্ছিন্ন করতে হবে। তা না হলে নির্বাপণকারীদের প্রাণহানিসহ ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির আশংকা থাকে ।

চার প্রকারের আগুন প্রাথমিকভাবে ব্যক্তি পর্যায়ে নিভানোর জন্য প্রথাগতভাবে এবং নিকট অতীতেও চার প্রকার এক্সটিংগুইশার ব্যবহার করা হতো। এগুলো হলো: ক) সাধারণ পানি বা সোডা ওয়াটার এক্সটিংগুইশার-কঠিন পদার্থ তথা শুকনো দ্রব্যের আগুন নিভানোর জন্য, খ) ফোম এক্সটিংগুইশার-তরল পদার্থ বা তেলের আগুন নিভানোর জন্য, গ) কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO2) এবং কার্বন টেট্রাক্লোরাইড (CTC)-গ্যাসের আগুন এবং ঘ) সিও২ ও সিটিসি-বিদ্যুতের আগুন নিভানোর জন্য। কার্বন ডাই অক্সাইড (CO2) বা কার্বন টেট্রাক্লোরাইড (CTC) যেহেতু যে কোনো আগুন নিভাতে পারে সেহেতু এ গ্যাস বা এক্সটিনগুইসার যে কোনো ধরণের আগুন নিভাতে ব্যবহার করা যায়।

তবে এ ধরণের এক্সটিংগুইশারের প্রাপ্যতা, মজুদ ও ব্যবহার মূলতঃ সরকারি ও বেসরকারি অফিস-আদালত বা কলকারখানায় সীমিত। বর্তমানে প্রায় সকল অফিস-আদালত এবং কলকারখানায় সোডা ওয়াটার বা ফোম এক্সটিংগুইশার এর পরিবর্তে এবিসি/এবিই/এবিসিই ড্রাই পাউডার এক্সটিনগুইসার এর প্রচলন হয়েছে। এ ধরণের এক্সটিংগুইশার যে কোনো আগুনের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যায়। নিয়ন্ত্রণবিহীন ও দুর্ঘটনাজনিত অগ্নিকাণ্ড যেহেতু একটি মারাত্মক বিপদজনক বিষয়, সেহেতু সংকটময় মুহূর্তে কোন ধরণের আগুনে কী ধরণের এক্সটিংগুইশার ব্যবহার করতে হবে, সেটা বিবেচনা করে অগ্নিনির্বাপণে প্রশিক্ষিত ফায়ার ক্রু বা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ ছাড়া সাধারণের পক্ষে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে অগ্নিনির্বাপণ করা সম্ভব নয়, তাই অতীতে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরণের এক্সটিংগুইশারের পরিবর্তে বর্তমানে 'অল ইন ওয়ান' ধরনের একটি এক্সটিংগুইশার অর্থাৎ এবিসি/এবিই/এবিসিই ড্রাই পাউডার এক্সটিংগুইশারের প্রচলন হয়েছে, যা অধিক কার্যকরী ও সহজে ব্যবহার যোগ্য। এখানে 'এ' অর্থ কঠিন পদার্থ বা শুকনো দ্রব্যের আগুন, 'বি' অর্থ তরল পদার্থ বা তেলের আগুন, 'সি' অর্থ গ্যাস বা বায়বীয় পদার্থের আগুন এবং 'ই' অর্থ বিদ্যুৎ বা বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের আগুন। এ এক্সটিংগুইশার দেখতে অনেকটা পূর্বে প্রচলিত ও ব্যবহৃত সোডা ওয়াটার এক্সটিংগুইশার এর অনুরূপ। অনেকে বর্তমানে প্রচলিত এবিসি/এবিই/এবিসিই ড্রাই পাউডার এক্সটিংগুইশারকে পূর্বের সোডা ওয়াটার এক্সটিংগুইশার মনে করে তা পূর্বের পদ্ধতিতে ব্যবহার করতে উদ্যত হন, যা খুবই বিপদজনক। কারণ এ এক্সটিংগুইশারের ব্যবহার পদ্ধতি সোডা ওয়াটার এক্সটিংগুইশার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এছাড়া, CO2 বা CTC বিদ্যুতের আগুন বা গ্যাসের আগুন নিভানোর জন্য অদ্যাবধি পূর্বের ন্যায় ব্যবহৃত হচ্ছে ।

বর্তমানে শহরাঞ্চল, উপশহর এবং কলকারখানার বাইরে দেশের বিভিন্ন এলাকায় এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিভিন্ন কাজে গ্যাস ও বিদ্যুতের ব্যাপক ব্যবহার হচ্ছে। এ কারণে গ্যাস ও বিদ্যুৎ সংযোগ সম্বলিত স্থানের আগুন পূর্বের বহুল প্রচলিত সাধারণ পানি বা সোডা ওয়াটার এক্সটিংগুইশার দিয়ে নিভানো সম্ভব নয়। নগরায়ন, শিল্পায়ন, আবাসন শিল্প সম্প্রসারণ, ইত্যাদি কারণে গ্রামে-গঞ্জে, শহরে ও উপশহরে পুকুর, দিঘি, নদী-নালা এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক জলাশয় দিন দিন বিলুপ্ত হয়ে পানির উৎস খুবই কমে গেছে। এমতাবস্থায়, গ্যাস ও বিদ্যুৎবিহীন স্থানের সাধারণ বা কঠিন পদার্থের আগুন নিভানোর জন্য পানির অভাব খুবই প্রকটভাবে অনুভূত হচ্ছে ।

তাই গ্রামে-গঞ্জের ঘরবাড়ি, দোকানপাট ও হাটবাজারের অগ্নিকাণ্ডে স্বতঃস্ফূর্ত







আমজনতার অংশগ্রহণে অগ্নিনির্বাপণে পানির অভাব হেতু এ এক্সটিংগুইশারের ব্যবহার অনিবার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অনাকাংক্ষিত অগ্নিকাণ্ড বা অগ্নি দুর্ঘটনায় অগ্নিনির্বাপণের প্রথম দায়িত্ব কার? এর উত্তর হলো শিশু বা বৃদ্ধ অথবা অসুস্থ ব্যক্তি ব্যতীত যে কোনো সক্ষম ব্যক্তি, যিনি প্রথমে আগুন দেখবেন, তিনিই প্রথমে আগুন নিভানোর চেষ্টা করবেন এবং একই সময়ে অন্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন উচ্চস্বরে "আগুন-আগুন" বলে। এমন বাস্তবতায় পদ-পদবি নির্বিশেষে প্রতিটি নারী-পুরুষ, বালক-বালিকার উচিত অগ্নিনির্বাপণের জ্ঞান অর্জন করা এবং প্রয়োজনীয় মুহূর্তে কার্যকরভাবে তা কাজে লাগানো। একটি বাসা, মেস বা অফিস, গবেষণাগার, দোকানপাট, হাটবাজার বা কলকারখানায় হঠাৎ অনাকাঙ্ক্ষিত অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হলো। এ আগুন সাথে সাথে নিভানো না হলে বা নিয়ন্ত্রণে না রাখলে অতি সামান্য আগুনই অনেক বড় অগ্নিকাণ্ডে রূপান্তরিত হতে পারে। পারিবারিক বাসস্থানে চুলার আগুন বা অন্যান্য রুমের বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি হতে সৃষ্ট আগুন মুহূর্তে না নিভানো হলে সেটা খুব দ্রুত অন্যান্য রুমে ছড়িয়ে পড়ে পুরো বাড়িই ভস্মীভূত করে। ফায়ার ব্রিগেড বা ভিন্ন সূত্রের সহায়তা নিয়ে অগ্নিনির্বাপণ করতে ন্যূনতম যে সময় ব্যয় হবে তা একটি বাসা, বাড়ি, অফিস, দোকান, কারখানা, ইত্যাদি সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত করার জন্য যথেষ্ট। এ চিত্রটি যে কোনো ব্যক্তির অগ্নিনির্বাপণ সক্ষমতা অর্জন করার প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করে। কাজেই শিশু, বৃদ্ধ এবং অসুস্থ ব্যক্তি ব্যতিরেকে সকলকেই অগ্নিনির্বাপণে প্রশিক্ষিত ও পারদর্শী হতে হবে। বাসার গৃহকর্তা, গৃহকর্ত্রী, ছেলে-মেয়ে, গৃহকর্মী, গৃহশিক্ষক, নির্ভরশীল অন্যান্য ব্যক্তি, অফিসের সর্বোচ্চ কর্তা থেকে কনিষ্ঠ কর্মচারী, কারখানার মালিক থেকে শুরু করে সর্বনিম্ন পর্যায়ের কর্মীসহ সকলকে প্রাথমিক অগ্নিনির্বাপক সরঞ্জাম, যথা–এবিসিই ড্রাই পাউডার এক্সটিনগুইসার ব্যবহার করে অগ্নিনির্বাপণ শিখতে হবে।

অনাকাঙ্খিত বা দুর্ঘটনাজনিত আগুন নিভানোর প্রেক্ষাপট: অনাকাঙ্ক্ষিত আগুন বা দুর্ঘটনায় সৃষ্ট আগুন আমাদের নিজেদের প্রয়োজনে সৃষ্ট আগুন থেকেও সূত্রপাত হতে পারে। গৃহস্থালি বা হোটেলের রান্না-বান্নার চুলা থেকে অগ্নি দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। চুলার সাথে সংযুক্ত গ্যাসপাইপ অতি গরম ও চাপে ফেটে গিয়ে উচ্চ মাত্রার অগ্নিকাণ্ড ঘটাতে পারে। রান্নার কাজে ব্যবহৃত তেলের কড়াইয়ে তেল অনেক সময় উচ্চমাত্রায় গরম হয়ে হঠাৎ করে বৃহদাকার আগুন সৃষ্টি করতে পারে। কলকারখানা, গবেষণাগারের ফার্নেস, বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট, দুর্বল বৈদ্যুতিক সংযোগ ও সুইচ বক্স ইত্যাদিতে যে কোন সময় আগুন ধরতে পারে। প্রাথমিক অবস্থায় এসব স্থানের আগুন সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিগণ অতি সহজেই নিভাতে পারেন। এজন্য প্রয়োজন ব্যক্তি পর্যায়ের অগ্নি নির্বাপক সামগ্রীর পরিচিতি, প্রাপ্যতা ও মজুদ এবং এসবের ব্যবহার বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা। অগ্নিনির্বাপক সরঞ্জাম এবং এসব সরঞ্জামের ব্যবহারে অজ্ঞতার কারণে অতি সাধারণ আগুন দ্রুত ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে প্রতিনিয়ত জানমালের ক্ষয়ক্ষতি করছে। তাজরিন ফ্যাশনের আগুন এবং এ বছর ২৬ ফেব্রুয়ারি উত্তরায় একটি বহুতল ভবনে বসবাসকারী রাজউক উত্তরা মডেল কলেজের একজন শিক্ষার্থী, তার মা, বাবা ও দুইভাইসহ পরিবারের মোট ৫ জন সদস্য, সকলেই নিজ বাসার অগ্নিকাণ্ডে একত্রে অগ্নিদগ্ধ হয়ে নির্মমভাবে প্রাণ হারানোর মতো বিয়োগান্তক ঘটনা আমাদেরকে মর্মাহত ও বিচলিত করে। প্রাথমিক অবস্থায় এবং প্রথম দর্শনে যে কোনো ব্যক্তি যাতে অনাকাঙ্ক্ষিত বা দুর্ঘটনার আগুন নিভাতে সক্ষম হন সে বিষয়ে কর্মপরিকল্পনা এবং যুৎসই ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে নারীপুরুষ নির্বিশেষ সকলকে অগ্নিনির্বাপণে পারদর্শী করে তুলতে হবে। এজন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন জনসচেনতা সৃষ্টি এবং প্রশিক্ষণ প্রদানের পাশাপাশি অগ্নি নির্বাপক সামগ্রীর সহজলভ্যতা ও সম্ভাব্য সকল স্থানে এসকল সামগ্রী মজুদ করা এবং কার্যকর রাখা। এ বিষয়ে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলে শ্লোগান হওয়া উচিত আমরা সকলে প্রাথমিক অগ্নি নির্বাপক সরঞ্জাম ব্যবহার করে আগুন নিভাতে সক্ষম এবং অগ্নিকাণ্ডে জানমালের রক্ষায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করবো'।

অগ্নি নির্বাপক সামগ্রীর প্রাপ্যতা, মজুদ, ব্যবহার ও প্রশিক্ষণঃ পানি, বালি, চাদর বা কম্বল, ফায়ার ইত্যাদি দ্বারা সাধারণ কঠিন পদার্থের আগুন সূচনালগ্নে বা প্রাথমিক অবস্থায় নির্বাপণ করা সম্ভব। কিন্তু বিভিন্ন কারণে বাসায় এবং দোকানপাটে পানি না থাকলে এবং আগুন নিভানোর অন্যান্য সরঞ্জাম পাওয়া না গেলে এবং কদাচিৎ পাওয়া গেলেও সেগুলো ব্যবহার করে ব্যক্তি পর্যায়ে সফলভাবে আগুন নিভানোর ঘটনা খুব কমই শোনা যায়। বালি ব্যবহারের মাধ্যমে আগুন নিভাতে গেলে বৈদ্যুতিক বা কারিগরি সামগ্রী নষ্ট হয়ে যায়। এসব কারণে বালু দিয়ে আগুন নিভানো অনেকটা তাত্ত্বিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। একইভাবে চাদর বা কম্বল এবং ফায়ার বিটার দ্বারা আগুন নিভানোর বিষয়টিও মূলতঃ পেশাদার সংগঠনে প্রশিক্ষণের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এমতাবস্থায়, ফায়ার এক্সটিংগুইশার-ই আগুন নিভানোর কাজে ব্যাপকভাবে ব্যবহার হয়। এসব সরঞ্জাম মূলতঃ সরকারি ও বেসরকারি অফিস আদালতে এবং কলকারখানায় মজুদ থাকে ও ব্যবহৃত হয়। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে দোকানপাট, হাটবাজার এবং সাধারণ বাড়িঘরে এ ধরণের সরঞ্জাম মজুদ থাকে না। এ ব্যাপারে লোকজন আগ্রহীও নন; কেবল অগ্নিকাণ্ডের ক্ষয়ক্ষতিতে আহাজারি করেন। যে কোনো ব্যক্তি যে কোনো স্থানে যাতে প্রাথমিক পর্যায়ে দ্রুত আধুনিক অগ্নিনির্বাপক সামগ্রী ব্যবহার করে কার্যকরভাবে আগুন নিভাতে সক্ষম হন সে ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকলকে সচেষ্ট হতে হবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, একটি বাজার কমিটি বাজারের প্রতিটি দোকানে/দোকানিকে সঠিকভাবে অগ্নিনির্বাপণ প্রশিক্ষণ দিবেন এবং সময়ে সময়ে অনুশীলন ও মহড়ার আয়োজন করবেন। বিভিন্ন পাড়া/মহল্লায় ওয়ার্ড মেম্বার ও কমিশনারগণ সংগঠিতভাবে এলাকার লোকজনের জন্য প্রশিক্ষণ, অনুশীলন ও মহড়ার আয়োজন করবেন। এভাবে সমগ্র দেশে/প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রশিক্ষণ, অনুশীলন ও মহড়ার মাধ্যমে সকল বাংলাদেশিকে আগামী ২-৩ বছরের মধ্যে অগ্নিনির্বাপণে সক্ষম করে তোলা সম্ভব। একইভাবে স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠানে, এনজিও, মসজিদ, মন্দির, কমিউনিটি সেন্টার এবং বিভিন্ন ক্লাব ও আবাসিক এলাকায় সংশ্লিষ্ট কমিটি বা পরিচালনা পর্ষদের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রশিক্ষণ, অনুশীলন ও ঘনঘন মহড়ার আয়োজন করতে হবে। চাকুরি প্রার্থী, বাসায় বিদ্যুৎ ও গ্যাস সংযোগ নিতে গেলে, ব্যবসার লাইসেন্স পেতে হলে, পাসপোর্ট বানাতে হলে, Voter ID/NID নিতে গেলে, আবেদনকারী অগ্নিনির্বাপণ প্রশিক্ষণ নিয়েছেন এবং ফায়ার এক্সটিনগুইসার ব্যবহার করতে জানেন মর্মে প্রমাণ দেবেন। কেবল এ ধরণের পরিস্থিতি সৃষ্টির মাধ্যমে আমরা তাজরীন ফ্যাশন বা রাজউক উত্তরা মডেল কলেজের ছাত্রের বাসভবনের অনুরূপ অগ্নিকাণ্ড নিবারণ ও মোকাবেলা করতে সক্ষম হবো এবং মূল্যবান জীবন ও মালামাল রক্ষা করতে পারব।

প্রাতিষ্ঠানিক বা সাংগঠনিক পরিবেশে অগ্নিনির্বাপণঃ সরকারি, আধাসরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং কলকারখানায় অগ্নিনির্বাপক সামগ্রী স্থায়ীভাবে মজুদ থাকে। কিন্তু সংকটকালীন এসব সরঞ্জাম প্রায়শঃ অকার্যকর পাওয়া যায়। উপস্থিত লোকজন কার্যকরভাবে এসব সামগ্রী ব্যবহার করতে জানেন না। কলকারখানায় অগ্নিকাণ্ডের সংবাদ প্রাপ্তির সাথে সাথে শ্রমিকেরা অগ্নিনির্বাপণ না করে ভীতিকর পরিবেশে উর্ধ্বশ্বাসে স্থান ত্যাগ করেন। এতে দ্রুত অগ্নি ছড়িয়ে পড়ে জানমালের ক্ষয়ক্ষতি করে। আমাদের দেশে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিভিন্ন মার্কেট, শিল্প-কারখানা এবং গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিগুলোতে সৃষ্ট আগুনে জানমালের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি এ পরিস্থিতিরই প্রমাণ বহন করে। প্রতিষ্ঠানের সর্ব নিম্নস্তরের ব্যক্তি, নিরাপত্তা কর্মী, পরিচ্ছন্নতা কর্মী এবং বার্তাবাহক থেকে শুরু করে প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ ব্যক্তি নির্বিশেষে সকলকে আগুন নিভানোর কাজে পারদর্শী হতে হবে। এজন্য মূল দায়িত্ব নিতে হবে প্রতিষ্ঠান প্রধানকেই। তিনি এ ব্যাপারে সর্বদা তৎপর থাকবেন, অগ্নিনির্বাপণ প্রশিক্ষণ, অনুশীলন ও মহড়ার আয়োজন করবেন; অগ্নিনির্বাপক সামগ্রীর প্রাপ্যতা, মজুদ এবং কার্যকারিতা নিশ্চিত করবেন এবং প্রশিক্ষণ ও মহড়ায় নিজে উপস্থিত থেকে উৎসাহ যোগাবেন ও নেতৃত্ব দেবেন। তখনই কেবল প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা অর্জিত হবে। একটি বাস্তব চিত্র হলো সচরাচর সরকারি





ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে অফিসের বাইরে দেয়ালে বা সুবিধাজনক স্থানে ফায়ার এক্সটিংগুইশার ঝোলানো থাকে। একইভাবে অফিসের করিডোরে, গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে দৃশ্যমান অবস্থায় অনেক ফায়ার এক্সটিংগুইশার মজুদ থাকে। কিন্তু অপ্রিয় সত্য হলো এসব প্রতিষ্ঠানের প্রধান ব্যক্তি, তাঁর ব্যক্তিগত স্টাফ এবং অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে খুব কমসংখ্যক লোকই এসব সামগ্রী ব্যবহার করতে জানেন বা ব্যবহার সম্পর্কে জানার কৌতূহল রাখেন। সরেজমিন পরিদর্শনে দেখা যায় যে, এসব এক্সটিংগুইশার প্রথমবার স্থাপনের পর কখনো ব্যবহার করা হয়নি। প্রায় সবগুলো মেয়াদোত্তীর্ণ, অকার্যকর এবং প্রতিস্থাপনের ব্যবস্থা নেই। কেবল লোক দেখানোর জন্য এসব এক্সটিংগুইশার স্থাপিত আছে।

অগ্নিনির্বাপণে ব্যক্তির যোগ্যতা ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার চিত্র

ব্যক্তি যোগ্যতা: খুব নগণ্যসংখ্যক ব্যক্তি অগ্নিনির্বাপণ বিষয়ে সচেতন এবং অগ্নিনির্বাপক সামগ্রীর পরিচিতি ও ব্যবহার বিষয়ে সম্যক ধারণা রাখেন। স্বনামধন্য কিছু শিল্প প্রতিষ্ঠান, শিল্পাঙ্গন ও অফিস আদালতের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে অগ্নিনির্বাপণ বিষয়ে প্রাথমিকভাবে প্রশিক্ষিত হলেও লব্ধ জ্ঞান নিয়মিত অনুশীলন ও মহড়ার মাধ্যমে চর্চা করেন না বা এ বিষয়ে হালনাগাদ নন। পোষাকশিল্প ও অন্যান্য শিল্প কারখানায় পুনঃপুনঃ অগ্নি দুর্ঘটনা দ্রুত ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়ে জানমালের মারাত্মক ক্ষয়ক্ষতিই এ বিষয়ে অসচেতনতা ও নির্লিপ্ততা প্রমাণ করে। তবে সামরিক বাহিনীতে এ পরিস্থিতি ভিন্ন। এখানে নিয়মিত অগ্নিনির্বাপণ মহড়া ও অনুশীলন পরিচালনা করা হয় এবং যে কোনো অগ্নিকাণ্ডে জানমালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াই অগ্নি নির্বাপণ করার বাস্তব প্রমাণ আছে। কারণ এ বিষয়ে সকল পর্যায়ের কমান্ডার ও কমান্ড চ্যানেল দায়িত্বশীল এবং যত্নবান।

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা: খুব কম প্রতিষ্ঠান আছে যেখানে কর্মস্থলে বা কলকারখানায় প্রয়োজনীয় অগ্নিনির্বাপক সামগ্রী যথেষ্ট পরিমাণে মজুদ ও কার্যকর আছে। অগ্নিকাণ্ডে দেখা গেছে যে, বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত ও মজুদ অগ্নিনির্বাপক সামগ্রী অকেজো বা অপ্রতুল, অধিকাংশ ব্যক্তি সে সকল সরঞ্জামের ব্যবহার বিষয়ে অনভিজ্ঞ ও অপারগ এবং স্থায়ীভাবে স্থাপিত ফায়ার হাইড্রেন্ট অকার্যকর। দালান-কোঠা বা কলকারখানা নির্মাণ পর্যায়ে ফায়ার হাইড্রেন্ট ও অন্যান্য অগ্নিনির্বাপক সামগ্রী স্থাপন করার পর ব্যবহারকারীদের দ্বারা এসব সামগ্রী ব্যবহার করে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে নিয়মিত অগ্নিনির্বাপণ অনুশীলন ও মহড়া অনুষ্ঠিত হয়েছে, এর প্রমাণ খুবই কম। ফলশ্রুতিতে সাধারণ অগ্নিকাণ্ড অতি দ্রুত ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়ে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিভিন্ন শিল্প কারখানায় সংঘটিত ব্যাপক ও মারাত্মক অগ্নিকাণ্ডসমূহের পরও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা অর্জন ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সমন্বয়ে নিয়মিত বৃহদাকার অনুশীলন ও মহড়া অনুষ্ঠিত হওয়ার উদ্যোগ বা আয়োজন খুব একটা শোনা যায় না। এ অবস্থার পরিবর্তন না হলে কিছু দিন পর পর তাজরীন ফ্যাশনের মতো দুঃখজনক ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে থাকবে। এজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার অংশ হিসেবে সমন্বিত অগ্নি নির্বাপণ মহড়া ও অনুশীলনকে প্রতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হবে। কর্মচারীদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধি, পদোন্নতি ইত্যাদিতে অগ্নিনির্বাপণ যোগ্যতার বিষয়টি গুরুত্বসহকারে বিবেচিত হতে হবে এবং কর্মকর্তা পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা অর্জনে তাদের ভূমিকা ও অবদান বিবেচনায় আনতে হবে। অগ্নিকাণ্ডের সূচনালগ্নে প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তিবর্গ প্রযোজ্য সরঞ্জাম ব্যবহার করে কার্যকরভাবে অগ্নিনির্বাপণে সক্ষম হলেই কেবল প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা অর্জিত হতে পারে।

গ্রামে-গঞ্জে ও শহরতলিতে অগ্নিনির্বাপণ: অপরিকল্পিত নগরায়ন, শিল্পায়ন, রাস্তাঘাট নির্মাণ ও বিবিধ স্থাপনা নির্মাণের কারণে গ্রাম হারাচ্ছে তার চিরায়ত রূপ। এ কারণে প্রাকৃতিক জলাধার, নদী-নালা, পুকুর, দিঘি ইত্যাদি দিন দিন বিলুপ্ত হয়ে প্রাকৃতিক পানির উৎস খুব দ্রুত নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে প্রায় প্রতিটি গ্রাম বিদ্যুতায়িত এবং বেশ কিছু গ্রামাঞ্চলে গ্যাস সংযোগ আছে। এ ধরনের এলাকায় অগ্নিকাণ্ডের সাথে সাথেই আগুন

বহুমাত্রিকতায় রূপ নিতে পারে। কাজেই এ ধরনের আগুন নিভানোর জন্য শহরাঞ্চলের মতো গ্রামেও এবিসিই ড্রাই পাউডার এবং CO_2 ও CTC ফায়ার এক্সটিনগুইশার প্রয়োজন হবে।

কেবল কঠিন পদার্থের আগুন নিভানোর জন্যও পানির অভাবহেতু ফায়ার এক্সটিনগুইশার প্রয়োজন হবে। অর্থাৎ দু'একটি ব্যতিক্রমি এলাকা ব্যতিরেকে বাংলাদেশের যে কোনো এলাকার অগ্নিনির্বাপণের জন্য আধুনিক অগ্নিনির্বাপক সামগ্রী ব্যবহার ও মজুদ রাখার কোনো বিকল্প নেই।

বহুতল ভবনে অগ্নিনির্বাপণঃ বর্তমানে বহুতল ভবন নির্মাণকালে স্থায়ী অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা তথা ফায়ার হাইড্রেন্ট স্থাপন করা হয়। কিন্তু বাস্তবতা এই যে, অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্হা স্থাপনের পর ভবনের বাসিন্দা এবং অন্যান্য কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গকে জড়িত করে ফায়ার ফাইটিং ব্যবস্থার কার্যকারিতা কখনো সমন্বিতভাবে পরীক্ষা করা হয় না। এ ধরণের ব্যবস্থার সাথে ভবনের বাসিন্দা ও কর্মচারীরা পরিচিত নন। সার্বক্ষণিক কর্তব্যে নিয়োজিত নিরাপত্তা কর্মীগণও এ বিষয়ে অজ্ঞ এবং অনভিজ্ঞ। বহুতল ভবনের অগ্নিকাণ্ডে ফায়ার ফাইটিং System এর ত্রুটি অথবা System এর অকার্যকারিতা এবং দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের অনভিজ্ঞতার কারণে বহুতল ভবনের আগুনে প্রচুর ক্ষয়-ক্ষতি ও প্রাণহানির ঘটনা ঘটছে। সম্প্রতি একটি বহুতল ভবনের অগ্নিকাণ্ডে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো পরিলক্ষিত হয়েছেঃ ক) ভবন নির্মাণকালে প্রতিটি ফ্লোরে এবং দালানের চর্তুপার্শ্বে ভূমিতে ফায়ার হাইড্রেন্ট স্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু এ ব্যবস্থার কার্যকারিতা কখনো সমন্বিতভাবে পরীক্ষা করা হয়নি/হয় না। খ) ভবনের অধিবাসীগণ অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থার সাথে পরিচিত নন এবং তাদেরকে জড়িত করে কেন্দ্রীয়ভাবে বহুতল ভবনের অগ্নিনির্বাপণ অনুশীলন ও মহড়া অনুষ্ঠিত হয়নি/হয় না। গ) প্রাথমিক অগ্নিনির্বাপক সরঞ্জাম যথা, এবিসিই ড্রাই পাউডার, CO_2 এবং CTC এক্সটিনগুইশার ভবন নির্মাণের সাথে সাথে প্রতিটি ফ্লোরে স্থাপন ও সরবরাহ করা হলেও পরবর্তীতে এগুলোর ব্যবহারিক অনুশীলন, কার্যকারিতা যাচাই, রক্ষণাবেক্ষণ, প্রতিস্থাপন, ইত্যাদির কোন ব্যবস্থা নেই। ভবনে অগ্নি দুর্ঘটনার সময় এসবের অধিকাংশই অকার্যকর পরিলক্ষিত হয়েছে এবং অগ্নিনির্বাপণে কোনো কাজে আসেনি। ঘ) সরকারি বা বেসরকারি বহুতল অফিস-আদালত বা আবাসিক ভবনে সংশ্লিষ্ট সকলকে একীভূত করে কোনো অগ্নিনির্বাপণ অনুশীলন ও মহড়া অনুষ্ঠিত হয়নি/হয় না। ঙ) বহুতল ভবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে অনেক ভবনের ভূগর্ভস্থ জলাধার নেই, যা অগ্নিকাণ্ডে ব্যবহার করা যায়। চ) শহরাঞ্চলে আবাসিক এলাকা, অফিস-আদালত, দোকানপাট ও হাট-বাজারের সন্নিকটে এলাকা ভিত্তিক বৃহদাকার অগ্নিনির্বাপণের জন্য প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম জলাধার নেই এবং ছ) এসব কারণে প্রাথমিক অবস্থায় অতি ক্ষুদ্র আগুন খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ি স্থানীয় পানির উৎস না থাকায় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে না। ফলত ক্ষয়ক্ষতি অনেক বেশি হয় ।

অগ্নিকাণ্ড ও অগ্নিনির্বাপণে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগঃ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বিভিন্ন ইউনিটে সাংগঠনিক উদ্যোগে নিয়মিত অগ্নিনির্বাপণ অনুশীলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে সকল পদবির ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত থাকেন এবং অনুশীলন ও মহড়ায় অনেক সদস্য প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন। স্থায়ী অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা (ফায়ার হাইড্রেন্ট) ব্যবহার করে আগুন নিভানো এবং ব্যক্তি পর্যায়ে প্রাথমিক অগ্নিনির্বাপক সামগ্রী যেমন–এবিসিই ড্রাই পাউডার, CO_2 এবং CTC এক্সটিনগুইশার ব্যবহারে অনেক সদস্যই পারদর্শী। সেনানিবাসের পরিবেশে বিশেষ করে সেনা ইউনিটসমূহে সৃষ্ট অগ্নিকাণ্ড খুব বড় ধরণের অগ্নিকাণ্ডে রূপান্তর হওয়া বা বেশি পরিমানে ক্ষয়-ক্ষতি হওয়ার নজির খুবই কম। সেনা ইউনিট ও সংস্থাসমূহে ব্যবহৃত ফায়ার এক্সটিনগুইশার নিয়মিত পরিদর্শন ও প্রতিস্থাপনের ব্যবস্থা আছে। সম্প্রতি নির্মিত বহুতল ভবনসমূহে স্থাপিত স্থায়ী অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা ও ব্যক্তি পর্যায়ে প্রাথমিক অগ্নিকাণ্ডে ব্যবহার্য ফায়ার এক্সটিনগুইসারসমূহ নিয়মিত পরিদর্শন, ব্যবহার ও মেয়াদ শেষে প্রতিস্থাপন, ইত্যাদিতে গতিশীলতা, দক্ষতা ও পেশাদারিত্ব সৃষ্টির লক্ষ্যে সেনাবাহিনী পর্যায়ে ব্যাপক





কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। সেনাবাহিনীর উদ্যোগের অনুকরণে দেশের যে কোন সরকারি, বেসরকারি ও ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানের অগ্নিনির্বাপন সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহন করা যেতে পারে।

বহুতল ভবনের অগ্নিনির্বাপণে প্রতিবন্ধকতা নিরূপণ: সম্প্রতি ঢাকা বিমান বন্দর সড়ক সংলগ্ন একটি বহুতল ভবনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় অগ্নিনির্বাপণে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো পরিলক্ষিত হয়েছে ক) ভবনের সিঁড়িসহ প্রতি ফ্লোরের লবিতে ভবনে বসবাসকারী ব্যক্তিবর্গের ব্যক্তিগত আসবাবপত্র, ট্রাংক, বাক্স, ফুলের টব, গাছ, গাছের গুড়ি ইত্যাদি রাখা ছিল, যা সিঁড়ি ব্যবহারে ও অগ্নিনির্বাপণ কার্যক্রম পরিচালনায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। খ) ভবনের প্রতিটি তলায় ফায়ার হাইড্রেন্ট, ফায়ার এক্সটিনগুইশার ও ফায়ার এলার্ম সিস্টেম স্থাপিত থাকলেও ফায়ার হাইড্রেন্ট ও ফায়ার এলার্ম সিস্টেম সম্পূর্ণরূপে অকার্যকর ছিল। তাছাড়া, এগুলোর ব্যবহার বিধিও সকলের জানা ছিল না। উল্লেখিত সরঞ্জামাদি স্থাপনের পর অদ্যাবধি ঐগুলির ব্যবহার বা কার্যকারিতা যাচাই করা হয়নি। গ) বাসায় শিশু ও গৃহকর্মচারীকে তালাবদ্ধ অবস্থায় রেখে যাওয়ায় তাদের মধ্যে আতংক সৃষ্টি হয় এবং পরবর্তীতে তালা ভেঙে তাদেরকে নিরাপদে সরিয়ে নেয়া হয়। ঘ) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স তড়িৎভাবে সাড়া দিলেও অগ্নিনির্বাপণের জন্য আগত স্থানীয় ফায়ার সার্ভিসের প্রথম দলটির সুউচ্চ ভবনে অগ্নিনির্বাপণের জন্য প্রয়োজনীয় সক্ষমতা না থাকায় কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে বিলম্ব হয়। ঙ) স্থানীয় ফায়ার সার্ভিস স্টেশনে সুউচ্চ ভবনে অগ্নিনির্বাপণের জন্য দীর্ঘ মইযুক্ত অগ্নিনির্বাপক যানবাহন বা সরঞ্জাম না থাকায় অন্য স্থান হতে তা আনতে বিলম্ব হয়। চ) ভবনে অগ্নিনির্বাপণ সংক্রান্ত নির্দেশিকা প্রতিটি ফ্লোরে প্রদর্শিত ছিল না এবং উক্ত আবাসিক এলাকার জন্য প্রযোজ্য অগ্নি দুর্ঘটনা বা ভূমিকম্পসহ অন্য কোনো দুর্যোগে করণীয় সম্পর্কে নির্দেশনা, নিরাপদ স্থান চিহ্নিতকরণ বা উদ্ধার কার্যক্রম বিষয়ে নীতিমালার আলোকে পদক্ষেপ গ্রহণ বা এতদ্সংক্রান্ত কোন মহড়া প্রদর্শন বা অনুশীলন করা হয়নি। ছ) অগ্নি দুর্ঘটনাস্থলের আশপাশের এলাকা হতে বহিরাগতসহ অনেক লোকজনের ভীড় হয়, যা অগ্নিনির্বাপণে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে এবং নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। জ) বিদ্যুৎ বন্ধ করার পর ভবনে আলোর বিকল্প ব্যবস্থা না থাকায় ভবনে উঠানামাসহ অগ্নিনির্বাপণে অসুবিধা সৃষ্টি হয়। উল্লেখ্য, ফায়ার সার্ভিসের প্রথম দলটির কাছেও বিকল্প আলোর ব্যবস্থা ছিল না। ঝ) দীর্ঘ সময় আগুন প্রজ্জ্বলিত থাকায় তাপ পরিবহনের মাধ্যমে উক্ত ভবনের আশেপাশের দেয়ালও মাত্রাতিরিক্ত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। তবে দ্রুত বিদ্যুৎ ও গ্যাসের লাইন বন্ধ করায় এবং ভবনে cooling effect এর জন্য সকলের প্রচেষ্টায় যথেষ্ট পানি প্রবাহিত করায় আগুনের ব্যাপ্তি নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হয়। দেশের বিভিন্ন সেনানিবাসে অনেক সুউচ্চ আবাসিক ও অফিস ভবন নির্মিত হয়েছে। এ সমস্ত সুউচ্চ ভবনে অগ্নি দুর্ঘটনায় করণীয় ও দুর্ঘটনা ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট অনেকেই ওয়াকিবহাল নন। ফলে তড়িৎ ও সঠিক অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থার অভাবে জানমালের সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। এমতাবস্থায়, সুউচ্চ ভবনে অগ্নিসহ অন্যান্য দূর্যোগ মোকাবেলার গুরুত্ব অনুধাবন পূর্বক উপরোক্ত পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনার প্রেক্ষিতে নিম্নের অনুচ্ছেদ সমূহে বর্ণিত নির্দেশাবলী বাস্তবায়ন একান্ত অপরিহার্য:

- **সিঁড়ি বা লবিতে ব্যক্তিগত সামগ্রী রাখা সংক্রান্ত নির্দেশনা:** ভবনের সিঁড়িতে, সিঁড়ির নিচে, লবিসহ কোনো স্থানে কোনো প্রকার ব্যক্তিগত মালামাল রাখা যাবে না। যে সমস্ত ভবনে এরূপ মালামাল রক্ষিত আছে তা দ্রুত অপসারণ করতে হবে। নিয়মিত মনিটরিং এর মাধ্যমে ভবনের সিঁড়ি ও লবি ব্যক্তিগত মালামাল মুক্ত রাখা নিশ্চিত করতে হবে।

- **বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানির সুইচ/কল সময়মত বন্ধ করা/নিরাপদ রাখা:** বৈদ্যুতিক বা ইলেক্ট্রনিকস যন্ত্রপাতির সুইচ বন্ধ নিশ্চিত করে বাসা/অফিস ত্যাগ করতে হবে। ব্যবহৃত না হলে লাইট/ফ্যানসহ সকল সরঞ্জামাদির সংযোগ/সুইচ বন্ধ রাখতে হবে। তাছাড়া, মোবাইল/ল্যাপটপ/ব্যাটারি ইত্যাদির রিচার্জ সম্পন্ন হলে যথাসময়ে চার্জার এর সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে হবে। রাতে ঘুমানোর পূর্বে মোবাইল/ল্যাপটপ চার্জার বা সকল সুইচ বন্ধ

করতে হবে। ব্যবহৃত না হলে লাইট/ফ্যানসহ সকল সরঞ্জামাদির সংযোগ/সুইচ বন্ধ রাখতে হবে। বাসা ত্যাগের পূর্বে বা রাত্রে ঘুমানোর পূর্বে গ্যাসের চুলা বন্ধ আছে কি না তা নিশ্চিত করতে হবে।

• **বাসার ভিতরে কোনো ব্যক্তি থাকা অবস্থায় বাইরে থেকে তালা দেওয়া:** কোনো ফ্ল্যাট/বাসার ভিতরে ছেলে মেয়ে, বয়স্ক ব্যক্তিবর্গ ও গৃহকর্মী রেখে কোনো অবস্থাতেই বাহির থেকে তালা লাগিয়ে বাসা ত্যাগ করা যাবে না। ভবন বা আবাসিক এলাকার জন্য গঠিত কমিউনিটি সংগঠন এ বিষয়ে তদারকি করবে এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা মেনে চলার জন্য প্রেষণামূলক কর্মসূচী গ্রহণ করবে।

• **অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রপাতির কার্যকারিতা ও ব্যবহার:** অগ্নিদুর্ঘটনার প্রাথমিক পর্যায়ে তড়িৎ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রতিটি ভবন/ফ্ল্যাটে সকল বাসিন্দা/সদস্যদের ঐ ফ্ল্যাটে বা ফ্লাটের সন্নিকটে স্থাপিত অগ্নিনির্বাপণ যন্ত্রপাতি বিশেষভাবে ফায়ার হাইড্রেন্ট ও ফায়ার এক্সটিনগুইশার এর ব্যবহার সম্পর্কে জানা সবচেয়ে জরুরি। এজন্য নিয়মিতভাবে প্রতিটি ভবনের সুবিধাজনক স্থানে ঐ ভবনের প্রতিটি ফ্ল্যাটের/ভবনের সকল সদস্যের (নিরাপত্তা প্রহরী, গৃহকর্মী ও ছেলে-মেয়েসহ) উপস্থিতি নিশ্চিত পূর্বক অনুশীলনের ব্যবস্থা করতে হবে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ/কমিটি তাদের আওতাধীন সকল ভবনের ফায়ার হাইড্রেন্টসহ সকল অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রপাতির কার্যকারিতা সর্বদা বজায় রাখার জন্য দায়ী থাকবে এবং প্রতি তিন মাস অন্তর এগুলোর কার্যকারিতা যাচাইয়ের জন্য অনুশীলণের ব্যাবস্থা করবে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে সিডিউল/নির্দেশনা জারি করবে। প্রতিটি আবাসিক ভবনের নিচে (মেইন ডিস্ট্রিবিউশন বক্স-এ) স্থাপিত সেন্ট্রাল গ্যাস রেগুলেটর এবং বৈদ্যুতিক মেইন সুইচ আপদকালীন সময়ে দ্রুত বন্ধ করার জন্যে ডিউটিরত গার্ডকে দায়িত্ব অর্পণ করতে হবে। আবাসিক এলাকা বা সুউচ্চ ভবনের জন্য গঠিত কমিউনিটি সংগঠন সমূহ স্থানীয় ফায়ার ব্রিগেড বা এ ধরনের পেশাদার সংস্হার সহায়তা নিয়ে প্রতিটি ভবনে নিয়োজিত সিকিউরিটি গার্ডদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ/অনুশীলনের ব্যবস্থা করবে। কর্তৃপক্ষ সুউচ্চ ভবনসমূহের প্রতিটি ফ্লোরে ফায়ার এক্সিট চিহ্নিতকরণসহ দুর্যোগকালীন নিরাপদ স্থানসমূহ চিহ্নিত করবে এবং সতর্কতামূলক নির্দেশনা প্রদর্শনের ব্যবস্থা করবে।

আবাসিক ভবনসহ বিভিন্ন স্থাপনায় অগ্নি দুর্ঘটনা রোধকল্পে করণীয়

ভবনে বসবাসকারীদের দায়িত্ব : বসবাসকারীগণ কর্তৃক বাসস্হানের সিঁড়ি এবং কমন স্পেস সমূহে কোন প্রকার মালামাল রাখা যাবে না; যাতে অগ্নিকাণ্ড, ভূমিকম্প ও অন্যান্য দুর্ঘটনায় জানমাল রক্ষার্থে দ্রুততম সময়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা সম্ভব হয়। এসব নির্দেশনা ব্যবহারকারীগণকে সঠিকভাবে পালন করতে হবে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিষয়টি নিয়মিত তদারকীকরণ এবং নির্দেশনা অনুসরণে আগ্রহ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রেষণামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

অগ্নিনির্বাপণ মহড়া ও অনুশীলন : বহুতল ভবনে স্থাপিত হাইড্রেন্ট, ফায়ার এক্সটিনগুইশার এবং ফায়ার এলার্ম ইত্যাদি স্থাপনকারী/সরবরাহকারী সংস্হা ও পরিচালনা কর্তৃপক্ষের সমন্বয়ে আবাসিক এলাকায় বসবাসকারীদের উপস্হিতিতে ম্যানেজমেন্ট কমিটির তদারকিতে যথাযথ অনুশীলন পরিচালনা করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে প্রতিটি আবাসিক এলাকায় সুনির্দিষ্ট দিনক্ষণ নির্ধারণ করতঃ মহড়া/অনুশীলনের জন্য পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহন, মহড়াকালীন সময়ে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্হিত থেকে মহড়া পর্যবেক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবেন, যাতে অগ্নি প্রতিরোধ ব্যবস্হা কার্যকরী হয় এবং সর্বসাধারণের মধ্যে এ বিষয়ে সচেতনতার সৃষ্টি হয়।

সেনাবাহিনীর ইউনিট ও বিভিন্ন সংস্থায় অগ্নিনির্বাপণের গুরুত্ব: বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বিভিন্ন ইউনিট, প্রতিষ্ঠান এবং সংস্থায় নিয়মিতভাবে অগ্নিনির্বাপণ প্রশিক্ষণ ও মহড়া





পরিচালিত হয়ে থাকে। উক্ত প্রশিক্ষণ ও মহড়া মূলতঃ ইউনিট পর্যায়ে সেনাসদস্যদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু অগ্নিকাণ্ডের সম্ভাব্য অন্যান্য স্থানসমূহ, যেমন– পারিবারিক বাসস্থান ও অন্যান্য আবাসিক ভবন, কুক হাউস, ধূপীশপ, টেইলর শপ, ইত্যাদি স্থানে অগ্নিনির্বাপণে প্রশিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতি নেই বললেই চলে। সম্ভবতঃ এ কারণে বর্ণিত স্থানসমূহে অগ্নিকাণ্ডের সুচনালগ্নে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। অফিস চলাকালীন সময়ে আবাসিক এলাকায় কেবল পরিবারের অন্যান্য সদস্যগণ (স্ত্রী, পুত্র, কন্যা) এবং গৃহকর্মী ইত্যাদি ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত থাকেন। একইভাবে ইউনিট টেইলর শপ, বারবার শপ ও ধূপীশপে সার্বক্ষণিকভাবে উপস্থিত থাকেন বেসামরিক ব্যক্তিগণ, যারা সাধারণভাবে অগ্নিনির্বাপণ প্রশিক্ষণ এবং মহড়ার সাথে সম্পৃক্ত নন। এ সকল স্থানে অগ্নিকাণ্ডের প্রাথমিক পর্যায়ে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের অগ্নিনির্বাপণে সক্ষমতা ও পারদর্শিতার অভাবে তারা যথাযথ ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হন। এ সকল বিষয় এবং সম্প্রতি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে নির্মিত বহুতল ভবনসমূহে সম্ভাব্য অগ্নিকাণ্ড মোকাবেলার লক্ষ্যে অগ্নিনির্বাপণ সক্ষমতা নিরূপণ ও নীতিমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে একটি পর্ষদ তাদের কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সেন্টাল অর্ডন্যান্স ডেপোর ফায়ার ফাইটিং সেকশনের একদল চৌকস ফায়ার ফাইটার, ফায়ার ফাইটিং গাড়ি ও অন্যান্য সরঞ্জাম সহকারে দেশব্যাপী প্রায় প্রতিটি বড় বড় সেনানিবাসে গমন করতঃ নিম্নোক্তভাবে অগ্নিনির্বাপণ সচেতনতা, অনুশীলন ও মহড়া পরিচালনা করেন ক) সেনাসদস্য এবং অসামরিক সদস্যদের সমন্বয়ে ইউনিট এলাকায় কেন্দ্রীয়ভাবে অনুশীলন ও মহড়া। খ) পারিবারিক সদস্য, গৃহকর্মী, নিরাপত্তা প্রহরী ও এমইএস কর্মচারীদের সমন্বয়ে আবাসিক এলাকায় কেন্দ্রীয়ভাবে অগ্নিনির্বাপণ অনুশীলন ও মহড়া। গ) সেনানিবাসের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সকল ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও সদস্যদের সমন্বয়ে কেন্দ্রীয়ভাবে অনুশীলন ও মহড়া এবং ঘ) বহুতল ভবনে স্থাপিত অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থার তাৎক্ষণিক কার্যকারিতা যাচাই। উক্ত কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রায় ২০,০০০ ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবক, পরিচ্ছন্নতা কর্মী, নিরাপত্তা রক্ষী, গৃহকর্মী, চালক, গৃহশিক্ষক এবং সেনাবাহিনীর বেসামরিক সদস্য/এমইএস কর্মীদের অগ্নিনির্বাপণে সচেতন করা হয়েছে এবং প্রত্যক্ষভাবে অগ্নিনির্বাপক সামগ্রীর ব্যবহার শেখানো হয়েছে। সেনাবাহিনীর অনুকরণে দেশের যে কোন সরকারি, বেসরকারি ও ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতঃ অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধ, অগ্নিনির্বাপণ ও অগ্নিকাণ্ডে জান-মালের ক্ষয়ক্ষতি ব্যাপকভাবে কমাতে পারে ।



ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ আইয়ুব আনসারী, পিএসসি, ২০ ডিসেম্বর ১৯৮৫ সালে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে অর্ডন্যান্স কোরে কমিশন লাভ করেন। তিনি ডিফেন্স সার্ভিসেস কমান্ড এন্ড ষ্টাফ কলেজ, মিরপুরের একজন গ্রাজুয়েট। তিনি ১৯৯৮ সালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় হতে প্রতিরক্ষা বিষয়ে এমডিএস এবং ২০০৩ সালে আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব ম্যানেজমেন্ট এন্ড টেকনোলজি, ক্যালিফোর্নিয়া হতে এমবিএ ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি একটি অর্ডন্যান্স ডেপোর অধিনায়ক, সেন্ট্রাল অর্ডন্যান্স ডেপোর কমান্ড্যান্ট এবং বিভিন্ন সংস্থা ও সেনাসদরে ষ্টাফ অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালনকরেন। তিনি বাংলাদেশ অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরীর পরিচালক প্রশাসন ও উপকরণ এবং প্রতিরক্ষা ক্রয় মহাপরিদপ্তরের পরিচালক ক্রয় এর দায়িত্ব পালন করেন। ২০১০ সাল থেকে অদ্যাবধি তিনি বাংলাদেশ সরকারের বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি হিসেবে জাতিসংঘ নিরস্ত্রীকরণ অফিসে ডেভলপমেন্ট অব ইন্টারন্যাশনাল এ্যামিউনিশন টেকনিক্যাল গাইডলাইনস (IATG) এবং টেকনিক্যাল রিভিউ বোর্ড ফর দি ইমপ্লিমেন্টেশন অব IATG প্রকল্পে কাজ করছেন। সেনাবাহিনীতে কর্তব্যরত সময়ে পেশাগত ও সরকারী কর্তব্যে তিনি বিভিন্ন দেশ ভ্রমন করেন।

বিখ্যাত ব্যক্তিত্বদের স্মরণীয় উক্তি

'আল্লাহর পথে সীমান্ত পাহারা দেয়া দুনিয়া ও দুনিয়ার উপর যা কিছু আছে তার চাইতেও উত্তম'

–সহীহ বুখারি ও মুসলিম

তোমরা সৎপথে থেকো। মাতৃভূমিকে ভালোবেস। তোমরা শুধু সামরিক বাহিনীই নও, এটা আমাদের জনগণের বাহিনী

-জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

যুদ্ধ জয়ে ইচ্ছা ছাড়া যুদ্ধে যাওয়া ধ্বংসাত্মক

–ডগলাস ম্যাকআর্থার

জনগণ শান্তিতে ও নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাপন করে, কারণ তারা জানে দেশের সশস্ত্র বাহিনী তাদের পক্ষে লড়তে সদা প্রস্তুত

–জর্জ অরওয়েল

সশস্ত্র বাহিনীর আধুনিকায়ন









ফোর্সেস গোল-২০৩০-এর আলোকে একটি আধুনিক ও চৌকস সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলার লক্ষ্যে চলছে সশস্ত্র বাহিনীর আধুনিকায়ন। অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে আধুনিক সমরাস্ত্র।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে নতুন সংযোজিত এমবিটি-২০০০ শুধু বাংলাদেশ নয়, দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহে ব্যবহৃত ট্যাংকের মধ্যে অত্যাধুনিক ট্যাংক হিসেবে বিবেচিত। তিনজন ক্রু দ্বারা পরিচালিত এই যুদ্ধযান যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর যে কোন সাঁজোয়া যান ধ্বংস করতে সক্ষম।





আধুনিক ও চৌকস সেনাবাহিনী গড়ে তোলার নিমিত্তে সেনা বাহিনীর আর্টিলারি কোরের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষে মাল্টিপল লঞ্চ রকেট সিস্টেম (এমএলআরএস) রেজিমেন্ট গঠনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।

যুদ্ধক্ষেত্রে সাঁজোয়া যান উদ্ধারের জন্য সেনাবাহিনীতে নতুন Armoured Recovery Vehicle (ARV) সংযোজিত হয়েছে।



ফ্রিগেট বানৌজা সমুদ্র অভিযান

- দৈর্ঘ্য ঃ ১১৫.৩০ মিটার
- প্রস্থ ঃ ১২.৮০ মিটার
- আর্মামেন্টস ঃ 1 x 75mm Gun
  2 MK 36 SRBOC
- সেন্সর ঃ Navigational Radar,
  Search Radar
- কমিশনিং ঃ ১৯ মার্চ ২০১৬





ফ্রিগেট বানৌজা স্বাধীনতা

- দৈঘ্য ঃ ৯০.১ মিটার
- প্রস্থ ঃ ১১.১৪ মিটার
- আর্মামেন্টস ঃ 1 x H/P J-26 76mm Gun
  2 x H/P-J-17 30mm Gun
  2 x 2 Cell C-802A ASM
  1 x FL 3000 N SAM
- কমিশনিং ঃ ১৯ মার্চ ২০১৬

ফ্রিগেট বানৌজা প্রত্যয়

- দৈঘ্য ঃ ৯০.১ মিটার
- প্রস্থ ঃ ১১.১৪ মিটার
- আর্মামেন্টস ঃ 1 x H/P J-26 76mm Gun
  2 x H/P-J-17 30mm Gun
  2 x 2 Cell C-802A ASM
  1 x FL 3000 N SAM
- কমিশনিং ঃ ১৯ মার্চ ২০১৬



❖ উচ্চ প্রযুক্তি সমৃদ্ধ অত্যাধুনিক Glass Cockpit ও Auto Flight Control System দ্বারা পরিচালিত AW-139 হেলিকপ্টার সুবিস্তৃত উপকূল ও সামুদ্রিক এলাকায় যে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও আপদকালীন সময়ে অনুসন্ধান ও উদ্ধার পরিচালনা করতে সক্ষম।





❖ Fly-by-wire নিয়ন্ত্রিত ও ডিজিটাল ককপিট সম্বলিত YAK-130 এ্যাডভান্স জেট ট্রেইনার বিমান বিশ্বমানের প্রশিক্ষণ সুবিধা প্রদানের পাশাপাশি যুদ্ধকালীন সময়ে আকাশ প্রতিরক্ষা, প্রয়োজনে শত্রুদের অবস্থানে আক্রমণ এবং সেনা ও নৌবাহিনীকে সহযোগিতা প্রদানে সক্ষম।

❖ YLC-6 এয়ার ডিফেন্স র‍্যাডার বাংলাদেশের বিশাল সমুদ্রাঞ্চল তথা সমগ্র মহীসোপান এলাকায় টহলরত বিমানসমূহকে সঠিক দিক নির্দেশনা প্রদান করতে এবং তাদের চলাচল ও নিয়ন্ত্রণে বিশেষ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম।





DEFENCE DIPLOMACY IN BANGLADESH–AN INTROSPECTION

Col Husain Muhammad Masihur Rahman, SPP, afwc, psc

Introduction

Need for inter-communication between states has been felt by the societies since the earliest time.[1] Human being's most wanted desire to exert influence on individuals and entity is eternal. One of the most common ways to influence over the other states is to send envoys to communicate and persuade the state to accept or concede to own terms. This gave birth of foreign ministries, followed from the desire of the rulers to maintain continuous flow of diplomatic activities in which relationships between diplomatic partners, between internal sources of political influence and between differing issues could be carefully followed and controlled.

A nation's power in future will be measured by its ability to mold, join and sometimes lead international coalitions in unpredictable events and crises.[2] To that end, militaries are being employed increasingly in foreign relations duties. Through the involvement in peace operations, security sector reform activities, Disaster Management (DM), security dialogues etc, armed forces can prevent conflict rather than to conduct the conflict. Thus rises the phenomenon of defence diplomacy. The fact is, 'war is not the only means of international policy to which armed forces are suited'[3]; they are effective in diplomacy too.

Security being the highest responsibility of the state[4], use and employment of military for both at home and abroad must be based on appropriate national policy. Starting from image building to achieving economic emancipation, all depend on how Bangladesh pursues national interest. The slow but steady growth of Bangladesh from 'bottomless basket'[5] to Next Eleven[6], to a middle income country[7] is a great leap forward for Bangladesh. It needs to signal the world, what Bangladesh is for and where it is destined to. To that end participation in United Nations Peace Keeping Operations (UNPKO) and DM are very effective platforms.

---

1 Richard Langhorne, 'History and the Evolution of Diplomacy', available at http://www.diplomacy.edu/resources/ general/history-and-evolution-diplomacy.

2 'End of Strategic Autonomy', the Indian Express, Nov 18, 2014.

3 Justin Fris, (2013). "Neither Staunch Friends nor Confirmed Foes -New Zealand's Defence Diplomacy in Asia", A thesis submitted to Victoria University of Wellington.

4 Bangladesh Parliamentary Standing Committee on Defence Affairs' directive to AFD in May 2010.

5 Henry Kissinger has been alleged to have termed Bangladesh as 'Bottomless Basket' in 1970s, though there is no empirical evidence of him making such comments.

6 Bangladesh is grouped as "The Next Eleven", the eleven countries having a high potential of becoming among the world's largest economies in the 21st century, identified by Goldman Sachsinvestment bank and economist Jim O'Neill in a research paper https://en.wikipedia.org/wiki/Next_Eleven.

7 This is the vision of Bangladesh govt to be a middle income country by 2021.

Armed forces have a peacetime role in pursuit of broader security and foreign policy goals as seen from the guidance and employment practices worldwide. From this point, this paper first highlights the defence diplomacy and discusses the defence diplomatic practices by different countries. Then the state of defence diplomacy in Bangladesh is discussed and finally recommendations are made for the defence diplomacy of Bangladesh in furthering national interests.

Aim

The aim of this paper is to study the practices of defence diplomacy in Bangladesh and suggest measures for making it more complementary to the national interest.

Diplomacy and Defence Diplomacy

- **Diplomacy.** Diplomacy is the statecraft[8] dealing with external affairs of a country. It is the art vis a vis the practice of conducting interstate relations. Diplomacy is defined as "management of international relation by negotiation; the method by which these relations are adjusted and managed by ambassadors and envoys; art of the diplomats"[9]. It usually refers to the conduct of international relations through the employment of professional diplomats. The word diplomacy comes from French 'diplomatie', formed from 'diplomate', which comes from Latin adjective 'diplomaticos', from diploma (genitive diplomatis).[10] Generally it deals with the issues of interstate relations, peace-making, trade, war, economics, culture, environment, human rights and many more.

- **Defence Diplomacy.** Defence diplomacy may be defined as the use of Armed Forces as a tool of attaining security and foreign policy objectives, which helps in improving the relationship among countries. Defence diplomacy postulates the peacetime use of armed forces. Generally it focuses on military training and hardware exchange, peace-making, participation in international forums, security dialogues, visits and port calls of military delegations, ships and aircrafts etc, which helps building good interstate relations.

- **Diplomacy and Defence Diplomacy.** Foreign policy is implemented primarily by diplomats, supported by defence diplomats. Generally, diplomacy directly relates to the national core issues. Most of the countries conduct defence diplomacy as a separate field, though defence diplomats function in coordination with foreign office. Defence diplomacy distinguishes from other types of military cooperation with potential adversaries towards building cooperative relationships i.e. strategic engagement. This promotes democratic civilian control of armed forces and supports regimes to develop

8 'The art or skill of conducting government affairs' or 'the art of conducting public affairs; statesmanship.'

9 Nicolson Harold, Sir. (1939). ***Diplomacy***, Oxford University Press, London.

10 http://www.dictionary.com/browse/diplomacy, accessed on May 17, 2016.



peacekeeping capabilities[11]. Defence diplomacy is not a competitor or substitute of diplomacy; rather it is complementary, having different functions, objectives and orientation. Defence diplomacy may not be left at the disposal of conventional and bureaucratic process; rather it should be approached from national defence perspectives– what the country has to gain through the use of armed forces.

Practices of Defence Diplomacy around the World

- **General Trend of Defence Diplomacy.** Defence diplomacy deals with the development and employment of the armed forces to strengthen long-term security of the state. Most of the countries conduct defence diplomacy independently based on national security and defence policy; dependent of strategic culture. Like other elements of national power (e.g. diplomacy, information, economy and the like), defence diplomacy contributes to the national interest directly. It has dual roles; to contribute to the defence and contribute to 'diplomacy' or foreign policy.

- **USA.** US defence diplomacy is independent and part of a wider concept of defence engagement which covered two types of military activities. The first group is Foreign Military Interaction[12] encompassing military assistance, military education, joint exercises and operations. The second group is defence diplomacy. This term is used to describe military and defence support of foreign policy in peacetime. US National Military Strategy uses defence diplomacy to 'help shape the international environment primarily through their inherent deterrent qualities and through peacetime military engagements. The shaping element of this strategy helps foster the institutions and international relationships that constitute a peaceful strategic environment by promoting stability; preventing and reducing conflict and threats; and deterring aggression and coercion.[13]

- **UK**. UK has independent defence diplomacy policy that aims helping prevent conflicts escalating or occurring. Use of 'diplomacy' reflected the way these activities are conducted by armed forces; contributed to foreign policy. As expressed in the UK strategic defence review, UK armed forces are used in support of diplomacy alongside economic, trade and development, to strengthen security and avert conflict. Defence diplomacy mission is intended to 'provide forces to meet the varied activities undertaken to dispel hostility, build and maintain trust and assist in the development of democratically accountable armed forces, thereby making a significant contribution to conflict prevention and resolution.'[14] UK aims at conducting more preventive diplomacy[15] including the use of aid to encourage economic and political development.

---

11 https://en.wikipedia.org/wiki/Diplomacy, accessed on May 17, 2016.

12 Firs, Ibid.

13 Chairman of the Joint Chiefs of Staff, *National Military Strategy of the United States of America: Shape, Respond, Prepare Now: A Military Strategy for a New Era*, 12.

14 UK Ministry of Defence, *Strategic Defence Review Supporting Essay Four: Defence Diplomacy*, 1998, 106.

• **China**. China conducts defence diplomacy to guide its general diplomacy strategy to benefit national security and to ensure that international situation is guided to own benefits. Its defence diplomacy has strategic and military significance. Major function of the Chinese defence diplomacy is to protect national interests such as maintenance of a peaceful security environment, modernization of armed forces and enhancing China's influence on other countries. Foreign military relations are considered a strategic-level activity by the Chinese leadership. Military coordinates its defence diplomacy activities with the Ministry of Foreign Affairs (MOFA) on a routine basis. It employs a variety of activities, programs, and structures like high-level strategic security dialogues, military functional exchanges, professional military education exchanges, import and export of military weapons and equipment, and participation in peacekeeping operations.[16]

• **India**. Defence diplomacy in India is generally seen as one of the tools in the conduct of a country's diplomacy.[17] India has not progressed enough in military diplomacy due to bureaucratic inertia. However, it is increasing the use of defence diplomacy in furthering national interests. It is conducted as part of India's overall diplomacy, which is expected to act as a significant catalyst in strengthening its ties with friendly countries.

Future Diplomatic Engagements– PKO and DM

Diplomacy is used to project the image of the country while military is sometimes used to project power, though both complement each other. In the recent years, there had been refocus on diplomacy. It had been the cornerstone in the alliance based international systems. But with the demise of WARSAW, NATO finds itself in a state of redundancy. Similar is the case for many other forms of coordination mechanisms. Hence states are slowly turning to unified platforms that solve the problems of interstate relationship. United Nation is gaining its due importance with the passage of time. Future diplomatic manoeuver are likely to add two important fields as described in subsequent paragraphs.

• **UNPKO Based Engagement.** By participating in the UNPKO, nations achieve much more dividends than apparent advantages. At one end, it contributes to the peace and fulfills the constitutional obligations for supporting international peace and stability. Participation in UNPKO builds positive image of the country and also projects positive strategic culture of the nation. UNPKO also acts as a good signal for the dominating big nations, as nations are putting more importance on UNPKO. This aspect is

15 Diplomatic action taken to prevent disputes from escalating into conflicts and to limit the spread of conflicts when they occur. (David Capie and Paul Evans, *The Asia Pacific Security Lexicon'* 2nd ed. (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2007, 185).

16 White Paper on Chinese Armed Forces.

17 Rajagopalan, Rajeswari Pillai Dr, 'Military Diplomacy: The Need for India to Effectively Use In its Conduct of Diplomacy' available at rajeswarirajgopalsn@gmail.com.











observed from the increase of China's contribution of Infantry Battalion in 2015 for UNPKO. China, having the largest standing army in the world, participates in UNPKOs from 1992, but did not contribute any frontline fighters before 2015.[18] More so, there is a sharp increase in the pledges from the nations for troop contribution for the UN. More than 50 countries have pledged to contribute more than 40,000 new troops and police to serve in UNPKO during the Security Council meeting on 27 September 2015.[19] These indicate that, deployments of national military assets are becoming more focused, more competitive and more prestigious. As other nations pledge more troops for UNPKO, Bangladeshi forces' strength reduces as a consequence. There is a need of greater defence diplomatic efforts to continue with the leading troop contribution for UNPKO.

- **DM Based Defence Engagements.** In the midst of criticism that humanitarians are not doing enough, the world strives to be more humane. Nations are more considerate and matured for standing beside a nation at shock and disaster. Participation in DM works as a strong bridge between nations in strengthening relationship. For example, Bangladesh participation in the search of missing Malaysian Airliner MH370 brought esteem for the Bangladeshi nationals in Malaysia. Bangladesh participates regularly in DM activities in different parts of the world. DM brings countries together as was the case for Turkey and Greece in 2000. Same was observed during the Pakistan Earthquake in 2005, when India opened its three points on its lines of control to facilitate rescue operations. Sichuan Earth Quake in 2008 galvanized Chinese nation.

- **Broader Engagement of Military in Future.** Ever dynamic fields of diplomacy continue to evolve with time. New fields of international engagements are emerging regularly but there is no specific pattern. What is certain is the involvement of the UN for maintaining world peace and prosperity. While participation in UNPKO demonstrates the nations resolve for international peace, participation in DM is an indication about the nation's value for humanity and friendship. Both will continue to progress with time. Armed forces are the most suitable entities for both the duties and would continue to be engaged in future. For doing these duties effectively, increased engagement of defence diplomats is likely to be a pattern in future.

Present State-Conduct of Defence Diplomacy in Bangladesh

- **Progress of Defence Diplomacy.** Defence diplomatic activities of Bangladesh still remains at nascent stage. Its focus from 1971 to 1975 was

---

18 China's UNPKO participation in the past mainly had been in support service like medicals engineering etc; not with infantry.

19 http://www.huffingtonpost.com/entry/un-peacekeeping-troops_us_5609b98e4b0dd850308e79b.

limited to the acquisition of military equipment, train personnel and establish defence cooperation with selected countries[20]. From 1975 to 1990, defence diplomacy reached beyond India and Soviet Union; military ties with US, China, Turkey, Brazil and Middle Eastern countries developed. Bangladesh started its journey to the UNPKO during this time. From 1991, military diplomacy is being utilized as an element of foreign policy. Bangladesh focused its military efforts for international peace, conflict resolution and DM activities. Armed forces continue to play this role and strive to further it.

- **Defence Wings in Diplomatic Missions.** Presently Bangladesh has 13 defence wings in diplomatic missions. More 23 defence wings are in the planning stage[21] which will make total 36 defence wings. Present efforts of Bangladesh's defence diplomacy revolves around few fields like exchange of senior military officials visits, achieving situational awareness, exchange of military educations and military hardware. Participation in UNPKO and participation of DM of Bangladesh are also coordinated by the defence wings of respective diplomatic missions. Defence diplomacy can play significant role in developing better relationship with other countries. To that effect, armed forces can play significant role in strengthening relationship through defence engagements.[22]

- **Participation in UNPKO.** Transformation of the image of a famine-flood stricken Bangladesh to a global partner for peace and stability has been mainly through its commitment for world peace. One of the main foreign engagements of Bangladesh since 1990s had been the participation in UNPKO, which portrayed Positive Bangladesh abroad and emerged as top troop contributor for the UN. It presently deploys nearly 8000 Peace Keepers in 20 different UN missions, who work under the auspices of Ministry of Foreign Affairs. With the recent new policy of the UN on National Support Elements[23], Bangladesh can explore more opportunities in different peace keeping missions. Bangladesh could achieve more from the UN mission with little more diplomatic tunes in its efforts of troop contributions.

- **Participation in DM in different Countries.** Bangladesh's Participation in DM in different countries with humble kinds but big heart has become a hallmark. Being a disaster prone country, Bangladesh conducts DM operations efficiently. It's participation in overseas DM action has been lauded heavily worldwide, as it stands with small hands in DM wherever it

20 Ahmed, A F M Jagiul (Brig Gen), & Talukder, Abu Naser. *Military Diplomacy – An Experience of BD, Bangladesh Army Journal number 53*, 2013).

21 Prime Minister's office (AFD) memo (not shared) in 2011.

22 Shahidul Haque, Secretary MOFA, 23 August 2016, in a discussion session at MOFA.

23 A new UN policy on NSE, allowing troop contributing countries to deploy additional forces for supporting deployed forces. This force can be used for defence diplomacy.





can reach. 'Nepal owes greatly'[24] to Bangladesh for the humanitarian efforts during the Nepal Earth Quake in 2015. China does not consider the kinds with which Bangladesh participated in Sichuan Earthquake 2008, rather '...evaluates the gesture to stand by China with great heart'[25]. These efforts enhance the image of Bangladesh beyond the proportion and work as catalyst in achieving other national interests.

- **Participating in Different International Forum.** Armed forces organize and participate in different security and defence forums regularly, which bring participating countries together. Organization of international events like Indian Ocean Naval Symposium in Bangladesh in 2016 brought in 46 senior Naval officials. Mutual trust and cooperation achieved through this forum furthers interstate relations.

- **Bi-lateral Dialogues, Partnership Programs Visits Etc.** Bangladesh Military has regular engagement with USA through various activities like security dialogues, partnership programs etc. They have deep engagement with Chinese military for forces development. They also maintain very good relationship with Indian Military in the form for exchange programs, dialogues, meetings etc. Military cooperation with Saudi Arabia especially, training Saudi troops is a very important diplomatic engagement Bangladesh facilitating stronger ties. Similarly, Armed forces' cordial relationship with Middle Eastern countries facilitates strong bi-lateral bondage. Bangladesh Armed forces maintain strong bi-lateral bondage. Bangladesh Armed forces maintain strong relationship with UK, Turkey and many other countries. All these commitments not only contribute in the field of security, but also contribute greatly to the prosperity of Bangladesh. These activities help develop mutual confidence, cooperation and harmony with those countries.

Weaknesses of Defence Diplomacy in Bangladesh

- **Absence of Policy on Defence Diplomacy.** Conduct of defence diplomacy is directly linked to the strategic culture. Bangladesh is yet to have national policy on defence diplomacy. Deployment of defence diplomats reached to the present level in 1990s, though their roles and functions have not been structured yet. Comprehensive policy on defence diplomacy would guide as to how defence forces should help develop secured neighbourhood and stronger relations with other countries, help forces development, reduce tension in the borders and be employed abroad. Armed Forces' participation in UNPKO and DM in different parts of the world won hearts and minds of millions regularly. Military is reaching many parts of the world through UNPKO and DM operations where diplomacy cannot. This must be integrated in the defence diplomacy.

---

24 Baburam Shrestha, Colonel, Chief Coordinator of Nepal Earthquake Management Operation in 2015, in an interview with the author on June 07, 2016.

25 Senior Colonel Wuo Run Bo, Chinese Army, Specialist on DM, in an interview with the author on May 12, 2016.

• **Lack of Training for Defence Diplomats.** Appropriate training is necessary for defence diplomats to perform aptly in the diplomatic missions. As there exists adhoc mechanism in defence diplomacy management, no formal training has been arranged for them. Defence diplomats must be trained on the objectives and goals as per national defence policy. Achievement of defence diplomacy would be far more with a better structure and more coordinated efforts. Bangladesh beyond the proportion, and work as catalyst in achieving other national interests.

• **Lack of Exploration for Cooperation through Armed Forces.** Bangladesh has high esteem in all the countries where Armed Forces participated in UNPKO. Their professionalism is well recognized all over the African continent. Bangladesh can actively participate in some of the security sector reform activities where military participate in UNPKO. China's entry in to the infrastructure development activities of African countries has correlation with its participation in UNPKO. As Bangladesh plans to explore the African market (especially the HR market), engagement through armed forces could be easier. A well-coordinated approach can make Bangladesh entry in to the markets smooth and long-lasting, if done from the closing stage of the UNPKO.

Imperatives for Bangladesh from Defence Diplomacy

Bangladesh does not hesitate to use its armed forces for international peace and stability as its strategic culture goes. Employment of Armed forces under appropriate mechanism bolsters country's position. Hence, Bangladesh may improve its defence diplomacy. Considering defence, diplomatic and economic interests, following actions are recommended for Bangladesh:

• For achieving diplomatic leverage, Bangladesh may increase its focus on defence diplomacy and strengthen defence diplomatic efforts with all the countries. Planned 23 new defence wings may be established soon to harness greater national interests.

• AFD should formulate appropriate defence diplomacy policy and conduct defence diplomacy accordingly, keeping defence wings within the auspices of the MOFA. Necessary amendment may be made in the Army Rules on defence diplomacy. AFD may be appropriately organized within the present framework to conduct more effective defence diplomacy. Possible advantage as offered by the UN policy of 'National Support Elements' may be harnessed for achieving more national interests for Bangladesh.

• As competitions are intensifying for participation in UNPKO, Bangladesh must maintain its lead position in UNPKO. To that effect, defence wing of Permanent Bangladesh Mission in New York may be strengthened to have more focus on diplomatic affairs at UN head office.

• Bangladesh may remain prompt and proactive in extending support





whenever any opportunity arises for standing-by any nation during Disaster. Defence diplomats should remain engaged within the diplomatic missions for extending support to DM duties whenever any situation arises.

- Bangladesh may strive to maintain its position in Troop contribution for UNPKO. As pledges from stronger countries are forthcoming, Bangladesh needs to exercise more vigilance on the performance of peace keepers and improve training standard for maintaining the cutting-edge as leading troop contributing country.

Conclusion

Diplomatic operations, though started at least 5000 years from now, emerged as an essential element of statecraft in the 20th century. Defence diplomacy, though a part of diplomacy, is given special attention by most of the states in present days. As Humanitarian actions and UNPKO are attaining more importance, scope and necessities of defence diplomacy is expanding. A developing country, whose economy has high dependence on the service sector, needs to grab all the opportunities to furthering national interests. Bangladesh being one of the emerging economies needs to strengthen its diplomatic ties with all the countries. Enhancing defence diplomacy would go a long way in furthering national interest of Bangladesh.

Efforts in diplomacy and outcome are not directly proportional. There is hardly any short-term gain in diplomacy. Sometimes there remains no apparent progress and sometimes the progress is enormous. Defence diplomacy is very effective in developing cooperation, confidence and mutual trust among nations. Importance of defence diplomatic efforts may not be measured by the efforts involved; rather in terms of how many hearts it drenched in the process. Its effective use brings result beyond proportion, hence deserves more attention in Bangladesh.

BIBLIOGRAPHY

1. Cottey, Andrew, & Forster, Anthony. (2004). 'Reshaping Defence Diplomacy: New Roles for Military Cooperation and Assistance'. Oxford University Press, UK.
2. David Capie and Paul Evans, 'The Asia Pacific Security Lexicon', 2nd ed. (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2007, 185).
3. Griffith, Samuel B. (1963). "Sun Tzu - The Art of War", Oxford University Press, New York. p 74.
4. Law, David (Ed). (2007) "Defence Attachés" (Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF), Geneva, Switzerland, July 2007, p 2.
5. Jean, Leaguey, Robert, &Feilleux. (2010). "The Dynamics of Diplomacy" Lynne Rienner Publishers, Colorado, US.
6. Nicolson, Sir Harold. (1939). "Diplomacy", Oxford University Press, London.

7. David Law (Editor), "Defence Attachés" (Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF), Geneva, Switzerland, July 2007) 2.



Colonel Husain Muhammad Masihur Rahman, SPP, afwc, psc was born on January 01, 1973 in Naoga, Bangladesh. He was commissioned with 27 BMA Long Course in the East Bengal Regiment on December 20, 1992. He attended a number of courses at home and abroad. He is a graduate from National Defence College and Defence Services Command and Staff College Mirpur. His duties and appointments include Regimental Staff, Company Commander, Grade III Staff Officer at a formation HQ, Brigade Major of an Infantry Brigade and General Staff Officer Grade-I in an Infantry Division and Army Training and Doctrine Command. He commanded 5 Bangladesh Infantry Regiment (Support Battalion). He has served as a Platoon Commander and Term Commander in Bangladesh Military Academy. He has also served in United Nations Mission in Sierra Leone and DRC. The author is a Hafiz-E-Quran. He is an MBA graduate from University of Dhaka and MDS graduate from National University. Besides, he is a student of M Phil. Presently the officer is serving as Colonel Staff (Operations and Plan Directorate) Armed Forces Division.



MARITIME TERRORISM: STRATEGIC PREPAREDNESS FOR BANGLADESH

Commander M Mahbubur Rahman, (TAS), psc, BN

Uranium could also lead to the construction of bombs. A single bomb of this type, carried by boat and exploded in a port, might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory.

–Albert Einstein in a letter to US President Franklin Roosevelt on 2 August 1939

Introduction

The former United States Chief of Naval Operations, Admiral Gary Roughead mentioned that, "In this past century, our world has been driven and our military has been employed against what I call the three-isms. There was fascism. There was communism. And now, there is terrorism."[1] An academic study on the subject of maritime terrorism by Asal & Hastings (2014) states: 'Attacks against maritime targets by terrorists are very rare. The Global Terrorism Database (GTD) only notes 199 out of 98,000 attacks in 40 years, which is less than 0.2% of the total.'[2] However in recent years, as the threat of terrorism grows around the world, there has also been a steady increase in maritime attacks which poses a very serious impact on maritime trade and global peace and security. Shipping and sea borne trade are vital for the economy but they are threatened by maritime terrorism. The incidence of hijacking, armed attacks against ships, as well as other crimes at sea, such as piracy, drug trafficking and human trafficking are increasing. Regional cooperation is essential to overcome these weaknesses and ensure efficient implementation of maritime security initiative.[3] Therefore, every coastal country needs serious attention to address the maritime terrorism threat in her domain as well as global highway.

Bangladesh is a littoral of Bay of Bengal: The geostrategic location and geopolitical situation, along with the maritime characteristics of Bangladesh, has made it a potential threat to Maritime Terrorism. It is imperative that Bangladesh prepare herself in order to address Maritime Terrorism threats in coordination with regional and global partners.

This paper will first discuss about the attributes of Maritime Terrorism. After which, the discussion will shift to vulnerabilities and possible threats in the

1 US Navy Biography Quotes, website visited 07 Jun 16.

2 Justin V. Hastings and Victor Asal "When Terrorism Goes to Sea: Terrorist Organizations and the Move to Maritime Targets", P 1

3 Memorandum 8, Council for security Cooperation in Asia-Pacific.

context of Bangladesh. Moreover, some recent examples of Maritime Terrorism along with an analysis of globally accepted procedures employed to combat maritime terrorism will be discussed. Finally, this paper will suggest options for Bangladesh to combat Maritime Terrorism.

Aim

The aim of this paper is to discuss and analyse the current trends related to Maritime Terrorism with the view of proposing options to combat those by Bangladesh.

Attributes Of Maritime Terrorism

Terrorism in Maritime Domain

According to The Council for Security Cooperation in the Asia Pacific (CSCAP) Maritime Terrorism is, 'The undertaking of terrorist acts and activities within the maritime environment, using or against vessels or fixed platforms at sea or in port, or against any one of their passengers or personnel, against coastal facilities or settlements, including tourist resorts, port areas and port towns or cities.[4] Expansion of this definition can be done to define Maritime Terrorism, 'As the use or threat of violence against a ship, its passengers or sailors, cargo, a port facility, or if the purpose is solely a platform for political ends.[5] The definition can be expanded further to include the use of the maritime transportation system to smuggle terrorists or terrorist materials into the targeted country. Maritime terrorism is motivated by political goals beyond the immediate act of attacking a maritime target.

Characteristics of Maritime Terrorism

According to Dr. Justin Hastings, there are only two relevant organisational characteristics that are relevant to the conduct of maritime terrorism – the capabilities of terrorist organisations that would allow them to engage in maritime attacks and the ideology upheld by terrorist organisations that might lead them to want to engage in maritime attacks.

On the other hand, based on recent studies and compared to preferred targets several decades ago, maritime targets are now ideologically indistinguishable from any other terrorist targets[6]. This means that as maritime trade flourishes, terrorist organizations are now more likely to engage in maritime attacks given the importance of seaborne activities to the global economic system.

Targets and Methods

Maritime terrorists target vessels that will have some effect on the political objective they are trying to achieve. Thus, targets that are chosen

4 Website of Center for International Maritime Security, visited on 18 Aug 2015.

5 Website of Maritime Terrorism Research Center, visited on 18 Aug 2015.

6 Justin V. Hastings and Victor Asal "When Terrorism Goes to Sea: Terrorist Organizations and the Move to Maritime Targets", p 11



by terrorists fall into four categories:[7]

- Ships as iconic targets;
- Ships as economic targets;
- Ships as mass casualty targets; and,
- Ships as weapons.

Piracy and Maritime Terrorism

Thus, leading some to infer that piracy and maritime terrorism are one and the same. Despite such similarity, piracy is conducted solely for monetary purposes while terrorism is seen as a means to a political end.[8]

Maritime Terrorism in Recent Past

Maritime Terrorism in Extra Regional Context

Attack on USS COLE. The United States Navy Guided Missile Destroyer USS COLE (DDG-67) was attacked by an explosive laden small fast moving boat at the Yemen coast on 12 October 2000. Seventeen American sailors were killed, and 39 were injured.



FIG – 1: USS COLE is being carried for repair after terrorist attack

Attack on French Oil Tanker Limburg. The terrorist attack was carried out on Limburg by an explosive-laden boat off the coast of Yemen on 06 October 2002. The blast on the Limburg oil tanker killed one crew member and sending more than 90,000 barrels of oil into the Gulf of Aden.



FIG – 2: Oil tanker Limburg burning and the damaged portion water line

Attack on Super Ferry 14. Abu Sayyaf group was responsible for an explosion on the Super ferry 14 caused a fire on board and caused more than 116 lives in February 27, 2004.

Maritime Terrorism in Indian Ocean Region

Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) : The LTTE was described as the "world's most militarily and technologically advanced terrorist organization."

---

7 Murphy Martin N, Small Boats, Weak States, Dirty Money: Piracy and Maritime Terrorism in the Modern World, P 199.

8 Mitchell, Colin L, "Countering Maritime Terrorism in the Caribbean Sea and the Atlantic Ocean: Implications of Possible Maritime Terrorism in the Caribbean." P 156-166"



FIG – 3: Super Ferry 14 tragedy

The LTTE had developed its own naval combat unit called "Sea Tigers." They attacked the Trincomalee naval base in October 2000 and sank a naval vessel and damaged several others. Another attack was launched in November 2006 against Dakshina Naval base in Galle using heavily armed gunboats and speed boats. A special suicide squad called "Black Sea Tigers" in July 1990 carried out its first suicide mission attacking the navy's command ship Edithara. The LTTE had been accused of hijacking several ships.



FIG – 4: Naval component of LTTE flying their ensign

Mumbai Terrorist Attack: On November 26, 2008, a group of terrorists launched a series of shooting and bombing attacks across Mumbai, killing 164 people and wounding about 308. Terrorists travelled by sea from Karachi across the Arabian Sea; hijacked an Indian fishing vessel and killed its occupants; abandoned the fishing vessel a few miles away from the coast of Mumbai; got into an inflatable rubber boat and reached a fishing village in Mumbai to carry out the attack.

Maritime Terrorism Threat to Bangladesh

The present trends of Maritime Terrorism are unconventional and violent in nature. Based on present trend of Maritime Terrorism, it can be deduced that the threats for Bangladesh are the followings[9]:

- Use or threat of violence against the ship flying Bangladeshi flag or carrying goods of Bangladesh;
- Use or threat of violence against the merchant ship or Bangladesh Navy ship stationed at harbour;
- Use or threat of violence against fixed platform at port or against offshore installations at sea installed by Bangladesh;
- Use or threat of force against sailors/merchant men or passengers of Bangladeshi ship;
- Use or threat of force against port facilities Bangladesh overtly or covertly by the terrorist groups;
- Using own port/ships to transport terrorist or terrorist group against own interest or another country's interest.

9 Interview with Capt Mostak Ahmed, (G), psc, BN

Means, Methods and Reasons of Maritime Terrorism in Bangladesh. Terrorism has her inherent characteristics of transnationalism. The fall out of terrorism on a land-locked failed state can easily spill over or influence the security situation in littorals like Bangladesh. The internally displaced citizens of war-torn countries can also be potent threats for security and Maritime Terrorism can be conducted through the sea to attract the attention of the international community or to raise financial strength. The advent of technology and innovation has enabled terrorists to become more dangerous than before.[10] Thus, Bangladesh has to combat transnational non-military threats emanating from the seas. Insufficient security along the seafront can't seal the porous coast and the littorals from typical marine crime by non-military and non-state threats like gun running, smuggling, human trafficking, piracy, and armed robbery which sometimes have close link with organised terrorist organisations. As an example, the seizure of arms and ammunitions including sub-machine guns and AK rifles, rocket propelled grenades and their launchers, 2000 grenades and three lakh bullets (fig-5) during unloading on April 2, 2004 cannot be considered as a petty crime. In the present context, it is not difficult for terrorist groups to organise their own fleets to conceal their identity using the facility of Flag of Convenience (FOCs).



FIG -6: The possible route of gun running and the apprehended Arms ammunition (Source of Map:Jane's Intelligence Review)

Future Perception. The Sea has multiple uses for terrorist organisations.

- For gunrunning of non-state actors or terrorists from source organisations.
- For the clandestine movement of their cadres from safe sanctuaries in one country to another.
- For the smuggling of narcotics as a source of revenue.
- For acts of economic terrorism meant to disrupt the economy, either of a nation or a region or the whole world. And lastly,
- For the clandestine movement of WMD material to an intended theatre of operations.

John Patch stated that, "In piracy, the responsibility lies with local law

10 Interview with Cdre S M Ahmad, (C), afwc, psc, BN

enforcement officials and not in the military. But maritime terrorism means scrambling the navy."[11] Operationally, the international community must use the most effective and efficient tools to counter these. This requires pragmatic and sensible approach that takes both military and non-military options into account. Some of those strategic approaches are described below.

- **Combined Task Forces 151.** United Nations Security Council (UNSC) adopted five resolutions 1816, 1838, 1844, 1846 and 1851 to cope with the situation in Somalia, Gulf of Aden[12]. Based on these UNSC resolutions Combined Naval Task Force 151 (CTF 151) has been established to conduct counter piracy operations in the waters off the coast of Somalia. The CTF 150, 151 and 152 are examples for multinational naval coalitions that are responsible for conducting both anti-piracy and anti-maritime terrorism operations.

- **1000 Ships Navy.** Back in 2006, then USN Chief of Naval Operations Admiral Mike Mullen called for a vast undertaking by the world to combat the maritime threats. Dubbed the "1000 Ship Navy", it was described as "a global maritime partnership that unites maritime forces, port operators, commercial shippers, and international, governmental and nongovernmental agencies to address mutual concerns." Then JCS Chairman Admiral Mullen admitted to being "stunned" by the new epidemic of piracy and terrorist hijackings at sea. Actually the most stunning aspect is the lack of a clear strategy on how to deal with the situation from our military leaders.[13]

- **ReCAAP.** The Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia (ReCAAP) is the first regional government-to-government agreement to promote and enhance cooperation against piracy and armed robbery in Asia where 20 states are members. The ReCAAP Information Sharing Centre (ISC) was established under the ReCAAP Agreement. The roles of ReCAAP ISC include exchanging information among Contracting Parties on incidents of piracy and armed robbery supports capacity building efforts of Contracting Parties, and for cooperative arrangements.[14]

Options For Bangladesh

Mechanism of Combating Terrorism

Basing on various dimensions of maritime terrorism, respective countries may develop models in line with their political, military, foreign and economic aspect in order to combat those. However in relation to previous discussions the following aspects may be taken in to consideration for Bangladesh in order to counter terrorism[15]:

- Coordinated patrolling in the VSA (Vulnerable Sea Area) under regional cooperation. This will require mutual trust among the littorals in the VSA.

- Intelligence gathering mechanism by own state is vital to combat terrorism. Integration of coastal population in general and the coastal fishing





and trading community in particular in the intelligence gathering process can enrich much needed local knowledge. This local knowledge is important to combat terrorism and piracy.

- National awareness program in general and coastal population in particular is paramount as it may encourage coastal population to be watchful and contribute to countering sea terrorism.

- Regional crisis management centre and satellite monitoring system may be integrated for quick response to combat terrorism.

- There are following measures likely to enhance the safety of the ship carrying important and dangerous cargo:

  - Ships, as far as possible, should avoid narrow water ways. Unavoidable passage should be assumed only under escort offered by the transit state. States may watch the ship following its coast.

  - Passage plan should be kept confidential and disseminated on need to know basis including members of the crew.

  - Crew identification and vetted reference points should be kept recorded.

  - Ships approaching territorial waters may be vetted for genuine crew. Approaching ship may be asked to follow designated route and ships movement may be monitored.

  - Semi enclosed harbours in the VSA may be closed to traffic at night to prevent suicide boat attack.

  - Enforce surveillance around the port and anchorage.

  - Activities of crew of anchored ships may be monitored.

Cooperative Engagement

From the analysis and discussions we can propose global cooperative approach to counter this menace. In order for these initiatives to be effective and successful, there shall have three tiers of strategic preparedness

Future Perception. The Sea has multiple uses for terrorist organisations.

- For gunrunning of non-state actors or terrorists from source organisations.

- For the clandestine movement of their cadres from safe sanctuaries in one country to another.

- For the smuggling of narcotics as a source of revenue.

---

11 Patch, John, "The Overstated Threat." In Modern Piracy and Maritime Terrorism: The Challenge of Piracy for the 21st Century, Edited by M. R. Haberfeld and Agostino Von Hassel, p 65-75.

12 http://www.un.org/press/en/2008/sc9541.doc.htm visited on 10 Sep 15.

13 https://newwars.wordpress.com/2008/11/25/where-is-the-1000-ship-navy/ visited on 20 Jun 16.

14 ReCAAP website visited 06 Jun 16

15 Commander M A Razzak, "Opportunity for cooperation against Sea Borne Terrorism."Headmark, Spring 2006, Journal of the Australian Naval Institute.

• For acts of economic terrorism meant to disrupt the economy, either of a nation or a region or the whole world. As the terrorists focus more and more on economic targets, it would be prudent to expect more acts of maritime terrorism in the future. And lastly,

• For the clandestine movement of WMD material to an intended theatre of operations. Considering the historical perspective and threat probability, though the threat of maritime terrorism seems to be a very remote possibility, it is actually probable in Bangladesh's waters.

Local Cooperative Engagement: To combat terrorism, illicit trafficking, piracy and threat to freedom of navigation in the maritime domain, we should:

• Increase capabilities in integrated maritime detection, monitoring, and intelligence to national maritime domain awareness;

• Implementation of Automated Identification System (AIS) for vessels as required by ISPS code;

• Enhancing interoperability and capability to perform visit, board, search and seizure in contested environment with Bangladesh Coast guard (BCG);

• Cooperation between Armed Forces and Border Guard Bangladesh (BGB) in terms of sharing knowledge, information, intelligence and interoperability;

• Intelligence sharing network with existing intelligence organisations like the Directorate General Forces Intelligence (DGFI), BCG Intelligence, National Security Intelligence (NSI) and Police intelligence organisations;

• Close liaisoning with maritime organisations of Bangladesh like Bangladesh Shipping Corporation (BSC), BIWTC, BIWTA, Fishing Vessel owners associations etc. and sharing information; and,

• Functioning Maritime Headquarters (MHQ) to act as the coordinating body and crisis management centre for counter Maritime terrorism actions.

Regional and Global Cooperative Engagement. Improved Regional cooperation to enhance the security of shipping and sea borne trade is essential. Security arrangement can make a number of contributions to peace and stability. It can pursue within or even outside the geographical boundaries of the arrangement's participants.[16] The Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia (ReCAAP) and trilateral coordinated Malacca Strait Patrols (MSP) are examples of cooperation. Therefore following measures might be taken on regional arena:

• Increase interoperability through sharing training, exercises to increase the capability to address maritime security challenges like the Rim

16 Jurgen Haacke and Noel M. Morada, "The ASEAN Regional Forum and cooperative Security".Cooprative Security in the asea-Pacific, edited by JurgenHaacke and Noel M. Morada 2011.





of the Pacific Exercise (RIMPAC);

- Carryout seminar, symposium, dialogue as a part of confidence building measure between the regional and international forum like Indian Ocean Naval Symposium (IONS);
- Participate, organise or join regional maritime security and information sharing forum like ReCAAP;
- Cooperation with international Maritime agencies;
- Information and technological cooperation, exchange from capable allies;
- Harmonising Maritime Laws for the regional country as far as possible. Though entire harmonisation is unrealistic but improvement on maritime framework is possible;

Development of Maritime Domain Awareness

Acts that promote maritime instability like terrorism, piracy, smuggling of dangerous material that originate from land and find ways to the sea through the coast. Therefore, local knowledge is very vital to ensure maritime security. Integration of coastal population in general and the coastal fishing and trading community in particular in the intelligence gathering process can enrich much needed local knowledge. Besides, a national awareness programme may encourage coastal population to be watchful and contribute to countering maritime terrorism.[17]

Conclusion

This paper discussed and developed the concept of maritime terrorism and maritime security by outlining related terminologies and definitions followed by stating its relevant organisational characteristics as well as recent examples. Notably, the paper discussed the current trends in the incidences of maritime attacks around the globe for the past decade and a half and the looming threat of these types of attacks on Bangladesh. The paper also elaborated on the contemporary conception combatting maritime terrorism together with strategic options for Bangladesh.

Since 2001 there had been remarkably few maritime terrorist attacks anywhere in the world. However, the threat from potential maritime terrorism continued to loom large, particularly for western states, some of which saw a major terrorist incident at sea as inevitable. Despite advances in maritime security at the broader international level, the main vulnerability of these countries can still be attributed to lack of maritime domain awareness, ineffective arrangement for maritime jurisdiction and enforcement; different interpretation of the Law of the Sea; weak regional participation in legal instruments that deal with maritime terrorism, and lack of capacity to

17 Commander M A Razzak, "Opportunity for cooperation against Sea Borne Terrorism."Headmark, Spring 2006, Journal of the Australian Naval Institute.

implement new standard in ship security, cargo and port security, and seafarers' documentations.

With the upgrade of the economic status of Bangladesh to the lower-middle income country bracket, the possibility and impact of terrorist attacks, specifically in the maritime domain, has also increased. The sheer dependence of the country on sea-trade to boost its economy makes it a lucrative target for terrorists either for economic sabotage or for raising funds to support other inland operations. Along this line, Bangladesh, more than ever, has to place significant importance on establishing measures on preventing and combatting maritime terrorism.

As the threat of maritime terrorism emerges, Bangladesh cannot face the challenge independently. Significantly, the establishment of trans-governmental networks will offer the country a clear-cut solution by using both formal and informal networks to coordinate policies through direct contacts between mid-level bureaucrats and specialists, rather than by engaging in diplomacy at the highest levels of government. These networks will lead to more responsive counterterrorism policies and would promote sustained, robust and technocratic cooperation that can be easily tailored to fit the specific needs of each regional partner.

Recommendations

Although the solution to the challenges in preventing and combatting maritime terrorism can only be achieved multilaterally with cooperation between regional partners, the Bangladesh Navy should spearhead a more detailed assessment of the looming threat of this type of terrorism with the aim of recommending amendment to strengthen existing laws and the creation of specific policies. In view of the aforementioned, the following are recommended for Bangladesh:

- Establishment of a maritime domain awareness program through the government initiative nexus by conducting various seminar, symposium and workshop by all maritime stakeholders;
- Surveillance in maritime zones and offshore installations using the capacity enhanced Bangladesh Navy and induction of air assets in the Bangladesh Coast Guard; and,
- Establishment of a Regional Crisis Management Centre (RCMC) for intelligence sharing and monitoring system, forecast, warning and deployment of quick response teams to combat maritime terrorism in the Bay of Bengal Region.

BIBLOGRAPHY

1. Commodore M A Razzak, (S), afwc, psc, BN on 07 August 2015.
2. Commodore S Misbah Uddin Ahmad, (C), afwc, psc, BN on 08 August 2015



3. Captain Mostak Ahmed, (G), psc, BN on 20 Jul 2015
4. Justin V. Hastings and Victor Asal "When Terrorism Goes to Sea: Terrorist Organizations and the Move to Maritime Targets" (2014)
5. A Cooperative Strategy for 21st Century Seapower. US sea services. March 2015.
6. Cooperative security in the Asia-Pacific.
7. Murphy, Martin N, Small Boats, Weak States, Dirty Money: Piracy and Maritime Terrorism in the Modern World (New York: Columbia UP, 2008).
8. Chalk Peter, "The Maritime Dimension of International Security: Terrorism, Piracy, and Challenges for the United States."(RAND Corporation, 2008)
9. Hoffman, Bruce. Inside Terrorism. (New York: Columbia UP, 2006).
10. Mitchell, Colin L, "Countering Maritime Terrorism in the Caribbean Sea and the Atlantic Ocean: Implications of Possible Maritime Terrorism in the Caribbean." (Dubuque, IA: Kendall Hunt, 2009)
11. Patch, John. "The Overstated Threat." In Modern Piracy and Maritime Terrorism: The Challenge of Piracy for the 21st Century. Edited by M. R. Haberfeld and Agostino Von Hassel, (Dubuque, IA: Kendall Hunt 2009)
12. The 5th Anniversary IISS Asea Security Summit. The Sangri-La Dialogue.
13. Memorandum 5,6,7,8. Council for Security Cooperation in the Asia-Pacific (CSCAP).
14. Eric Shea Nelson, Maritime Terrorism and Piracy. Global Security Studies.
15. Dr Peter Roell Maritime Terrorism – A Threat to World Trade? ISPSW, Berlin, Germany.



Commander M Mahbubur Rahman, (TAS), psc, BN was commissioned in the Executive Branch of Bangladesh Navy on 01 July 1999. He attended various courses at home and abroad. He is an Underwater Warfare specialist. He is a Navy SEAL and completed his SOF training from South Korea. The officer is one of the pioneer and raising members of Bangladesh Navy Special Warfare, Diving and Salvage Command. He attended many courses on SOF Operations and Counter Terrorism organized by SWADS. He is a graduate of Defence Services Command and Staff College, Mirpur, Dhaka. He has obtained Masters of Science in Military Studies. The officer has a fine mix of command, staff and instructional duties. He has commanded BNS ATONDRO and BNS SHAH PORAN. He also served in different capacity on-board frigates, patrol crafts and Auxiliaries of Bangladesh Navy. He served as Staff Officer (Operations Plans) and Staff Officer (Intelligence) at NHQ and as Instructor at BN SWADSCOMD. The officer worked as peace keeper in Lebanon in 2012-2013. Commander Mahbub is a keen sportsman and an passionate reader. At present, the officer is serving as Staff Officer (Operations) to Commodore Commanding Khulna.

OPERATIONAL IMPORTANCE OF TEJGAON AIRPORT vis-â- vis URBANIZATION IN DHAKA CITY

Wing Commander AKM Ziaul Haque, afwc, psc, atc

Historical Background of Tejgaon Airport

Tejgaon Airport was constructed during the WW-II, in 1942 for use by the Allied Forces. Later on, to meet the requirement of local people of this area it was turned into only airport of the then Bengal. In early 60s, in order to use by the fighter aircraft of Pakistan Air Force the runway was extended upto 9000x150 feet and necessary land acquisition was also done to make it a full-fledged joint civil military airport.

During the liberation war of 1971, this airport was bombed and damaged by the Indian Air Force. After the liberation war, the airport was re-constructed, repaired and was the only international airport of new independent Bangladesh. At the same time, due to sincere and visionary effort by the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman; Bangladesh Air Force Base Dhaka was established. Since then different aircraft like MiG-21, AN-24, AN-26 used to operate from this airport.

In the end of 1981, another new airport was opened for operation at Kurmitola and all civil aircraft started operating from the new airport. But military aircraft like MiG-21, F-6, FT-5 etc had still been operating from Tejgaon airport. This airport was also used for BAF flying training purpose. In 1986, only the fighter operation of BAF was shifted from Tejgaon to Kurmitola; BAF transport aircraft and helicopters continued to operate from Tejgaon. Later on, Bangladesh Army Aviation started its journey also from Tejgaon Airport. Presently all BAF helicopter operations, transport operations, and transport training operations by newly procured L-410 aircraft are continuing from Tejgaon airport. Army Aviation has also expanded in manifold, their helicopters, Cessna and Caravan operate only from Tejgaon Airport.

In 1987, the then government declared Tejgaon runway as "National Parade Square". But next year (1988) the country experienced the devastating flood of the history. That time all relief activities were conducted from this airport. Later in 1998, the then Awami League government declared this airport as full-fledged military airport and handed over the airport to BAF. From then onward this airport is used by mainly military aircraft for operation, training, relief activities and VIP/VVIP operation.



Operational Uses of Tejgaon Airport

Tejgaon Airport is used for many civil and military purposes. After the liberation war of 1971, the war wagged country was rebuilt through this airport. All the rehabilitation activities, foreign aids, post-disaster relief activities etc were conducted from this airport. In continuation to these activities the "Prime Minister's Relief Center" was established beside the Tejgaon airport. After the devastating flood of 1988, this airport was the life line of Dhaka and surrounding areas by acting as hub of all relief activities. The detail of different operational activities conducted from Tejgaon airport has been discussed below:

- **Training.** Tajgaon airport is the hub of all training activities of different MI series helicopters of BAF. Future pilots, technicians are being trained from this airport in order to prepare themselves to undertake the duties and responsibilities which will be entrusted upon them. Recently BAF has procured new transport trainer aircraft, L-410; this flying squadron is placed in Tejgaon and operating from Tejgaon airport. Not only the BAF personnel are being trained here, but also Army Aviation of Bangladesh Army, Rapid Action Battalion (RAB) have their aircraft and helicopters. The training of these government organisations personnel are also conducted solely from Tejgaon airport. Here is the statistics of training missions carried out from Tejgaon airport in last 09 years.



Source: ATC Sqn, BAF Base Bashar and Dte ATS, Air HQ

- **VIP/VVIP Operation.** Most of the VIP and VVIP movement operation within the country are being conducted from this airport. With the increasing security threat, the location and position of VIP/VVIP aircraft and operation always carry the highest importance to this nation. With govt permision "No 101 Special Flying Unit" of BAF, conducts all the VIP/VVIP operation. This unit operates aircraft like C-130 and also Mi series helicopters (VIP version) from Tejgaon airport. In near future BAF may plan to acquire Executive Jet for VVIP operation, which will also be operating from Tejgaon airport. Thus all the rules and regulations regarding height restrictions of International Civil Aviation Authority (ICAO) and also Bangladesh Gazette are applicable for Tejgaon airport as well. The data of VIP/VVIP operation carried out from Tejgaon airport in last 10 years is given below.



Source: ATC Sqn, BAF Base Bashar and Dte ATS, Air HQ

- **Relief Operation.** In the present day context the possibilities of natural calamities are very high. During the devastating flood in 1988, which flooded our Hazrat Shahjalal

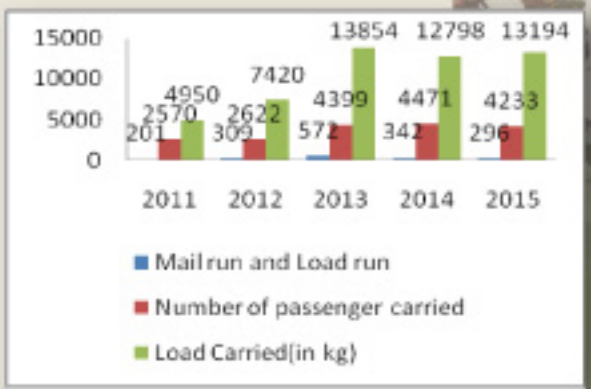
International Airport (HSIA) as well and made it unusable for aircraft operation; that time only available airport in Dhaka, was Tejgaon airport. Thus all the relief operation was conducted from Tejgaon airport. During other natural disaster like cyclone of 1985, 1991, 1997, SIDR of 2007, NARGIS of 2008, AILA of 2009, Tejgaon airport became the hub of entire relief operation of the country. The statistics of 3 major relief operation carried out from Tejgaon airport are given below.

Source: Dte Air Op and Dte Met, Air HQ

EVENT	YEAR	NUMBER OF MSN	HOURS FLOWN	RELIEF CARRIED (In kg)	PASSENGER CARRIED
Cyclone	1991	234	326:55	1,73,290	1,480
SIDR	2007	325	520:10	7,05,817	2,642
AILA	2009	18	50:05	40,596	110

- **Alternate Airport to HSIA:** On 18 June 2003, it was decided by Government that due to bad weather or for emergency landing of any commercial airliner in case of runway blocking of HSIA, Tejgaon airport will be used as alternate airport. It was also decided that all VIP/VVIP flights and in case of any requirements like war, military fighter aircraft will also operate from Tejgaon airport. According to that decision, Tejgaon airport is always kept standby to receive any light to medium commercial airline. Thus all the rules and regulations regarding height restrictions of ICAO and also Bangladesh Gazette are applicable for Tejgaon airport.

- **Passenger and Cargo Movement:** Both BAF and BA carry out mail run and load run to and from Tejgaon. Helicopters, fixed wing aircraft are used for this purpose. By this mail run and load run different emergency cargo are being transferred to and from Dhaka. Mail run helps BAF and BA personnel to travel to their respective places like Bogra, Lalmonirhat, BAF PKP and BAF Station Shamsher Nagar. BA mail runs also travel to Jessore and Chittagong airports. These mail and load runs help BAF and BA to maintain the equipment serviceability and most importantly by transporting personnel uphold the moral to a great extent. Here is data of passenger and cargo movement carried out from Tejgaon airport in last 05 years.



Source: Air Movement Flight, BAF Base Bashar

- **Short Take-off and Landing (STOL) Service:** In 1991, Short Takeoff and Landing (STOL) service started in Bangladesh from this airport. Through this STOL service capital city was connected with any remote part of the country either by small fixed wing









aircraft or by helicopters. This service not only connected whole country but also reduced the load of huge air traffic on HSIA.

Strategic Importance

From military strategic point of view Tejgaon airport holds a very significant importance. Due to its location almost at the center of the country, this airport has very good defence-in-depth. This is very important for the survivability of military war assets and also to conduct air operations. At the same time by using this airport necessary reaction time and operational readiness for air defence coverage of VAs and VPs around Dhaka can be provided easily. Moreover, Tejgaon airport has unique places for dispersal of aircraft which will enhance their survivability, this in turn will help to formulate and execute "Air Campaign Plan".

Government Decisions Regarding Tejgaon Airport

Considering all the above mentioned strategic importance, operational requirements, vis a vis urbanization issue of Dhaka city, there were intra-governmental high level discussion regarding the future of Tejgaon Airport on 18 June 2003. After detail discussion between all stake holders of Tejgaon airport following significant decisions were made (Ref: No1ha-8/92/D-9/293 dt 26.06.2003):

- BAF will operate all helicopters, light training aircraft and transport aircraft from Tejgaon airport.
- During war or emergency period BAF may operate fighter aircraft from Tejgaon airport.
- If the runway of HSIA becomes unusable due to bad weather or for other reason, Tejgaon airport will be used as alternate airport.
- Army Air Regiment will operate their helicopters and transport aircraft from Tejgaon airport.
- Training for private airlines operators.
- All VIP/VVIP movement operation for domestic destinations will be conducted from Tejgaon airport.
- During any natural disaster, Tejgaon airport will be used to meet the emergency by allowing local and foreign aid carrying aircraft operation.
- Height restrictions will be imposed around Tejgaon airport; Bangladesh Gazette (CAR-84) will be applied for this.

Thus as per the decision of that meeting Tejgaon airport will always remain as an airport and it has to be fully ready to be used during any war or any emergency. It has been mentioned before that Government has entrusted BAF with the responsibility to use and maintain this airport in 1998.

Urbanization in Dhaka City

Bangladesh is one of the most heavily populated countries in the world. The country is experiencing a rapid urban population in recent decades. Uneven development and regional policies, natural hazards, and the lack of employment opportunities in the rural areas are the key factors of urban population growth. Dhaka city is the worst sufferer of this urbanization issue. The effect is unplanned high rising buildings around the city and to be particular around Tejgaon airport. As per the ICAO rules there is height restrictions around Tejgaon airport as shown in fig 1.

Many attempts were made by different private sectors owners to lift these restrictions. Different print media also published fabricated news time to time in favor of lifting the height restrictions around Tejgaon airport. But every time BAF as representative of Government and also Civil Aviation Authority of Bangladesh (CAAB) were strict enough to keep the height restrictions valid for Tejgaon airport. In this regard Dte of ATS, Air HQ through different representatives played the focal role as directed by the senior leadership of BAF. Every time some of the ATC officer attended the meeting and played a vital role to preserve the national interest.

Miscellaneous Aspects

The green areas in Dhaka city are reducing alarmingly. The ecological balance which is created by this airfield in this overcrowded mega city, is a very important aspect. If this airfield would not exist and there would have been buildings and buildings everywhere, that would be havoc for the inhabitants and certainly would disturb the ecological balance of the city.

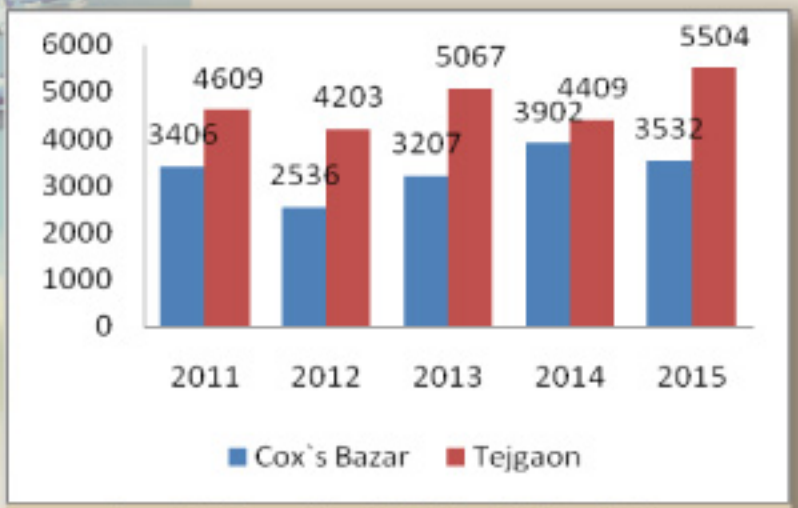
There are two lakes existing inside the airport area, which are still protecting the airport from overflowing of rain water. These lakes are also containing the excess rain waters around the airfield and saving the surrounding area from over flooded.

Here is another interesting comparison of aircraft movements between Tejgaon airport and Cox`s Bazar airport in last 5 years. If we see the comparison, we will find the aircraft movements in Tejgaon is much higher than that of from Cox`s Bazar airport, though the Cox`s Bazar airport is going to be an International airport.

Recent Development

On 26 Dec 2012, a meeting took place presided by Honorable Minister of Civil Aviation and Tourism, where some revised restrictions were agreed between all stake holders of Government and other private entrepreneurs. As per the new decision, the Obstacle Limitation Surfaces (OLS) map has to be finalized. In the OLS map the overlapping airspace between Tejgaon airport and HSIA has been redefined. That is, all buildings/installations beyond 1.8 km on the eastern side of Tejgaon airport shall be subject to





Source:Cox`s Bazar Airport & ATC Sqn, BAF Base Bashar

HSIA instead of Tejgaon airport. By this the private entrepreneurs will be benefited as height restriction in those areas will be lifted. Thus areas like Dayaganj, Jatrabari, Gendaria, Jurain will be free of any height restriction. And areas like Badda, Goran, Rajarbagh, East Siddheshori, East of Bara Magbazar will enjoy 150 meter constant height, instead of 145 meter at a ratio of 1:20(1feet height gain every after 20 feet). In that meeting it was also decided that necessary Gazette will be published and now on wards all concerned are to follow this.

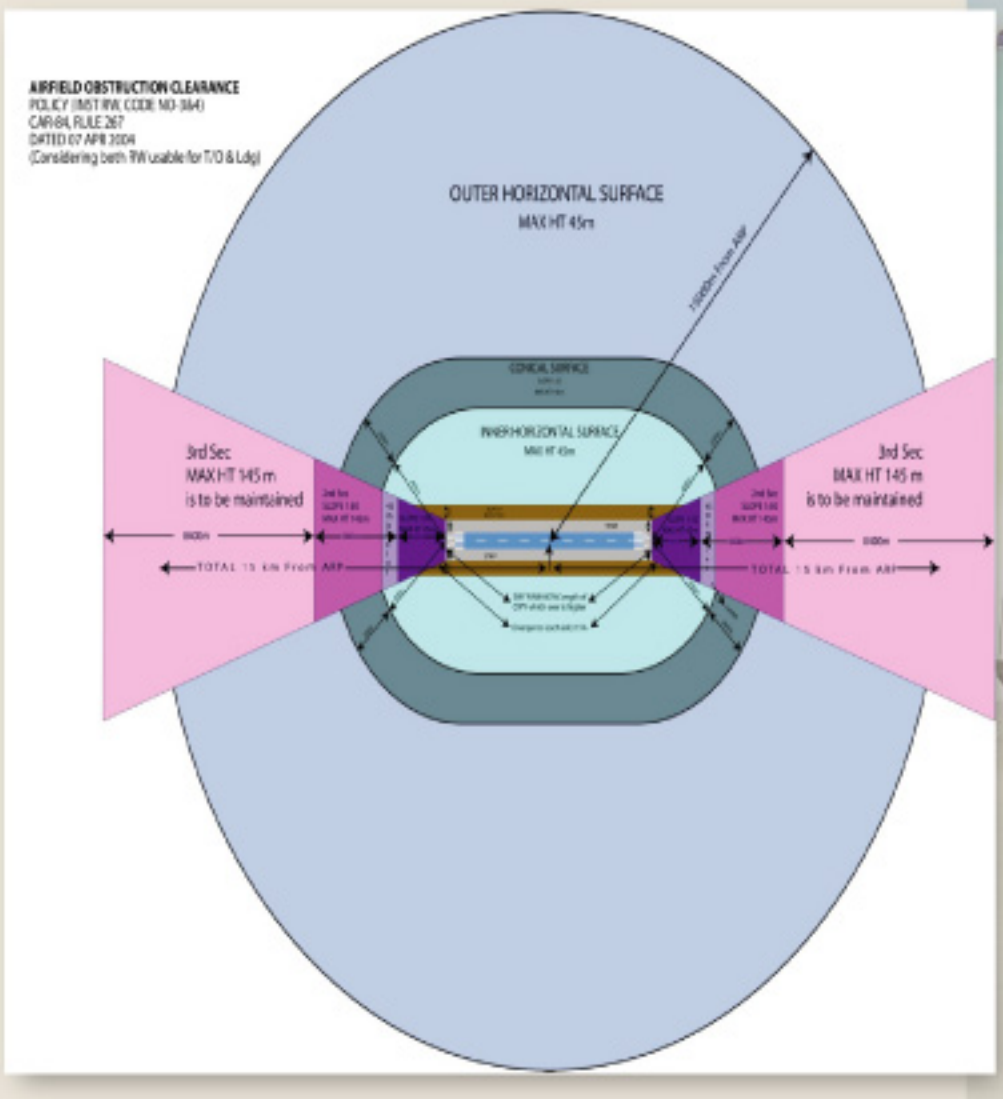
Conclusion

It is very expensive and time consuming to construct a new airport. Tejgaon airport is the first international airport of Bangladesh at the same time first military air base. This airport played a significant role during rehabilitation phase of newborn Bangladesh and also during any natural disaster. It has been decided by the Government to use this airport as an alternate to HSIA and at the same time remain stand by for any emergency like war. Accordingly BAF has been entrusted to keep this airport as operational. From strategic point of view also, this airport has significant importance. Having highest defence- in-depth this airport could be used to protect our VAs and VPs.

In order to ensure safe take-off and landing from any airport, there is height restrictions as per ICAO, and CAAB, being the regulatory body formulated CAR-84, which denotes the prescribed height restrictions to be applied around any airports of Bangladesh including Tejgaon Airport. However in order to address the urbanization issue of Dhaka city, BAF has given highest consideration and new OLS map has been formulated in co-ordination with CAAB, and all other regulatory bodies of Government. This should put an end to all the height restriction issues and debates around Tejgaon airport.

BIBLIOGRAPHY

1. Different reports, correspondence, minutes of meetings in Air HQ, CAAB and Ministry of Housing and Public Works.





Wing Commander AKM Ziaul Haque, afwc, psc was commissioned in ATC branch on 03 January 1991. His professional training includes Basic ATC course in BAF Base Bir Sreshto Matiur Rahman, Civil Aviation Training Center, Dhaka and in Turkey. He did his ATS Radar Course in BAF Base Bashar and advance ATC course on Approach Control (Procedural and Radar) in Italy. He has completed Air Staff Course at Defence Services Command and Staff College and Armed Forces War Course from National Defence College, Dhaka. He has served in all the ATC Sqn of BAF both as ATCO and also as SATCO. Beside professional duties, he served as Deputy Director Plans and Assistant Chief Inspector at Air HQ. He also has served in United Nations in DR Congo both as ATCO and as SATCO. At present he is serving as Deputy Director, Dte of ATS, Air HQ.



JOINT LOGISTICS FOR BANGLADESH ARMED FORCES : PRACTICABLE POSSIBILITIES

Maj Md Ziaur Rahman, ASC

My logisticians are a humorless lot... they know if my campaign fails, they are the first ones I will slay

..... Alexander

Introduction

Logistic support commonly, known as Combat Service Support, holds key to the success and victory in any military operation. Logistics in military doctrine refers to the art and science of designing, planning, acquiring and carrying out the movement of the forces including their combat equipment and supplies in the battlefield. Success in military campaigns and victories in war cannot be achieved without providing good logistic support. Obtaining a superior edge in military capability has been a never ending race in the art of war, leading to the present Revolution in Military Affairs. Without adequate logistics, Revolution in Military Affairs would be incomplete. In post World war and the Gulf War time, the lesson learnt is that coordinated effort between the Armed Forces is timely unavoidable in achieving freedom and flexibility of operations. Waging war in the current milieu is logistic driven and it determines the limits of the operational capability.

The existing logistics system has evolved from the World War era in support of conventional warfare and to give due credit it has been effective in the past. The support and accounting system in use by the defence services is a legacy of the colonial era. Present conditions, imperatives of operational requirements and experience of other countries are a fair indication to suggest a system where resources may be shared or in other words a joint logistics may be adopted. An important factor against integrated logistics is the experience in Iraq where the lapse in logistic doctrine of US revealed a weakness in allocating priority in joint operations where each service attempts to support its own being detrimental to the larger operational plan. It would therefore be prudent to start with joint logistic and improve upon it as we progress.

Sound logistics enable effective use of force internally against terrorism and disaster management and externally in out of area contingency situations. The three Services have their individual logistics systems which have areas of commonality which are potential areas of cost reduction if correctly channelized. This paper attempts to identify these areas. The subject is too vast to arrive at final conclusions for which detailed examination would be necessary and as such, this article is a professional approach on the subject. In this paper initially the existing logistics system of

Bangladesh Armed forces logistics is discussed with its limitation. Thereafter, experience of other nations is shortly highlighted, then the requirement is focused, and the article terminates with ways forward with some recommendation for future course of action for effective joint logistics in support of emerging patterns of operations.

The Existing Armed Forces Logistics System and its Limitations

The existing logistics system of Bangladesh Armed forces was inherited from the Pakistan Armed Forces. It has seen some modification from time to time and its compartmentalized and disjointed growth has been able to meet, at best, the short term requirements, whenever the need arose. The system was basically designed by British to meet the requirements of World War II. Presently the field formations in three Services have their own logistics setup to support operations. Logistics planning, provisioning, procurement and distribution is carried out independently by each of the three services. This has resulted in divergent approaches, duplication in holdings, training and infrastructure. The fall out of these individual systems is a lack of convergence and holistic approach to defence needs, resulting in suboptimal utilization of resources and efforts. Some of the major weaknesses in the present logistic system are summarized below:

- The three Services have not evolved a common logistics doctrine and philosophy of logistics support. There is limited interaction and inter communication amongst the three Services in matters of logistics.
- The three Services have undertaken automation in the sphere of logistics independently. Jointness and integration are through common systems only.
- There is lack of expertise in the field of logistics and there is no system in the Services of developing logisticians in the Services. All the PSOs dealing with logistics are not from the logistics stream.
- The equipment of three services are of various in nature, which is difficult for procurement, operational coordination, and also for cannibalization.
- Also three services having different food/ration menu, which will be difficult to supply.

Experiences of Other Nations

A comparison of the systems followed by our Armed Forces and UK –which had the same origin–shows up the vast differences between the two as they exist today. Interestingly, despite their overwhelming victory in World War II and with their experience of several very large scale tri-service military operations with US forces, under overall supreme commanders, such as General Douglas Mac Arthur in the Pacific Theatre and General Dwight D Eisenhower in Europe, both the US and UK spotted serious flaws in their higher defence organizations. These countries made innumerable





changes in their defence organization set-ups. Changes made with a view to modernizing and enhancing the effectiveness of militaries have been a universal phenomenon. However, the extent and specifics of the transformation have obviously varied and have been guided predominantly by the security and threat perceptions of each individual nation. What has however, been common across the board is the impact of the information technology revolution on logistics management. Perhaps the most visible example of logistics transformation has been the US, which has modeled its logistics on the basis of its experience in various wars in recent times. Though the US model need not necessarily serve as a role model for other Armed Forces to follow, it however offers an example of managing logistics in the modern day conflict scenario where rapid deployment and sustaining mission oriented logistics will need to be taken cognizance. Various reforms undertaken by other countries have not been totally successful and smooth. Another issue to remember is that in the quest to achieve jointness it should not be forgotten that the responsibility for military planning must never be divorced from the responsibility for execution followed by management- which is so strikingly prevalent in our case. From the military perspective the successive defence reforms in the UK have tended to strengthen the central government at the expense of the services. It is a general perception that in UK, the Chiefs in their collective capacity have been reduced to a subordinate advisory level with the involvement of the Chief of Defence Staff, the Permanent Under Secretary and the Chief Scientific Advisor advising the Government on military matters. Thus the changes introduced should also protect the position of the Chiefs since the defence forces cannot be run purely on the basis of corporate logic and ethos even if at first glance such approaches appear to make economic sense. However, the main argument against adopting a model similar to that of the USA or UK is that it would not serve our purpose because both the countries have never faced a real threat to their homeland and their armed forces have hardly ever been deployed for defence of the mainland. Their strategic objective has thus been global, although, the UK's, overseas responsibilities have been on the decline over the past 50 years. On the other hand Bangladesh may have to deal with sub conventional, restricted border skirmishes a limited conventional war.

Ushering a Change

Any change in the military setup is not easy and the same is true in case of our Armed forces as of others. Even in the case of the USA and UK, changes in the logistics of the Armed forces were the consequence of political intervention through Goldwater Nichol's Act 1986 of USA and Strategic Defence Review (1998 & subsequent reviews) in UK. Gen Starry, a former head of the USA Army Training and Doctrine Command has listed the seven conditions which needs for joint logistics for any Armed forces Which are as applicable to us these are:

- First, a mechanism for identifying the contours of change is needed.
- The reformer should share cultural and intellectual commonality through shared educational and training background. What it means for us is that we should have a military authority with requisite powers to bring about the required change.
- There should be an effective spokesperson for change.
- There is need for consensus building to get a wide audience for new ideas.
- There should be continuity of service for the architects of change.
- The champion of change must be at the apex of the organization.
- Change must be undertaken after rigorous trials and their visibility demonstrated to all stakeholders.

In a joint services scenario, it would require planning and reassessment to streamline the functioning also to highlight its shortcomings. Thus a gradual step-by-step approach towards logistics transformation may be more practical. Creating an appropriate joint logistics footprint involves more than structural changes. It also involves the development and refinement of the concept, idea and material support. Modern militaries the world over have adopted the concept of Revolution in Military Logistics (RML). The RML concept aims at total asset visibility, real time response and focused logistics and creating a capability based, modular and flexible organization capable of anticipating and predicting logistics requirements along with the creation of matching infrastructure and facilities. In the Bangladeshi context the logistics system of the Armed forces will primarily be dictated by type of operations that are, or may require to be undertaken i.e. the guarding of our borders and the defending of our maritime interests. A large number of our forces are operating in terrains with limited infrastructure in terms of roads, rail with poor industrial base. Thus defining appropriate scope of joint logistics model including joint logistics organization becomes important for inter service cooperation and for synchronization of all components of military power to achieve a common military aim. Thus four essentials of jointmanship which must be adhered to in our case are: The main question in our case is to analyses whether we have a logistics commander at all, who can initiate a change. Thus jointness in the three Services both operational and logistical becomes national objective and not a defence objective alone. Joint operations are today a reality, a necessity and the desired way of conducting operations that will obviously demand joint logistics. Joint operational logistics therefore should fulfill three main objectives which are:

- To enhance strategic responsiveness of the forces to meet deployment timelines.





- To reduce the logistics foot prints in the area of operations without compromising on combat effectiveness.

- To reduce logistics costs without reducing war fighting capabilities and readiness.

Ways Forward

The big number of troops and their heavy military hardwares required huge logistic support effort in the form of ammunition, fuel, food, water, medical and maintenance services. The future battle will be involving multinational operations rather than purely national operations. As such, force densities will be a lot lower, and there will be no clearly defined 'front' or 'rear'. Deployment will be more complex, non-linear and less dense, and be in terrain that has little or no strategic infrastructure or in an urban environment. The new emphasis on power projection operations and the changing nature of the battle space will mean that the scale and intensity of future operations will be demanding for logistics forces. The need now is for logistic systems to support a range of diverse operational roles.

- **Organization**. The organization for joint logistics must be able to coordinate the use of Individual Service assets in operations and also to coordinate other resources of the country. At the level of the Services, the organization of joint logistics has to encompass the existing resources of each service as they are. The organizational structure will have to be modified so that they facilitate deployment of resources smoothly in support of joint operations. Also for smooth functioning of joint org manpower has to be increased. This would require standard functional process and forms used in routine work. The organizational structure will also have to be standardized as far as possible including the nomenclature of the appointments and their responsibility to facilitate easy understanding of the system across the services. Most important a culture has to be inbuilt where allocation of resources to the other services must be routined and executed at the lowest level rather than something special requiring multi approval.

- **Control.** At this level HQ logistics directorate is responsible to control the planning and distribution of resources for joint operations and lay priority. This would require a detail study to work out the mechanism based on integrated inventory control of the services over a common network. This would not only help reduce common inventory but afford flexibility on the use of resources so important for joint logistics. At the operational level, the mission specific resources will have to be placed at the disposal of the formation commander. While the HQ logistics will do so, there must be complete visibility of the resources available to them for fast decision making. The process has to be routined rather than special. Thus it is envisaged that each brigade group will be provided logistic resources required to be drawn from any service imparting them self-reliance and high

mobility. While joint logistics is theoretically easy; practical implementation is another story. In a joint service scenario, it would require planning and rehearsals to streamline the functioning as also to highlight the shortcomings. A gradual step-by-step approach would be practical and will prevent confusion. In the Bangladeshi context, this can be tried out in joint exercises. In related areas of operations, Army can supply logistics to Navy and Air Force, and also in some cases, Navy or Air Force can deliver the goods to Army. For example, when Army is operating in an island, Navy takes responsibilities of providing logic. Various training institutions may be required to be modified as mentioned above to make the process efficient. The most important fact of joint logistics is the common head of the force who will decide service priority.

- **Automation.** The aim of automation is to establish domain-wide visibility, which is the ability to see the requirements, resource and capabilities across the joint logistics domain. Three fundamental enablers frame the ability i.e. standard database, connectivity and a focus in an operational sense. Database is the foundation of any automated system and a reliable database is the first requirement of inventory control. The resources are therefore required to be organized on a common database across the three services. A common database highlights the importance of standardization across three services. There is a need to make it more dynamic by establishing a node at each large stock holding depot of the services to codify the complete inventory at the earliest, in the long run this would facilitate inter-service inventory control.

- **Networks.** In any large organization, the software is common and compatible across all functions. This ensures complete transparency of data vertically as well as horizontally. Inexplicably all three Services would develop their own models whereas all experience and logic would recommend a unified software. Even if this were not possible, at least an interface between them should have been established. It does not need clairvoyance to visually advantages of a common logistic-software and network. This will facilitate inventory control by way of eliminating duplicity, reduction in holding of common items and flexibility to shift resources. It would also facilitate common training and development on the software to function under diverse operational conditions. It will lead to shared awareness, common measure of performance and asset visibility across the three services. Joint logistics depend upon a sound and networked inventory control system. The system becomes effective if it can facilitate exploitation of the supply chain as a back-end function. The supply chain extends to the manufacturers and vendors .

- **Transportation:** It was noted that movement of troops and supply of materiel require suitable transport and logistics equipment and facilities, reliable transport and communication infrastructure are essential for logistic





support; accessibility, speed and flexibility are essential for logistic facilities; and strategic lines of communications are essential for logistic support operations were key elements of distance in logistic support to military operations. Transportation is a resource common in nature to all services it entails move of men and material by land, water or air to accomplish a mission. This has to be inbuilt in the organization for the combat troops. In case of air and water transport would be under the operational command of the respective service land transport can be on a common platform. Land transport can be provided from own resources or outsourced. Whatever may be the circumstances all transport resources have to be placed under the operational commander for speed and efficiency of operations. This will facilitate smooth carriage of men and material for combat and evacuation of casualties. Load tables can be standardized and SOP's need to be formed to allocate transportation smoothly.

- **Procurement.** Capital procurement at the apex level has been centralized in order to achieve synergy of effort and obvious advantages accrued due to centralized purchase. The further, it includes items in use that are common to the Services. Introducing interoperable and similar kind of equipment for the three services like if the communication equipment of three services are of same in nature, then it would be better for procurement, operational coord, and also for cannibalization. A more pragmatic approach would be to identify the inventory at two levels first at the main equipment level where it is in use by more than one service like guns, vehicles, etc at the second level should be common items consisting of sub-assemblies that are critical for functioning of main equipment. On an integrated and in a fully automated system it should become possible to review these items and rationalize their holdings across the services to some extent and at least achieve flexibility of shifting resources in an emergency so that joint operations are not hindered. The organizational strength in the background that needs to be built is not holding of large stocks but a responsive and quick system of procurement so that resources are available when required.

- **Warehousing.** Warehousing is a major but unnoticed cost centre, where expenditure can be reduced. It can be combined to exploit scarce real estate and storage space, especially for ammunition. It would require a platform of uniform procedures, staff-work and forms. Since the accounting and audit systems for materials in the defence services are common it would not pose a major problem to store inter services items in one location. Minor adjustments may be required to meet service specific needs. Specific locations have to be decided on case-to-case basis.

- **Distribution:** Distribution of materials on the push model using assured transportation would bring the process closer to the just in time inventory concept or 'when required' and reducing cost of holding.

Distribution management needs to be streamlined on the transportation model. The system of central stocking and then further distribution needs to be refined. The onus of holding stocks needs to be shifted on to the supplier and to exploit his existing distribution network as far as possible. In a joint logistics concept, the responsibility of positioning stocks must be with the higher HQ (Push model) who have complete visibility of the stocks held and have the authority to set priority. The lower operational units are not encumbered with the indenting process but merely have to record the consumption as it occurs online using the dedicated networks. This is likely to instill the confidence in the logistic system and free the operational units from administrative work. Thus in a joint operation, the logistic support would need minimum staff approvals and intervention thereby reducing the time lag and enhancing mobility of forces.

- **Training.** Joint operations envisage joint logistics to support them, i.e. while the individual service continues to organize, equip and train its personnel it must be geared to support joint operations. While this state may not change other factors, facilitating joint logistics can be positioned. To promote a smooth dialogue and transactions at the work level where resources are decentralized for the period of operations. To achieve this, respective training establishments need to be brought under the same umbrella. This will enable a uniform system of basic training for logistics and inventory control and accounting. Thereafter specialized training can be branched off to cater for service specific conditions, knowledge of operations and equipment functioning to avoid mismatch at the operational end. Since the basic principles and concept of inventory control and audit are similar, there is substance in the suggestion that this training can be combined. This will facilitate interoperability across each service. It also establishes personal understanding and trust at the work level, which is important in joint operations. The principles of logistics are simple but as the scale of operations increase, the complexities too increase exponentially, requiring special skills in its associated parts. If joint logistics is required in support of joint operations, a common platform of software, organization, cataloguing and warehousing would have to be adopted. In logistics, incremental improvement organization is always advised, therefore as a first step joint training can be started before the organization structure and finally the command structure is integrated.

Recommendations

The need for an integrated joint logistics setup is not only felt by logisticians, but even by the operational commanders too. The first and the foremost important factor required for initiation of desired change is to make a correct decision. This paper puts forward following recommendations:

- Various joint training may be conducted under direct supervision of the Training Directorate of the Armed Forces Division to allow members/





trainees of three services in propagating and interacting respective ideas.

- Joint logistics doctrine may be formulated .
- For better procurement, operational coord and also for cannibalization similar kind of equipment may be introduced for three services.
- For easier supply system for three services may have similar kind of food/ration menu.

Conclusions

Without waiting for big ticket changes to start, which would obviously take time, the three Services should internally be able to place logistics under one single authority within each Service. It is evident that there is great resistance to change especially when it is transformational in nature. Though there may be resistance to change but the inherent nature of organization can also facilitate higher pace of change if the management of change is well articulated and structured. The change in the logistics setup not only effects the logistics elements but also the whole hierarchical chain of command and control.

The concept of joint logistics has been introduced in the defence services recently and is yet low on the learning curve. The implementation was not a result of planning. It is felt urgent to integrate the three Services under a combined staff. Since there is no alternative for a developing country like us that needs to protect its interests in a volatile neighborhood. All aspects of joint logistics need to be debated and implemented. Pooling of resources is an important step forward and falls under the domain of joint logistics. Once implemented it would provide the Armed Forces the capability to achieve the national aim.

The present government's aim is to build a strong, modern and cost-effective armed forces, now and for the longer term". Effective joint logistics support can provide a competitive advantage for armed forces. This could be emulated to a greater or lesser degree in the logistics systems and approaches of the Bangladesh Armed forces. The need now is for logistic system to support a range of diverse operational roles, this can only be achieved by adopting and adapting many of the best practices used in industry. Logisticians must never forget the past, always understand the present and operate with a clear vision for the future.

BIBLOGRAPHY

1. David Berkowitz. Ph.D. 2004 Performance Based Logistics
2. David M Moore, 1998 Where Do We Go From Here?
   Past, Present and Future Logistics of the British Army
3. David M Moore, 2000 British Army Logistics and Contractors on the Battlefield
4. Virander Kumar Saini 2013 Theaterysed Joint Logistics
5. S.Bhalla Joint Logistics The Way Forward

6. S.K. Sharma Analysis of Barriers for Reverse Logistics: An India Perspective
7. Y.M. Bammi 20012 Restructuring India's military
8. Defence Logistic Magazine Australian Army 2011
9. USA Defence Acquisition Review Journal Voll-11 No-3 2005
10. Group Captain Phillip Gunnell,2011 Logistics learning for Coalition Operations, Defence Logistic Magazine Australian Army
11. Elizabeth Barber, 2011 The Future of Logistics Education, Defence Logistic Magazine Australian Army
12. Adam Voak, 2011 The Future of Logistics, the Human Factor: Art Versus Science, Defence Logistic Magazine Australian Army
13. Group Captain Andrew Hayues, 2011 Australian Defence Strategic Logistics Defence Logistic Magazine Australian Army 2011
14. http://en.wikipedia.org/wiki/Defence_logistics
15. http://en.wikipedia.org/wiki/Armd forces joint_logistics



Maj Md Ziaur Rahman, ASC, was Commissioned in 2000 at 43th BMA Long Course. He has served in various ST Bn, Staff Officer in ASCC&S, AHQ, MT Coy beside these he has served in BGB also. He attended various courses at home. He was in Sudan for a tour of duty with UNMIS in Sector-3 (Malakal) as Fuel Officer with BANPET-3 in 2007-08. Presently, he is the Officer Commanding of Station Supply Depot, Comilla Cantonment.



OPEN SPACE EMERGENCY SHELTER-A GUIDELINE FOR ARMED FORCES OF BANGLADESH DURING DISASTER MANAGEMENT

Major Khandaker Mustafizur Rahman, psc

Introduction

A disaster can strike practically anytime, anywhere like earthquake, storm, fire hazard, flood, chemical spill etc. These emergencies are different, but they could have one crucial element in common: large numbers of people could be forced from their homes with little warning. When a disaster forces people to evacuate, they need a place to go until it is safe to return home. They may need to stay for only a few hours, but it could be for days, even weeks. There might be only a dozen families seeking help, or it could be an entire town. Some may already be sick or have special needs, and there may be many children and aged persons. These people need food and water, a place to sleep, and lots of help. What these people need is an emergency shelter may be in an open space.

Bangladesh Armed Forces is assigned to perform disaster management duty as her secondary task. At present, the country is prone to earthquake risk and it may trigger the secondary or third level of disaster. The city of Dhaka is one of the highest and densely populated cities in the world. This needs an urgent attention right now. A guideline for open space emergency shelter may assist the Armed Forces of Bangladesh in their existing or planned policies of disaster management.

Aim

The aim of this paper is to introduce and discuss some important aspects of an open-space emergency shelter as a guideline for Armed Forces of Bangladesh.

Planning Aspects

Well planning defines the success of any emergency response.

- Disasters affected communities require a community response.
- Strong relationship with different stake holders are mandatory.
- To be planned as part of urban planning, if possible.
- To be planned ahead and mapped properly.
- To be decided through a series of inter cluster and inter ministerial workshops.
- Participation of interested groups such as NGOs and local people to be ensured.

Role of an Open-Space Emergency Shelter: The role of an open-space emergency shelter is to provide the most basic elements that peolple need to survive.

Developing Shelter Sites

Each city needs its own list or inventory of shelter facilities with basic facility data on capacity, bathrooms and showers and floor plans. Examples of potential shelter sites

- **Public and Private School Buildings:** School auditorium and large multipurpose rooms are ideal for sleeping areas.
- **City-Owned Facilities:** Community centers, recreational facilities, auditoriums or convention halls. They can accommodate 300 to 500 persons at a time.
- **Religious Places:** Mosques, madrasas, churches, temples or other privately owned facilities.

Criteria for Selecting Shelter Sites

Shelter facilities may have the following characteristics:

- Space for parking
- Space for sleeping (40 square feet per person).
- Toilet and shower facilities (one toilet per 40 people)
- Kitchen / Cooking facilities
- Emergency generator on site
- Safety features (e.g., fire extinguisher and fire alarm)
- Telephones (optional)
- Accessibility for people with disabilities
- Secured storage Areas
- Separate rooms within the facility (e.g., private space for elderly persons, families with children, or persons that need isolation; also rooms for nursing and office space)

Survey of Shelter Sites

A shelter facility survey of designated shelter sites will identify the following:

- Location and contact Information
- Resource information
  - Total shelter sleeping capacity (number) [Note: capacity at 40 square feet per person]
  - showers (Yes/No)
  - number of bathrooms (Number)
  - accessibility for people with disabilities (Yes/No/Partial)





• The survey will also identify what supplies may already be on site (e.g., sleeping mats, blankets, food and water, cleaning supplies, etc.)

Open Space Shelter Sites

To accommodate large numbers of displaced persons, MODMR (Ministry of Disaster Management and Relief) may designate some areas for camping, or setup tents in parks and other open space areas. Given the work involved to create the necessary infrastructure (i.e., electricity, sanitation, water, cooking, security, etc.) along with the public health implications, think of this option as a last resort for sheltering. Sheltering residents in existing buildings, where a basic infrastructure is already in place (i.e., parking structures, stadiums, etc.), remains the first and the best option.

Primary and Secondary Sites

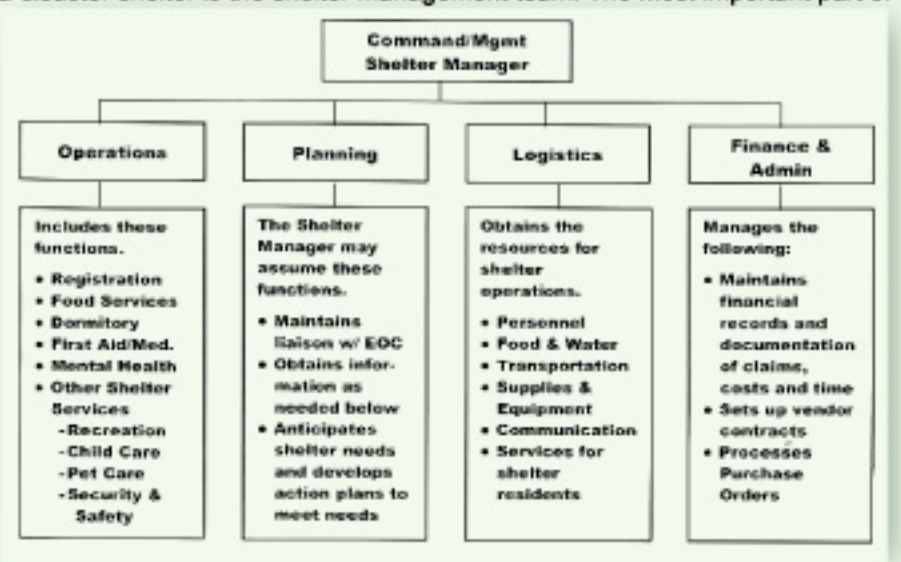
In opening disaster shelters, local jurisdictions need to designate between primary and secondary shelter sites.

- **Primary Sites:** Primary sites can handle larger numbers of shelter residents and are accessible for persons with disabilities (e.g. a person using a wheelchair can enter the facility and access all service areas – eating, sleeping, bathrooms and showers). Obviously, primary sites receive priority status when there is a need to open disaster shelters, so the larger the pool of primary sites, is better.

- **Secondary Sites:** Conversely, secondary sites do not meet all criteria, yet they may be advantageous for neighborhood-based sheltering and with some modifications can fully accommodate persons with disabilities.

Organization of a Shelter Operations Team

Aside from the actual facility, the next most critical component to operate a disaster shelter is the shelter management team. The most important part of



the team is the shelter manager. In opening a disaster shelter, the shelter manager's first responsibility is to assign available staff to fill the following functions.

Planning to Meet Disaster Shelter Needs

Public shelters should provide occupants with a safe place to sleep along with some provisions for food, with a challenge to meet a diversity of human needs. Care and shelter personnel are encouraged to plan judiciously to meet disaster shelter needs.

Registration: Care and shelter personnel must plan for a method of registering each person housed in the shelter, including both their dates of arrival and departure. This information is the only documentation for the jurisdiction of who is in the shelter. It also helps the jurisdiction to locate missing family members.

- **Planning Considerations**

  • Document All Occupants. Ensure the registration of all shelter occupants upon their arrival to the shelter. Assign volunteers or someone on site to perform this task.

  Emergency Management Cycle

  • Registration Data. Keep a simple record on plain 3 x 5 inch cards of every person who is housed in the shelter. The following registration information is needed:

  • Family last name (at the top of the card)

  ii. First and middle names for husband and wife.

  iii. Names and ages of all other family members.

  iv. Pre-disaster address.

  v. Note any health concerns or special needs.

  vi. Date arrived in the shelter; date departed shelter.

  vii. Post-disaster address.

- **Emergency Contact Name and Phone Number.** There should be at least one/two emergency contact numbers with name and additional information to meet any emergency situation.

- **Special Needs.** Use registration as an opportunity for people to self-identify any medical, dietary, medication, or accommodation needs (i.e., needs for special assistance).

- **Sign-in/Sign-out Policy.** Establish a sign-in/sign-out policy when



shelter residents leave for any period. This helps to keep an accurate shelter population head count.

Food Services. Care and shelter personnel must ensure that a food provision and ordering system is in place to feed shelter residents. This will require a close working relationship with the Logistics Section to implement any of the following planning strategies.

- **Option One - Catered or Fast Food.** The simplest strategy for feeding the shelter population is to have food catered or brought in from the outside.
  - Fast Food Outlets. Given the confusion immediately following the disaster (or until mass feeding operations can be organized), it may be easiest to initially use 24hour restaurants or fast food outlets in obtaining meals for shelter residents. Later it will become easier to prepare hot meals.
  - **Restaurant Caterers.** Identify local commercial suppliers like restaurants, catering firms, hotels etc and make pre-planned arrangements for suppliers to provide meals to persons in shelters.
  - **Institutional Suppliers.** The larger suppliers of fully prepared, packaged meals like MRE (Meal Ready to Eat) for institutions and in an emergency, it could be used to supply disaster shelters.
- **Option Two-Designate a Central Kitchen.** An alternative strategy is to designate one large, central institutional kitchen within the local jurisdiction as the site to prepare and provide meals for each shelter operating within the jurisdiction.
  - **Bulk Food Donations.** Utilize the Logistics Section of the city/wards to obtain large bulk food items from local sources and then direct supplies to the central kitchen.
  - **Shelter Delivered Meals.** Once meals are prepared, they can be delivered to local shelters (similar to meals on wheels operation).
- **Option Three-On Site Meal Preparation.** A third strategy, assuming the shelter site contains kitchen or cafeteria facilities, is to prepare meals on site.
  - Cafeteria Staff. If a school is used for the shelter facility, care and shelter personnel may have the use of food services staff that normally operates the cafeteria.
  - Food Preparation and Cleanup Volunteers. Shelter residents can also assist as part of food preparation and cleanup crews.

Health Care Services. When that health care issues will arise, shelter facilities must provide access to adequate health care services. A well-run shelter must protect the health of residents, prevent disease, and provide first aid as required.

- **First Aid.** Shelter personnel must plan to have basic first aid assistance available at the shelter. People will come to the shelter with minor injuries.

- **Identify Staff with First Aid Training.** Inventory city employees as to disaster skills and have employees with first aid skills assigned to shelter teams.

- **Use Trained Shelter Residents.** Residents within the shelter may include persons with first aid, nursing, or medical backgrounds.

- **Medical Emergencies.** Call upon local paramedics or coordinate with the medical unit in the operations section of the city/wards for medical emergencies. Transfer anyone with serious injuries, or anyone who is very sick, to the care of a local hospital.

- **Prescription Drug Management.** Some persons within the shelter will have very individualized medication regimes that cannot be interrupted without consequences.

- **Storage of Medication.** A systematic and timely plan for the storage of medications; refrigeration is required for some medications.

Information Services. Sheltered personnel must plan for the collection, communication and distribution of care and shelter information. This includes information about the disaster, about relief services available to shelter residents, as well as information to help reunite separated family members.

- **Public Shelter Messages.** As the authority puts out public messages about shelter locations, stress that residents going to disaster shelters bring necessary items like blanket or sleeping bag, change of clothes, personal hygiene items and prescription medications.

- **Bulletin Boards.** Set-up bulletin boards near the shelter registration area as a means for disseminating information to the shelter population.

- **Shelter Meetings.** There should be daily shelter meetings as another way to share information and dispel false rumors that may be circulating within the shelter population.

Volunteers. Care and shelter personnel must plan for the involvement of volunteers in all aspects of delivering care and shelter services. Volunteers (either from the community or from the shelter population) may help to staff shelter functions.

- **Sources for Volunteer Recruitment:**
  - **Shelter Residents.** Use volunteers from within the shelter population.
  - **Community Residents.** Use volunteers from the community, either through recommendations from the city's personnel office, the Red Crescent or local volunteer center.











- **Voluntary Organizations.** Non-Governmental Organizations (NGOs), faith-based organizations and local congregations are another source for voluntary support.
- **Maintain a Volunteer List.** The jurisdiction may want to train a cadre of local volunteers, in advance of a disaster, to provide support at disaster shelters.

- **Area for Volunteer Involvement.** The following are some of the roles for volunteers within the shelter.
  - **Reception.** Meet and greet arriving shelter residents and provide comfort.
  - **Registration.** Help newly arrived shelter residents to fill out registration forms.
  - **General Operations.** Support with shelter operations such as shelter setup, food services, and shelter maintenance etc.
  - **Health and Human Services.** Support with more specialized services such as first aid, mental health, child care, recreation and personal assistance services from support to seniors and people with disabilities, to help with language translation.

Safety and Security. Care and shelter personnel must plan to operate shelter facilities in a manner that promotes the safety and security of each resident within the shelter. This includes establishing and posting clearly understood rules so all shelter occupants understand what is expected of them.

- **Shelter Rules.**
  - **Provide Rules at Registration.** Shelter residents must understand the rules upon registration. Plan to have rules prominently posted and then reinforced at shelter orientation sessions.
  - **Enforcement of Rules.** Use rules as a cause for dismissal if broken. Depending on the circumstances, a shelter committee may be employed to oversee disputes and call on local law enforcement to assist with serious disputes or rules violations.
- **Policing Functions.**
  - **Security/Safety Inspections.** Plan to regularly inspect the facility (and the surrounding grounds) to ensure compliance with shelter rules, fire regulations and to spot any potential problems. Coordinate with local law enforcement and fire services for assistance when needed.
  - **Private Security.** In a large shelter population, plan to contract with a private security company to handle policing functions may be considered.

• **Monitoring Occupant Flow.** Establish one entrance and exit to the shelter and secure all other entrances and exits. This is to prevent theft from people outside the facility and to facilitate sign-in/sign-out procedures.

Shelter Maintenance and Equipment. Operating a shelter for a sustained period requires plans for the daily upkeep of the facility and for the ongoing acquisition of equipment and supplies. Since it is their "temporary home," shelter residents may be asked to assist with housekeeping and cleaning activities. Staff normally responsible for the facility may be available to support operations.

- **Vendor Agreements.** Form as many agreements or vendor relationships as necessary with local businesses now to supply goods later during shelter operations.
- **Donated Goods/Services.** During operations, work with logistics to obtain donated goods and services to support shelter operations.
- **Waste Management.** Plan to arrange for daily garbage/waste removal. A major earthquake disaster will most likely disrupt regular service.
- **Portable Toilets.** As necessary, arrange for the installation of additional toilets and possibly shower facilities.

Additional Shelter Layout Tips

Sheltered should first proceed to the registration desk before going to their lodging area.

- Set-up a bulletin board near the registration table. Post messages received for shelter residents and shelter rules and relief information.
- Set-up the sleeping area, so each person (cot) has 40 square feet of space (5'x8'). If space permits, set-up separate sleeping areas for the elderly, people who are ill and families with small children.
- Provide adequate space for a shelter manager and associated staff to function 24 hours per day. This includes space for staff meetings, administrative functions, communications and volunteer coordination.
- Organize the space so that it is accessible for people with visual or mobility disabilities; make space for disabled parking in the parking lot. In addition, organize space to provide for adequate ventilation.
- Locate medical and health services in a well-lighted room or area that is away from public view. If possible, keep medications and medical equipment in a lockable storage compartment.
- Create an additional quiet area for counseling or interviewing persons.
- The food storage area should be secure and accessible by truck.
- Ensure that garbage is stored away from food storage and occupied








shelter areas. A major earthquake disaster may disrupt garbage removal service for some time.

- Designate an outdoor smoking area away from air intake vents and flammable materials.
- Create an area outside for the handling of pets.
- Ensure that the shelter address is clearly visible from the nearby street; post a sign that clearly marks the building as a disaster shelter.
- Self-contained, chemical type toilets are necessary, to supplement regular toilets (1 per 40 persons) or when regular toilets are either disrupted or are not a part of the shelter.
- Check on the availability of emergency generators at designated shelter sites. Emergency (backup) power is necessary for lighting, ventilation, cooking, refrigeration and heating or cooling the shelter facility.

Guidelines for Shelter Rules and Regulations

Guidelines for shelter rules or safety regulations may be as follows:

- Registration – Place the registration near the front of the shelter. Shelter residents should first proceed to the registration desk before going to their lodging area.
- Indicate any restricted areas within the shelter facility.
- Encourage shelter residents to keep valuables elsewhere. If this is not possible, encourage residents to keep valuables with them at all times.
- Establish quiet hours, but provide a place for those who cannot sleep.
- Establish shower and bathing schedule and post prominently.
- Establish a regulation and stick to it.
- Establish policies regarding use of telephones.
- Establish outdoor smoking areas (if using a convention hall, auditorium or religious places).
- No abusive or belligerent behavior toward staff or other shelter residents.
- No stealing or destruction of property.
- No food in the dormitory/sleeping area.
- Children must be accompanied at all times.
- Shelter residents must be dressed appropriately at all times.
- No alcohol or drugs are allowed in the shelter and no admittance into the shelter is allowed while a person is under the influence of alcohol or drugs.
- No weapons in the shelter.
- No pets in the shelter.

Conclusions

In any disaster incident Bangladesh Armed Forces are the first to respond besides community people. It is of paramount importance to manage an incident place rather than controlling it. We need to ensure a minimum of comfort, security and dignity for individuals in difficult conditions. Large agencies such as the military forces of superpower nations, have already developed standard camp installation plans. Humanitarian agencies try to consult local populations to ensure that their camp operations techniques respond to the culture of displaced populations. This taking into account of the nature of the displaced population (such as whether the majority of the population is comprised of women or children or ethnically different families) must be considered when plans are made concerning the spatial organization of a camp.

This will give Bangladesh Armed Forces a starting point on its way to developing and providing a safe, secured emergency shelter in an open space for the people when they will need it most— we never know when the next disaster strikes.



Major Khandaker Mustafizur Rahman, psc, Infantry was born on 07 June 1981 at Dhaka. He passed both Secondary School Certificate and Higher Secondary Certificate Examinations from BAF Shaheen College, Kurmitola, Dhaka. He was commissioned from Bangladesh Military Academy (BMA) with 46 BMA Long Course in the Corps of Infantry on 26 June 2002. In pursuance of his career, he gained experience of serving in a unit of Chittagong Hill Tracts under OPERATION UTTARON (19 Bangladesh Infantry Regiment), Commando Battalion, Directorate General of Forces Intelligence (DGFI). Meanwhile, he held all the regimental appointments under different capacity. He is a post graduate on Disaster and Human Security Management from Bangladesh University of Professionals (BUP), Mirpur, Dhaka. He is also a graduate of Defence Services Command and Staff College, Mirpur. Presently, he is working as Second-in-Command of an Infantry Battalion. He has participated in United Nations Peacekeeping Mission in Cote D'ivoire as a contingent member. He is happily married to Major Farhana Afrin, Artillery, who is presently undergoing Army Staff Course in Defence Services Command and Staff College, Mirpur.

ARMED FORCES' CONTRIBUTION IN RESHAPING THE TOURISM SECTOR OF CHITTAGONG HILL TRACTS

Lt Col A F M Atiqur Rahman, afwc, psc, G, Arty

"Sea beaches are not our only tourist destinations; but our rivers, hills, old heritages, establishments, relics, tea-gardens and scenic areas in the Chittagong Hill Tracts are also attractive tourist sites,"

–Honorable Prime Minister Sheikh Hasina

Introduction

Tourism industry has become one of the largest and fastest growing economic sectors around the globe. United Nations World Tourism Organization (UNWTO)[1] is much optimistic on increasing state of tourists turn over around the globe. Bangladesh has all the potentials to become a tourism friendly country. UNWTO devised 'Tourism Vision 2030' and accordingly, Bangladesh being one of its members, formulated 'Bangladesh Tourism Vision 2020'. Bangladesh possesses many tourist destination spots which include Cox's Bazar, Sundarban, Chittagong, Sylhet, Chittagong Hill Tracts (CHT) and places of religion and cultural heritage. Amongst these, touch of growing urbanization is less found in CHT which is one of the pre-requisites of tourist attraction.

Internal communication network within CHT has grown up significantly. Bangladesh Army has been developing road infrastructure of CHT for decades. Different tourism stakeholders [Tourism ministry, Bangladesh Parjatan Corporation[2] (BPC), Bangladesh Tourism Board[3] (BTB), tour operators etc. are also giving due importance to it. Bangladesh Army, Navy and Border Guard have also established and developed a few resorts and tourists' spots at their own. Inadequate infrastructure, remoteness and security issues make it difficult for different stakeholders to work on CHT tourism. On the contrary, to fulfil the 'Vision 2020', CHT tourism has to be given due importance. With this backdrop, this paper discusses the opportunity for Bangladesh to promote CHT tourism with a view to putting forward few thoughts on how Bangladesh Armed Forces can contribute in reshaping the tourism sector of CHT as part of nation building activities.

1 The United Nations World Tourism Organization (UNWTO) is the UN agency responsible for the promotion of responsible, sustainable and universally accessible tourism.

2 BPC is a statutory board under the Ministry of Civil Aviation & Tourism of Bangladesh, tasked to promote the tourism industry of Bangladesh.

3 BTB is a national tourism organization deals with tourism development, promotion and marketing.

Snapshot 1: Honorable Prime Minister (HPM) of Bangladesh Urges All to Give Tourism a Big Boost[4]

On 27 October, 2015, while inaugurating a high-profile international conference on tourism HPM Sheikh Hasina expressed, "I find the entire country as a vast terrain full of tourist attractions. The bounties of six seasons, wide layout of alluvial plains, water-scapes, hillocks and valleys, villages under the canopy of trees and shrubs of this eternal land can amaze anyone". She also said that Bangladesh tourism sector has again started playing an important role in overall economic development of the country due to her government's well-thought-out plans and programmes.

Snapshot 2: HPM for Expediting Development of Tourist Spots

On 04 March, 2016, in a meeting of Bangladesh Tourist Council (BTC), HPM asked officials to expedite development of existing and prospective tourist spots. She also urged concerned officials to take necessary measures for encouraging local people in tourism and explore all tourism potentials. Speaking at the meeting, the HPM said Bangladesh would be an attractive tourist spot for foreigners if the tourism plan is taken over the existing tourist sites.

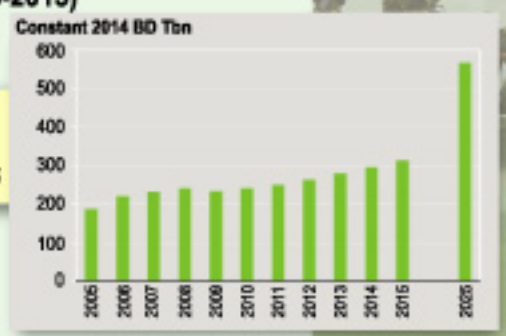
From above two snapshots, we can realize the government's intention regarding tourism development. As such, in this year (2016-17) Taka 100 crore has been allotted for tourism sector

Bangladesh Tourism: A Close Look on CHT

Tourism as Economic Sector in Bangladesh

Bangladesh being economically developing country expected to be a middle income nation[5] by 2021 where promotion of tourism sector can be one of the tools. Having all the opportunities, one cannot neglect this source of economic development. Tourism jobs and businesses can be created including remote and underdeveloped regions of our country. This will help equalizing economic opportunities, providing incentive for residents to remain in remote areas. Graph below shows direct contribution of tourism to GDP in Bangladesh.

Graph: Direct Contribution of Tourism to GDP (2005-2015)



Sources: WTTC[6] *Travel & Tourism Economic Impact 2015*

Forecast of Earning in Year 2020

BPC forecasted likely inbound tourist arrival in Bangladesh would be at least 500,000 by the year 2020 which surpasses UNWTO's prediction. Though, BPC has not mentioned

4 http://www.daily-sun.com/printversion/details/86537, <accessed on 28 May, 2016>

5 Ahmed, Saleh Uddin Professor, 18 April 2013, Economy as a National Power and its Influence in National Security, Armed Forces War Course, National Defence College, Dhaka.

6 World Travel and Tourism Council (WTTC) is an international organization of travel industry executives promoting travel and tourism worldwide.



specifically on CHT but it can be assumed that by the year 2020, expected foreign visitor in CHT will be approximately 0.135 million and likely foreign currency earning will be around US$ 25 million.

Tourist Potentials of CHT

CHT with a total area of 13,295 square kilometers, is approximately one-tenth of Bangladesh with ethnic, cultural and environmental diversity.[7] CHT offers spectacular natural beauty where plains, hills and natural water streams have intermingled together with lush green valleys[8]. Famous Kaptai Lake spreading over 680 square kilometers of crystal clean water flanked by hills and evergreen forests lies in Rangamati. For nature seeking tourists, Khagrachari is an ideal spot. Bandarban is considered as roof of Bangladesh. Tahjindong (4632 feet), the highest peak of Bangladesh, is located in the Bandarban district. CHT provides a good opportunity for ecotourism and adventurous events than any other region of Bangladesh. Adventurous events can often be termed as military tourism in many countries. In military tourism, Armed Forces contribute by giving opportunities to civil tourists for obtaining military experiences. Events may include hill climbing, driving tanks in rough terrain, Bungee jumping, rappelling, para gliding, jungle trekking, viewing from chopper, lake cruise by obsolete auxiliary naval ships and many more.

Present Infrastructural Condition

Existing road communication network of CHT is workable yet require more development for tourism. Road communication in remote places still remains difficult. However, beside national and local bodies, Bangladesh Army is prime mover in constructing road communication network. People always welcome Armed Forces to participate in this type of nation building activities because of their sincere effort, timely implementing and quality control. Water communication is available in CHT but could not flourish due to unavailability of basic infrastructure like landing stations, tourist vessels etc. None of the CHT districts has airport facilities. There are many nonfunctional airstrips lying unused close to CHT. Recreational facility is one of the major factors in tourism sector. Our Nilgiri or Sajek are often being compared with Ganting Highlands (Malaysia) in terms of natural beauties but lack in providing recreational facilities. Physical Security is a pre-requisites for tourists.[9] International tourist feels insecure because of few stealing, abduction cases or act of terror. At times it becomes difficult for law enforcing agencies to handle the issues due to the remote location. Due to shortage of tourist friendly accommodation, at times they are compelled to stay for shorter duration. Foreign tourists prefer to stay in Dhaka or Chittagong and try to stay less in CHT.[10]

7 http://www.mochta.gov.bd/ viewed on 25 June 2013

8 Area Headquarters, Chittagong, Prospect of Tourism in Chittagong Area.

9 Chowdhury, Dr. Col. ASM Manzur Morshed(retired) 2010, Tourism in Bangladesh, Tempera Printers and Colour Limited,Dhaka, p 186.

10 Bangladesh Tourism Vision, pp71-77

Lacunas in Developing CHT Tourism

Security Issues and Remoteness

Fear of security threat has been identified as one of the main barriers of promoting tourism in CHT. Remoteness of area is also a difficult factor for implementing any infrastructural project works.

Land Issues

Acquisition of land for new tourists' spots in CHT is very tough process. Due to the gradual increase of farmers in the hills, fresh lands are decreasing. As such it is difficult for the national or government tourism organization to implement any new infrastructural project for tourism development.

Tour Operators and Private Organizations

Tour operators don't feel confident organizing trip to CHT. They demand for tax holiday and luxurious car for foreign tourist transportation.[11] Private tourism investors usually don't want to turn up in CHT, as they suffer from fear of unknown security hazard. Construction firms and contractors suffer from shortage of skilled local labours, difficulty in transportation of materials and equipment, and unfamiliar weather condition.

Justifying the Need for Bangladesh Armed Forces' Contribution in CHT Tourism

Contemporary Armed Forces

Thailand Armed Forces contribute to their national economy through tourism infrastructure development. Thai Army deployed in remote areas of tourist interest are usually given with infrastructural development responsibility.Thai Air Force operates ex-military Cessna, 'Bird Dog' a spotter plane used in 1949-1962 for aerial viewing by tourists. Royal Thai Army has integral tourism wing headed by an officer of the rank of Major General. This wing oversees the development of different tourist spot in remote areas for developing physical infrastructure. Every year, projects worth millions of Thai bahtare allotted to Royal Thai Army, Navy and Air Force to develop tourist attractions and camps within their deployment. Sri Lanka Army also realizes the fast-swelling demand in country's flourishing tourism industry. As such it rebranded its eco-friendly holiday resorts. Vietnam Armed Forces contribute in their tourism industry to a great extent. World famous Cu Chi Tunnel[12] constructed during war against America (1960-1975) is still preserved and maintained by Vietnam Armed Forces to receive hundreds of international



11 Interview with Prof. Dr.Aftabuddin Ahmed, President, Tour Operators Association of Bangladesh (TOAB), on 09 June, 2016.

12 Cu Chi Tunnel was the holy revolutionary base of military region committee Saigon-GiaDinh high command of Cu Chi district party committee and all Cu Chi people, where was also a versatile battle formation to front enemy and to contribute significantly to task of enemy fighting and national unity.

tourist visiting every day.[13] They have separate branch to deal with the infrastructure development of tourism industry.

Bangladesh Armed Forces

Our Armed forces also have required capacity to contribute in tourism sector by working in remote places like CHT. Over the decays, they are working in CHT and well conversant with the overall CHT scenario. Ministry of tourism, BPC or BTB can always seek help and cooperation from Bangladesh Armed Forces in this regard. Bangladesh Army's road development work in CHT is still ongoing with lot of future projects.

Bangladesh Army

Bangladesh Army has Special Works Organization (SWO) working in CHT. It has construction battalions under them. These battalions are involved in supervising different project works of roads, bridges in CHT. Major slice of roads in remote areas are constructed under their expertise and protection. Recently, Road Thanchi-Alikadam (considered as highest altitude road of Bangladesh) has been constructed by Army and inaugurated by our Honorable Prime Minister. Metaled road along the international border along CHT will also be constructed which will open up new avenue for Bangladesh to be part of multi-nation tourism destination.

Map: Road Construction in CHT by Bangladesh Army



Table: Details of Road Construction Project of Bangladesh Army

Project Name	Road Length
Chiringa-Alikadam Road	40 km
Panchari-Gourangopara	14 km
Dighinala-Marishya	20 km
Baghaichari-Naniarchar-Langodu	37 m
Rajesthali-Bilaichari-Barkal	87 km
Chimbuk-Thanchi	53.5 km
Baghaihat-Masalong-Sajek	36 km
Thanchi-Alikadam	35 km
Khagrachari-Dighinala-Baghaihat	32.80 km
Chittagong-Hathazari-Rangamati	37 km
Dighinala-ChotoMerung-Chongrachari-Langodu	40 km
Bangalhalia-Rajesthali	21 km
Ghagra-Chandroghona-Bangalhalia-Bandarban	58.92 km
Total	**536.22 km**

Source: Collected from Special Works Organization, Chittagong on 19 June 2016.

13 Armed Forces War Course 2013 Overseas Study Tour (OST) by author to Cu Chi Tunnel in Vietnam in 2013.

Bangladesh Navy and Air Force

Bangladesh Navy has got their installation in Kaptai. Besides, they actively provide all kind of security support to Army with their small vessels in the river route of CHT. Bangladesh Air Force is part of overall function in CHT. The entire rescue and evacuation mission, carrying senior officials etc are implemented by their helicopters. Air Forces played important role by evacuating foreign and local tourist from Saint Martin Island during Tsunami warning in 2004.

Likely Fields of Contribution by Armed Forces

Communication Network

At present, there are only few good inter-district and sub-district road networks available to travel around CHT. However, if the future road projects of Bangladesh Army can be extended and linked to few selective tourist spots then the CHT tourism sector would be benefited.

Recreational Facilities

Events like boating, river/lake cruises, water sports, hill adventures, forest walks, jungle treks, hill cycling, canoeing are not well arranged in CHT. Armed Forces can be a suitable option for developing adventurous event in CHT tourism.

Eco-friendly Resort and Tourist Spots

There remains a shortage of good number eco-friendly resorts in remote tourist spots of CHT. Bangladesh Army and Border Guard have constructed a good number of resorts and cottages in different areas of CHT. More number of low cost environment friendly cottages need to be constructed in- line with them. Bangladesh Army has already developed few eco-tourism friendly spots with all the facilities in Nilgiri, Sajek which have become very popular. Tourists enjoy pollution free environment and economy of effort staying overnight.

Security

Tourist police should be the prime stake holder to ensure comfort and security of the tourists. In addition, Armed Forces' assistance may be sought in case of any emergency to act as a deterrence. However, in future, if any organized tour packages are introduced, Army may provide additional safety to the tourists within their jurisdiction and area of responsibilities.

Armed Forces vis-à-vis Other Stakeholders

A methodological approach involving all the stakeholders is needed to develop overall tourism infrastructure of CHT. This would allow developing a permanent institutional setup to promote CHT tourism. A quadrilateral approach involving all the stakeholders is needed to develop the tourism



infrastructure of CHT which is projected in the diagram below. Any work in isolation may not bring the common goal. Other stakeholders will definitely be benefited seeking advice from.

Army related to infrastructure development matter

Figure: Stakeholders in Integrated Tourism Development Process



Source: Prepared by Author

Prioritizing Tourist Spot Development

A priority list for developing various tourist spots according to attraction values and requirement of infrastructural facilities needs to be determined. Considering budget constraints, development has to be executed in such a way so that with minimum expenditure it is possible to achieve maximum benefit. Initially, the places need less facility should be given priority over other places. Tourist spots already developed by Armed Forces need to be taken into consideration while developing any tourism zone.

Exploring Water Bodies

Visitors are always attracted by sightseeing through river routes and lakes of CHT. River cruise along Sangu, Maini, Kaptai and Boga Lake are always enchanting for visitors. These would allow them to observe tribal life around the rivers and lakes. Provision of water ski and floating restaurant in rivers and lakes can be organized for entertainment and dining. All recreational facilities can be made available on floating hotels. Bangladesh Navy elements based in Kaptai may take some efforts utilizing obsolete auxiliary ships.

Safari Tourism

To provide with a test of tropical hill forest, safaris with boundary can be arranged for tourists. In this regard, safety arrangements need to be ensured for the adventure seekers. Small little cottages and tribal huts with local food may be arranged during safari. Different stakeholders may seek contribution from Armed Forces in this regard.

Tourism in the form of Adventure

Mountain Climbing, Jungle trekking, Scuba diving, Glider landing and Para motor flying can be introduced in suitable places of CHT. Qualified retired personnel of Bangladesh Armed Forces can supervise these events.

Youth, students and adventure seekers will definitely be amazed getting these exclusive opportunities.

Military Tourism

Military tourism is getting popular around the globe. In many cases, military tourism is developed for those who like adventurous recreation. Military tourism usually develops around places of military environment. CHT is a suitable place for riding military transport and fighting vehicles along rough terrain which would provide someone with the rare experience. They can feel the thrilling lifestyle in hills and jungles.[14] Today, military tourism is one of the fast growing leisure activities in Sri Lanka, Thailand, Vietnam and many countries of South America. Military tourism can add a new dimension in developing tourism infrastructure in our CHT. In this regard, some steps could be taken by developing the concept of military tourism in CHT.

Likely Contribution by Bangladesh Navy

Bangladesh Navy may also contribute in developing and promoting tourism in CHT. As Sri Lankan Navy; Bangladesh Navy may also arrange the sunset cruise including on board restaurant and provision for night stay which could attract the tourists. Navy can also provide the opportunities for scuba diving and snorkeling for the tourists in Kaptai Lake. Canal boat rides and holiday homes can be provided on board small crafts and auxiliary ships and crafts. A Navy big ship of obsolete nature can be kept which can be visited by the tourists.

Likely Contribution by Bangladesh Air Force

Bangladesh Air Forces can provide attractive events to the tourists. Old version plane and helicopters can be used for viewing scenic beauties of CHT. L 39 Cessna (obsolete) may be used for this purpose. Helicopters can render assistance to the tourists for rescue operation in case of emergency. A military hardware display could be arranged in CHT, where Bangladesh Air Force can augment in displaying their collection and replicas. Remote natural treasures (Mirinja range, Sajek range, Rankhiyang range etc.) could be unveiled to tourists by helicopter rides.

Conclusion

Tourism is considered as an emerging economic sector around the globe. Many countries' GDP is primarily influenced by tourism industry. Bangladesh is bestowed with immense natural beauties. CHT occupies a major portion of amazing beauties of Bangladesh. BPC predicts that the tourists' arrival and foreign currency earning in Bangladesh will surpass the estimate made by UNWTO. But, only by Cox's Bazar, Sundarban it would be a difficult task. Tourist potentials of CHT must be taken into consideration and existing facilities of CHT tourism must be developed. Selective remote





tourist spots need to be connected through link roads from existing metaled road constructed by Army. Border road once constructed in future by Army can also play a vital role for inter-country tourism.

Presently, no air communication facility exists in CHT. Recreational facility is less and there remains some kind of fear of insecurity among the tourists. There remains many hurdles too in developing tourism infrastructure of CHT. Absence of sound planning in tourism development of CHT has been felt many a times. Contemporary Armed Forces are contributing much in their national tourism sector having separate tourism wing under the organization. Bangladesh Armed Forces are quite capable of contributing in infrastructured development of tourism in CHT. Developing road and water communication network, supporting for establishing airports and helipads, arranging adventurous events, eco-friendly resort/cottage construction could be possible fields of supporting tourism. In case of emergency, being stationed in an operational area like CHT, Armed Forces may also augment other law enforcing agencies when called for. Experienced retired Armed Forces personnel can be employed in planning and organizing military tourism which will help them finding their second career. Here, possible roles of all forces need to be clearly laid out. At the same time, we must remember that while involving in these jobs, Armed Forces must not drift out from performing their primary role in CHT. Armed Forces can also contribute in shaping the minds of locals on conservation of nature and maintaining the pollution free environment (pre-condition for sustainable tourism) through their usual pacification and motivation programme on behalf of government.

Recommendations

Bangladesh Armed Forces or Sena Kallyan Sangstha may have a separate tourism wing. This tourism wing may look-after the planning and coordination of military tourism promotions, packages and related affairs in CHT in coordination with other public and private tourism organizations. Retired Armed Forces personnel having experience of serving in CHT and qualified in adventure training (like Commando and similar in Navy and Airforce) may be useful promoting military tourism.

There may be a concept of package guided tour conducted by national tourism bodies (BPC, BTB etc.) in all the districts of CHT. Armed Forces may provide necessary assistance in its adventurous events as mentioned in the paper.

BIBLIOGRAPHY

1. Chowdhury, Dr Col ASM Manzur Morshed (Retired), "Tourism in Bangladesh–Tourism Marketing mix strategy and economic impact on national development/GDP of Bangladesh" Dhaka, Bangladesh, Tempera Printers &colour Ltd, 2010 2. Dewan, Aditye Kumar, Wolfgong Mey & Willem Van Schendel, "The Chittagong Hill Tracts Living in a Borderland", The University Press Ltd, Dhaka.

3. Morshed, M Mahbubur Rahman, (Edited by) "Bangladesh Tourism Vision 2020" Dhaka, Bangladesh, Bangladesh Parjatan Corporation, 2004.
4. Swain, Sampad Kumar and J M Mishra, "Tourism-Principles and Practices", New Delhi, India, Oxford University Press, 2012.
5. Tiwari, Satish, "Tourism: Development and Planning" New Delhi, INDIA, Anmol Publications Private Ltd, 2000.
6. Wahab, S and C Cooper (Edited by), "Tourism in the Age of Globalization", London, United Kingdom, Routledge, 2001.
10. WTTC Travel & Tourism Economic Impact 2015.
11. Zahirul Alam, Local Resources of Chittagong Hill Tracts - Present Status and Prospects, (Bangladesh Journal of Political Economy Vol. 23, No. 1 & 2).
12. Md. Rizwan Hassan, Md. Maruf Ullah and Md. Shahnur Azad Chowdhury, Impact of Tourism in Bangladesh Economy, World Journal of Social Sciences, Vol. 3. No. 4.July 2013 Issue. Pp. 228 – 240
13. Dr. Jannat Ara Parveen, Current Status of Tourism Industry In Bangladesh: An Empirical Evaluation, Scientific Research Journal (SCIRJ), Volume 1, Issue 1, August 2013.
14. www.unwto.org/
15. http://www.bangladeshtourism.gov.bd/
16. http://www.parjatan.org/



Lieutenant Colonel A F M Atiqur Rahman, afwc, psc, G was commissioned in the Regiment of Artillery in 1992. He held various command, staff and instructional appointments. Notably, Brigade Major, Commanding Officer and Grade 1 Staff Officer in the Military Training Directorate in Army Headquarters. He is a graduate of Armed Forces War Course from National Defence College and Army Staff Course from Defence Services Command and Staff College, Mirpur and obtained his Mphil part-1 and Masters in Defence Studies certificates. Besides he obtained Masters in Science (Technical) from Bangladesh University of Professionals. He participated in United Nations Peace Keeping Operation as a Military Observer in Liberia as an Adjutant of an Artillery Contingent in Sierra Leone. He attended number of courses at home and abroad including Advance Artillery Course from Nanjing, China. Presently, he is serving as Instructor Class-A at School of Military Intelligence.



REFLECTIONS ON THE ARMED FORCES DAY

Professor Dr. Md. Tawfiqul Haider

21 November is an auspicious date which marks an important milestone in the history of Bangladesh Armed Forces, and the national history. Such an occasion offers a vantage point to reflect on the spirit and significance of the Day as well as the lessons derived from it.

Of all the vicissitudes that occurred in the history of this region towards the beginning of the 70s in the twentieth century, the emergence of Bangladesh as a free and sovereign independent state in the map of the world is undoubtedly unique and distinctive. A dispassionate study of the glorious War of Liberation (26 March - 16 December 1971) reveals that a remarkable aspect during this eventful period is the dynamic and effective role of the Bengalee military personnel (both officers and men) of the three services i.e. Army, Navy and Air Force. These brave sentinels of the soil fought shoulder to shoulder with the people from all walks of life. Researchers and analysts thus appositely describe the Liberation War as a 'Peoples War' in which the regular armed forces rendered a yeoman's service.

Historians and scholars have recorded in their seminal works that the origin and genesis of the Bangladesh Forces (BDF) took place during the first Bangladesh Sector Commanders Conference in the week of 11-17 July, 1971 at the BDF HQ situated at 8, Theatre Road, Kolkata, West Bengal of India. The Bengalee military forces fought in the numerous campaigns under the dynamic command of the Sector Commanders of eleven sectors into which the geographical area of Bangladesh was divided for military operational purpose. Viewing from the proper perspective the Armed Forces Day forms an inspiring chapter in the annals of military operations during the Liberation War of Bangladesh.

On 21 November 1971, the three services of Bangladesh Forces launched a well - coordinated offensive on all sectors of the War against the Pakistani occupation forces and achieved tactical victories. These tactical successes were also matched by strategic victories one after the other. The simultaneous joint operations of the Bangladesh Forces proved decisive and is considered as a turning point of the 9-month long Liberation War. By sheer grit and determination, optimum use of available resources, professional competence and undaunted relentless efforts each and every offensive operation of the Bangladesh Forces spelled catastrophe for the Pakistani occupation Army. With each passing day large areas along the border were liberated and the lines of communications were disrupted. Resultantly within three weeks or so from 21 November there was the total collapse of the combat effectiveness of the enemy forces. All these paved

the path for achieving final victory on 16 December 1971 after a full-scale joint offensive of the Allied Forces which was formed by the Indian and the Bangladesh military forces.

The spirit of the Armed Forces Day is all-pervading and all-encompassing. Every year the very sacred Armed Forces Day brings forth and focuses the spirit of the Liberation War. The lofty ideals of the 9-month glorious War in which there is the manifestation of the spirit of supreme sacrifice are fully echoed through this Day on which the members of the Armed Forces, and the people from different strata recall the memories of the highest sacrifice made by the martyrs who have performed acts of greatest heroism particularly the seven recipients of the highest gallantry award i.e. **BIR SRESHTHO**. They are namely :-

- Captain Mohiuddin Jahangir (Army) - 06 March 1945 - 14 December 1971
- Sepoy Mostafa Kamal (Army) - 16 December 1947 - 18 April 1971
- Sepoy Hamidur Rahman (Army) - 02 February 1953 - 28 October 1971
- Mohammad Ruhul Amin Engine Room Artificer (Navy) 1934/1935 - 10 December 1971
- Flight Lieutenant Matiur Rahman (Air Force) - 29 October 1947 - 20 August 1971
- Lance Nayek Munshi Abdur Rouf (EPR now BGB) - 01 May 1943 - 18 April 1971
- Lance Layek Nur Mohammad Sheikh (EPR now BGB) - 26 February 1936 - 05 September 1971

It is important to note of these seven **BIR SRESHTHOs** five are members of the regular Armed Forces. The entire nation along with the defense services personnel express sincere sympathy towards the members of the martyr families. At the same time the spirit of the Armed Forces Day is further reflected by expressing solidarity with the war-heroes, war-heroines (who have been given the status of freedom fighters), war-injured freedom fighters. And it is eternal truth that **Heroes Never Die.**

The Armed Forces Day bears immense significance in the national history of Bangladesh. It reverberates the Clausewitz Theory of revolutionizing the military forces to act in unison so as to render effective role both in war and peace. In similar vein British Prime Ministers David Lloyd George (1916-22) and Sir Winston (Leonard Spencer) Churchill (1940-45 and 1951-55) during World War I and II respectively have stressed upon the pragmatic and combined role of the armed forces to lead the war with a 'steely resolution'. This element was significantly visible amongst the Bengalee military personnel during the Liberation War. By launching successful operations in the eleven sectors of the War, the Bangladesh Forces earned confidence and admiration of masses from the core of their hearts.

The selfless sacrifice and immense contribution of the Armed Forces





towards achieving the hard earned independence have entrusted upon them with even much more responsibility than the constitutional provision as 'custodians of sovereignty.' In the context of reality Bangladesh is a Third World developing country confronting multifarious socio-economic problems. Due to geographical location and key geo-political position, Bangladesh faces both natural and man-made challenges. During such unforeseen situation the Armed Forces have risen to the occasion and by rendering invaluable services fulfill the expectations of the masses. Their dedicated efforts in the various sectors of national development have earned the praise and appreciation of the common man.

An objective analysis thus reveals that the Armed Forces Day which is observed with zeal and enthusiasm on 21 November every year under the aegis of the Armed Forces Division bears great historical significance not only in the military sphere but also in the body - politic of Bangladesh. In this era of globalization the Armed Forces are not meant to function in isolation for only the defence of the country but also play an effective role to the preservation of peace and tranquility in the strife-torn areas of the world. Thus the cumulative significance of the Armed Forces Day is discerned by the global dimension added to it by active participation of 1,36,000 members from Bangladesh Armed Forces participating in 47 peace-keeping missions of 34 countries since 1988.

More importantly, in a democratic environment the members of Armed Forces are people-oriented with a commitment to uphold the values of democracy. Such an atmosphere ushers in the officers and men the sense of belonging and identity related to their service, society and state. The Armed Forces, thus, form an important and integral part of the social milieu and contribute to the upward mobility of the state.

The lessons derived from the Armed Forces Day act as a beacon of light and ray of hope for each and every patriotic member of the Armed Forces. This historic Day imparts the invaluable teaching that 'Unity is strength'. It was the unified command and action of the three services which drove the last nail in the coffin of the Pakistani occupation forces. That the Armed Forces have emerged as an unifying force is amply testified by the fact that people from different shades of opinion participate in the celebrations organized by the Armed Forces Division not only in Senakunja of Dhaka Cantonment but also in the Cantonments of all other Division HQs as well as in foreign missions where there is a Defence Attache from Bangladesh.

The Armed Forces Day essentially shows how patriotism, zeal and dedication for the cause of motherland can overcome well-equipped and much larger enemies. It is commitment of purpose which leads to ultimate triumph in spite of apparent mighty odds. This significant Day establishes the universal maxim that 'MIGHT IS RIGHT.' It thus corroborates the fact that guns and cannons cannot silence the freedom-loving masses which finds its most befitting manifestation in the historic **SEVENTH MARCH (1971)**

SPEECH by the GREATEST BENGALEE FATHER OF NATION BANGABANDHU SHEIKH MUJIBUR RAHMAN. The clarion call of Bangabandhu unified the entire nation and set in motion the forces which culminated in the War of Liberation. The patriotic Bangalee members of Army, Navy and Air Force took it as a duty to respond promptly to the call of the unparalleled leader of the masses and played their due role with utmost sense of responsibility.

The Armed Forces Day also revives the espirit de corps between the members of the three services and cements their ties with the civil services personnel. By enhancing inter-service bondage the Day strengthens solidarity between the rank and file of the three services as well as people from all walks of life. Civil-military relations gain momentum as testified by the spontaneous turn up of the enthusiastic masses irrespective of gender, age, creed and colour in the exhibitions and displays organized by the three services at different locations all over the country on this occasion is espousal to the actions and deeds, dedication and valour of the disciplined military forces. This may well-nigh be considered as a deferential tribute by the masses to the defence forces. What is unique about the Day is the exposition of fidelity of each and every member of the Armed Forces to the country's flag and for upholding the constitution. In this regard like all patriotic citizens the defence services personnel are committed to unflagging assiduity for even sacrificing their precious lives at the altar of preserving the country's freedom and sovereignty.

In winding up this discussion it is worthwhile to point out that the timely and effective tactical operational role during the Liberation War especially from 21 November onwards by the intrepid sentinels of the Armed Forces have kept invaluable contribution to the liberation of our motherland. Starting from a scratch, step by step almost imperceptibly, the Armed Forces have been built up to an optimum level as a modern defence force of this region. By sheer efficiency and ability, transparency and strong integrity the Armed Forces have earned praise and erudition from home and abroad. In the modern globalized world of tough competition ostensibly there is no scope of complacence. The trust that has been built up over the years enjoins even greater responsibility to enshoulder. As the Armed Forces Day 2016 is being observed with due solemnity and fervour, its the ripe moment for every member of the defence services to take a fresh vow to preserve what has been achieved and aim to make further progress through undertaking regular hard training by acquiring the required efficiency for realizing the Forces Goal-2030. The efficacy of the remarkable Armed Forces Day lies in the fact that it acts as the propelling force for selfless patriotism which has been immaculately expressed in the historical remark made by the 35th US President John Fitzgerald Kennedy (1917-1963), during his inaugural Address, 'Ask not what your country can do for you -- ask what you can do for your country.'



BIBLOGRAPHY

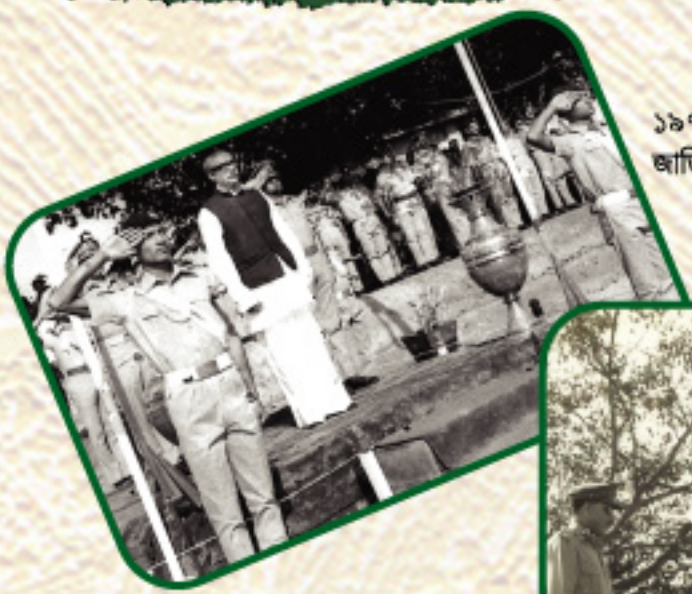
1. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র ১-১৬ খণ্ড, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, ১৯৮৪
2. বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ইতিহাস : মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, প্রথম খণ্ড, শিক্ষা পরিদপ্তর, সেনাসদর, ঢাকা সেনানিবাস, ২০১৫
3. আবুল কাশেম ফজলুল হক, মুক্তি সংগ্রাম (প্রথম পর্ব), বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭২
4. মেজর রফিকুল ইসলাম, একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে, ইউপিএল, ঢাকা, ১৯৮৮
5. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন ও মুনতাসীর মামুন, বাংলাদেশ সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন, ঢাকা, ১৯৭৬
6. মাহবুব আলম, গেরিলা থেকে সম্মুখ যুদ্ধে (প্রথম খণ্ড), সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১১
7. ম হামিদুল্লাহ খান, একাত্তরে উত্তর রণাঙ্গন, বর্ণতরঙ্গ, ঢাকা, ২০০৮
8. নজরুল ইসলাম, একাত্তরের রণাঙ্গন : অকথিত কিছু কথা, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৫
9. কমান্ডো মোঃ খলিলুর রহমান, মুক্তিযুদ্ধ নাবিক ও নৌ-কমান্ডোদের জীবন গাঁথা, শিরীন রহমান, ঢাকা, ২০০১
10. The Bangladesh Gazette, 15 December, 1973
11. Bangladesh Documents, Ministry of External Affairs of India, New Delhi, Vol. I, 1981
12. S. R. Chakrabarty and Narain Virendra ed. Bangladesh History and Culture (Volume One), South Asian Publishers, New Delhi, 1986
13. Clausewitz, Von Kriege (ON WAR), Dresden, 1848
14. Winston Churchill, The Second World War (in 6 Volumes), Thorlton Butterworth Ltd., London, 1955
15. Captain S. A. Garg, Spot Light: Freedom Fighters of Bangladesh, Academic Publisher, Dhaka, 1984
16. Major General D. K. Palit, The Lightning Campaign, Press & Publicity Wing, Ministry of Information, Government of India, 1972
17. Siddiq Salik, Witness to Surrender, University Press Limited, Dhaka, 1977
18. Major General Sukhwant Singh, The Liberation War of Bangladesh, Vikas Publishing House Pvte Ltd, New Delhi, 1991
19. Lieutenant General (Retd) A. A. K. Niazi, The Betrayal of East Pakistan, Oxford University Press, Oxford, 1998
20. Armed Forces Day Journal - 2015, Armed Forces Division, Dhaka Cantonment, Dhaka



Dr. Mohammad Tawfiqul Haider is Professor and former Chairman of the Department of Islamic History and Culture (hereafter IHC Dept.), University of Dhaka. He is a member of the Self-Assessment Committee, IHC Dept., Dhaka University which forms an integral part of the Institutional Quality Assurance Cell of Dhaka University and renders active role in the implementation of Quality Education Program at tertiary level under the aegis of World Bank and University Grants Commission. He is the Editor of the time-honoured peer reviewed research journal - The Dhaka University Studies. He has to his credit 56 research publications both in Bangla and English. His area of specialization are Contemporary Muslim World, Globalization and Islam, Muslim Diaspora, Intellectual Movements while he takes interest in Military History, Oriental and Occidental Civilizations, Civil-Military relations, recent developments around the globe. He is a life member of RAOWA, UNAB, ASB and Bangladesh Itihas Parishad. Professor Tawfiq was a commissioned officer in the Bangladesh Army. He served as an Instructor, Bangladesh Military Academy as well as a Staff Officer in the Brigade. He also served at Div HQs & Log Area HQ in the years of 1979 to 1989. He retired as a Major.

আলোকচিত্রে সশস্ত্র বাহিনী

যে অতীত আমাদের প্রেরণার উৎস



১৯৭৪ সালে রংপুর সেনানিবাসের একটি অনুষ্ঠানে জাতির পিতা



১৯৭৫ সালে কুমিল্লা সেনানিবাসে একটি ট্যাংক পরিদর্শন করছেন জাতির পিতা



বাৎসরিক সমুদ্র মহড়া চলাকালে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জাহাজ 'সুরমা' পরিদর্শন করছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান



জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর কয়েকজন বৈমানিক



১৯৯৭ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সেনাবাহিনীর শীতকালীন প্রশিক্ষণ পরিদর্শন করছেন



১৯৯৯ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রেষ্ঠ ক্যাডেটকে সোর্ড অব অনার প্রদান করছেন



চট্টগ্রামস্থ বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে ২০০০ সালে অনুষ্ঠিত মিডশীপম্যান ৯৭-বি ব্যাচের রাষ্ট্রপতি কুচকাওয়াজে সেরা মিডশীপম্যানকে সোর্ড অব অনার প্রদান করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী



বিমান বাহিনীতে অত্যাধুনিক MiG-29 যুদ্ধবিমানের অন্তর্ভুক্তি অনুষ্ঠানে যুদ্ধবিমানের ককপিট পরিদর্শন করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম



সদর দপ্তর ৫৫ পদাতিক ডিভিশন কর্তৃক আয়োজিত শীতকালীন প্রশিক্ষণ ২০১৫/১৬ এ 'ব্রিগেড আক্রমন' মহড়া অবলোকন করছেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি



৬৬ পদাতিক ডিভিশনের শীতকালীন প্রশিক্ষণ ২০১৫/১৬ উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত ব্রিগেড গ্রুপ আক্রমণ মহড়া অবলোকন করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা



শীতকালীন প্রশিক্ষণ-২০১৫/২০১৬ এ ৬ স্বতন্ত্র এভিএ ব্রিগেড এর অধীনস্থ ৩৮ এডি রেজিমেন্ট আর্টিলারির গান মোতায়েন পরিদর্শন করেন সেনাবাহিনী প্রধান



৬০ স্বতন্ত্র এসএএম ব্যাটারী আর্টিলারি কর্তৃক মিসাইল ফায়ারিং



১৫ সাঁজোয়া আর্মাড স্কোয়াড্রন কর্তৃক হাটহাজারী ফিল্ড ফায়ারিং রেঞ্জে ট্যাংক ফায়ারিং অনুশীলন



এসআইএন্ডটি কর্তৃক পরিচালিত এটিডব্লিউ (পিএফ-৯৮) ফায়ারিং



এসআইএন্ডটি কর্তৃক পরিচালিত কাউন্টার টেরোরিজম কোর্সের শিক্ষার্থীগণ কর্তৃক ট্রেন হতে জিম্মি উদ্ধার অনুশীলন



১১ আরই ব্যাটালিয়ন কর্তৃক এ্যাসল্ট চর ল্যান্ডিং প্রশিক্ষণে রণকৌশলগত চলাচল

নৌবাহিনীর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম



বাংলাদেশ নৌবাহিনীর বিশেষায়িত ফোর্স সোয়াডস্ এর মহড়া চলাকালীন সময়ে মত বিনিময় করছেন নৌবাহিনী প্রধান।



বঙ্গোপসাগরে বাৎসরিক সমুদ্র মহড়া 'এক্সারসাইজ সমুদ্র ঘূর্ণি ২০১৬' এ বানৌজা বঙ্গবন্ধু হতে রকেট লাঞ্চার এর সফল উৎক্ষেপন



বাৎসরিক সমুদ্র মহড়া 'এক্সারসাইজ সমুদ্র ঘূর্ণি ২০১৬' এ বানৌজা বঙ্গবন্ধু থেকে সাবমেরিন বিধ্বংসী টর্পেডো এর সফল নিক্ষেপণ



'এক্সারসাইজ সমুদ্র ঘূর্ণি ২০১৬' এ বাংলাদেশ নৌবাহিনী রণতরী উত্তাল হতে মিসাইল এর সফল উৎক্ষেপন

বিমান বাহিনীর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম



বিমান বাহিনীর বার্ষিক মহড়া 'উইনটেক্স-২০১৬' উপলক্ষে এয়ার কমান্ড অপারেশন সেন্টারের অপারেশন রুম পরিদর্শন করছেন বিমান বাহিনী প্রধান



বিমান বাহিনীর 'Command Safety Week-1/2016' উপলক্ষে অনুসন্ধান ও উদ্ধার কার্যক্রম অনুশীলনে বিমান বাহিনীর একটি হেলিকপ্টার



আকাশ হতে আকাশে বোমা বর্ষণ মহড়ায় বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর একটি মিগ-২৯ যুদ্ধ বিমান



আকাশ হতে ভূমিতে বোমা বর্ষণ মহড়ায় বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর একটি YAK-130 ফাইটার ট্রেইনার

সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের আয়োজনে যৌথ প্রশিক্ষণ



দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রনালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ এবং United States Army Pacific Command (USARPAC) এর যৌথ উদ্যোগে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেটে একযোগে Disaster Response Exercise and Exchange (DREE)-2016 অনুষ্ঠিত হয়



Disaster Response Exercise and Exchange (DREE)-2016 এর মহড়া

দেশ গঠনে সশস্ত্র বাহিনী



পদ্মা বহুমুখী ব্রীজের নির্মাণ কাজ পর্যবেক্ষন করছেন প্রকল্পের চীফ কো-অর্ডিনেটর, কনস্ট্রাকশন সুপারভিশন কনসাল্টিং গ্রুপ



কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ সড়ক নির্মাণ প্রকল্পে সাগরের ঢেউ থেকে রাস্তার ভাঙ্গনরোধ করার জন্য বাঁধ নির্মাণের কাজ করছে ১৬ ইসিবির সদস্যবৃন্দ



১৯ ইসিবির তত্ত্বাবধানে পরিচালিত বান্দরবান-চিম্বুক রাস্তা মেরামত প্রকল্প



৬ ইঞ্জিনিয়ার ব্যাটলিয়নের ব্যবস্থাপনায় নওগাঁ জেলার পোরশা উপজেলার সরাইপাছি আবাসন প্রকল্পে তৈরীকৃত ব্যারাক হাউজ



চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার সংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে ৫টি দেশী ট্রলারসহ ৮৭১ জন অভিবাসীকে উদ্ধার করে বাংলাদেশ নৌবাহিনী



মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযানের অংশ হিসেবে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল হতে বিপুল পরিমাণ অবৈধ জাল আটক করে বাংলাদেশ নৌবাহিনী



বিমান সদর প্রাঙ্গণে গাছের চারা রোপণের মাধ্যমে বৃক্ষরোপণ অভিযান-২০১৬ উদ্বোধন করছেন বিমান বাহিনী প্রধান



স্থানীয় নির্বাচনে পার্বত্য অঞ্চলের দুর্গম এলাকায় ভোটের সরঞ্জাম ও জনবল পরিবহনে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর একটি হেলিকপ্টার

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষায় সশস্ত্র বাহিনী



জাতিসংঘ মিশনে টহলরত
সেনাবাহিনীর সদস্যবৃন্দ



জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন (কঙ্গো) এ
স্থানীয়দের মাঝে চিকিৎসা প্রদান ও ঔষধ
বিতরণ করছেন 'দি পাইওনিয়ার্স' এর
সেনাসদস্যবৃন্দ



ইউএন মিশনে অসহায় দু:স্থদের মাঝে বিশুদ্ধ পানি
বিতরণ করছেন ব্যানব্যাট-১/২৪ এর সদস্যবৃন্দ



কঙ্গোতে ব্যানইঞ্জিনিয়ার কনস্ট্রাকশন-৬
কর্তৃক কালভার্ট নির্মাণ



জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন লেবাননে বাংলাদেশ নৌবাহিনী জাহাজ 'আলী হায়দার' ও 'নির্মূল' এর 'পিস মেডেল' প্যারেড অনুষ্ঠানে নৌসদস্যদের মাঝে ফোর্স কমান্ডার ও সহকারী নৌবাহিনী প্রধান (লজিস্টিক্স)



জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন দক্ষিন সুদানে নিয়োজিত নৌকমান্ডোদের ডিফেন্ডার ক্লাস বোটে টহল



জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন এলাকায় টহলরত বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর Mi-17 হেলিকপ্টার



জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন এলাকায় বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর একটি C-130 পরিবহন বিমান

সশস্ত্র বাহিনীর সেবামূলক কার্যক্রম



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ আব্দুল হামিদ কর্তৃক ৫৫ পদাতিক ডিভিশনের শীতকালীন প্রশিক্ষণে স্থানীয় জনগণের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ৬৬ পদাতিক ডিভিশনের শীতকালীন প্রশিক্ষণে স্থানীয় জনগণের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়



ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জনগণের মাঝে ঢেউটিন বিতরণ করছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী



গত ২০১৫ সালে বন্যায় কবলিত অসহায় মানুষের মাঝে নৌকায় ত্রাণ বিতরণ করছে ২ ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারি



শ্রীলংকায় ঘূর্ণিঝড়, ভূমিধসসহ আকস্মিক বন্যায় সৃষ্ট মানবিক বিপর্যয়ের প্রেক্ষিতে ১০৫ টন জরুরী ত্রাণ সামগ্রী দেশটির দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের সচিব এস, এস, মিয়ানাওয়ালা এর নিকট হস্তান্তর করছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী



বঙ্গোপসাগরে বিধ্বস্ত হওয়া ট্রু এভিয়েশনের বেসরকারী কার্গো বিমান ও ক্রুদের উদ্ধার করে বাংলাদেশ নৌবাহিনী



২০১৬ তে শ্রীলংকায় সংঘটিত ভয়াবহ বন্যা ও ভূমিধসে ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের জন্য সরকারি ত্রাণসামগ্রী নিয়ে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর একটি পরিবহন বিমান শ্রীলংকার উদ্দেশ্যে যাত্রার প্রাক্কালে উপস্থিত সাংবাদিকদের ব্রীফ করা হচ্ছে



২০১৬ তে শ্রীলংকায় সংঘটিত ভয়াবহ বন্যা ও ভূমিধসে ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের জন্য সরকারি ত্রাণসামগ্রী বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর একটি পরিবহন বিমানে লোড করা হচ্ছে

সশস্ত্র বাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান/সফর



জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ডে মহান বিজয় দিবস কুচকাওয়াজ ২০১৫ পরিদর্শন করছেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি



সশস্ত্র বাহিনী দিবস-২০১৫ এ সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে একজন খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধার হাতে উপহার তুলে দিচ্ছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা



সশস্ত্র বাহিনী দিবস-২০১৫ এ সেনাকুঞ্জে অভিবাদন গ্রহণ করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী



সেনাকুঞ্জে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সম্মানে সশস্ত্র বাহিনীর ইফতার-২০১৬ এ মোনাজাতরত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, নিরাপত্তা উপদেষ্টা ও তিন বাহিনীর প্রধানগণ



আর্মি মাল্টিপারপাস কমপ্লেক্স-এ স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর War Veteran গণের সম্মানে আয়োজিত নৈশভোজ



বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত International Day of United Nations Peace Keepers-2016 অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি



সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ ও Bangladesh Institute of International and Strategic Studies (BIISS) এর যৌথ উদ্যোগে BIISS মিলনায়তনে আয়োজিত 'Civil Military Relations in Democracy : An Effective Framework' শীর্ষক সেমিনারে সমাপনি বক্তব্য রাখছেন পিএসও এএফডি



পরিদর্শন বইয়ে স্বাক্ষর করছেন সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের বিদায়ী প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার



স্বাধীনতা দিবস ২০১৬ এ জাতীয় স্মৃতিসৌধে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী



বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত International Day of United Nations Peace Keepers-2016 অনুষ্ঠানে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ইউএন মিশনের কর্মকর্তাগনের সাথে মত বিনিময় করছেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি



পিজিআর এর ৪১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে মহামান্য রাষ্ট্রপতি, সেনাবাহিনী প্রধান এবং উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ



১০ পদাতিক ডিভিশনের অধীনস্থ একটি ইউনিটের পতাকা উত্তোলন করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী



সদর দপ্তর এসডব্লিউও-পশ্চিম এর তত্ত্বাবধানে ১৭ ইসিবি কর্তৃক নির্মিত ৪ লেনে উন্নীত জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ মহাসড়ক এর শুভ উদ্বোধন শেষে প্রকল্প পরিচালক ও প্রকল্প কর্মকর্তাদের সাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী



৬৬ পদাতিক ডিভিশনের শীতকালীন প্রশিক্ষণ ২০১৫/১৬ এ সৈনিকদের প্রতি বক্তব্য রাখছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী



বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রধান এর সাথে ভারতীয় ইস্টার্ণ কমান্ডের জিওসি-ইন-সি এর সৌজন্য সাক্ষাৎ



সেনাসদরে সেনাবাহিনী প্রধানের সাথে চীনা প্রতিরক্ষামন্ত্রীর সাক্ষাৎ



সেনাসদরে সেনাবাহিনী প্রধানের সাথে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এর সৌজন্য সাক্ষাৎ



যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানে আয়োজিত ইফতার এ মোনাজাত করছেন মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা উপদেষ্টা ও তিন বাহিনী প্রধানগণ



প্রয়াস ঢাকা স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্যমন্ত্রী



বাংলাদেশ সফরকালে নাইজেরিয়ান সেনাবাহিনী প্রধান শিখা অনির্বাণে পুষ্পস্তবক অর্পন করছেন



তেজগাঁওস্থ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে নৌবাহিনী প্রধানকে এডমিরাল র‍্যাংক পরিয়ে দিচ্ছেন বিমান বাহিনী প্রধান ও ভারপ্রাপ্ত সেনাবাহিনী প্রধান



মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট থেকে 'স্বাধীনতা পদক' গ্রহণ করছেন নৌবাহিনী প্রধান



ইন্দোনেশিয়ায় অনুষ্ঠিত 'ইন্টারন্যাশনাল ফ্লিট রিভিউ-২০১৬' এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সে দেশের রাষ্ট্রপতি জোকো ইউডোডো এর সাথে কুশল বিনিময় করছেন নৌবাহিনী প্রধান



চট্টগ্রামের রেডিসন ব্লু হোটেলে ১৬তম নর্থ ইন্ডিয়ান ওশান হাইড্রোগ্রাফিক কমিশনের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী দেশসমূহের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে ফটোসেশনে নৌবাহিনী প্রধান



ভারতের বিশাখাপত্তনে অনুষ্ঠিত সমুদ্র মহড়া (International Fleet Review-2016) চলাকালীন সময়ে ভারতীয় নৌপ্রধানের সাথে সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন নৌবাহিনী প্রধান



চট্টগ্রামস্থ বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে মিডশীপম্যান ২০১৪-বি ব্যাচের রাষ্ট্রপতি কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করছেন নৌবাহিনী প্রধান



বিমান বাহিনী ঘাঁটি বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমানকে ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি



বাংলাদেশ বিমান বাহিনীতে YAK-130 কম্ব্যাট প্রশিক্ষণ বিমান ও AW-139 মেরিটাইম সার্চ এন্ড রেসকিউ হেলিকপ্টারের অন্তর্ভুক্তি অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মাঝে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী



'রাষ্ট্রপতি কুচকাওয়াজ-২০১৫' এ সার্বিক কৃতিত্বের জন্য শ্রেষ্ঠ ফ্লাইট ক্যাডেট আন্ডার অফিসারকে 'সোর্ড অব অনার' প্রদান করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী



মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে বিমান বাহিনী প্রধানকে এয়ার চীফ মার্শাল র‍্যাংকব্যাজ পরিয়ে দিচ্ছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা উপদেষ্টা ও ভারপ্রাপ্ত সেনাবাহিনী প্রধান



বিমান সদর পরিদর্শনকালে অন্যান্যদের মাঝে ভারতীয় বিমান বাহিনী প্রধান



ম্যাক্সওয়েল বিমান ঘাঁটির কমান্ডার এবং এয়ার ইউনিভার্সিটির প্রেসিডেন্ট লেফটেন্যান্ট জেনারেল Steven L Kwast এর নিকট থেকে 'ইন্টারন্যাশনাল অনার রোল' এর সনদপত্র গ্রহণ করছেন বাংলাদেশ বিমান বাহিনী প্রধান

সশস্ত্র বাহিনীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ



বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস্ (বিইউপি) এর 'কনভোকেশন-২০১৬' এ প্রধান অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে ক্রেষ্ট প্রদান করছেন বিউপি এর ভাইস চ্যান্সেলর



বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস্ (বিইউপি) এর আয়োজিত একটি সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী



বঙ্গভবনে এনডিসি কমান্ড্যান্ট, এসডিএস ও এনডিসি ২০১৫ কোর্স মেম্বারদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখছেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি



ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজের গ্রাজুয়েশন সেরিমনি ২০১৫ এ এনডিসি কোর্স মেম্বারগণের মাঝে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী



ডিএসসিএসসি ২০১৫-১৬ এর গ্রাজুয়েশন সেরিমনিতে কেক কাটছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী



ডিএসসিএসসি ২০১৬-১৭ কোর্সের ইনডোর এক্সারসাইজে ছাত্র অফিসারগণ



এমআইএসটিতে নেভাল আর্কিটেকচার এন্ড মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের তত্ত্বাবধানে আয়োজিত একটি সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন মাননীয় নৌপরিবহন মন্ত্রী



এমআইএসটিতে Inter University National Robotics Competition titled as 'ROBOLUTION-2016' অনুষ্ঠিত হয়



এমবিবিএস পরীক্ষা মে ২০১৬ এর লিখিত পরীক্ষার হল পরিদর্শন করছেন এএফএমসি এর কমান্ড্যান্ট



এমবিবিএস পরীক্ষা মে ২০১৬ এর এনাটমী বিষয়ের মৌখিক ও ব্যবহারিক পরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করছেন এএফএমসি এর কমান্ড্যান্ট



বিপসটে অনুষ্ঠিত Conflict Related Violence Course-1 এ অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ



বিপসটে অনুষ্ঠিত United Nations Military Units Manuals (UNMUM) Implementation Seminar 2016 উপলক্ষে Protection of Civilian (POC) এর মহড়া

সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের সামাজিক অনুষ্ঠান



সশস্ত্র বাহিনী দিবস-২০১৫ উপলক্ষে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রীতিভোজ



সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার তাঁর সম্মানে আয়োজিত ডিনার পার্টিতে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাগনের সাথে করমর্দন করছেন



স্বাধীনতা দিবস-২০১৬ উপলক্ষে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রীতিভোজ

সেনাবাহিনীর সামাজিক অনুষ্ঠান



৬ স্বতন্ত্র এডিএ ব্রিগেডের নববর্ষ ১৪২৩ উদযাপন পরিদর্শন করছেন সেনাবাহিনী প্রধান



প্রয়াস স্কুল যশোর কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানে সম্মিলিত ফটোসেশনে সেনা পরিবার কল্যাণ সমিতির প্রধান পৃষ্ঠপোষক সোমা হক



প্রধান পৃষ্ঠপোষক সোমা হক কর্তৃক সেনা পরিবার কল্যাণ সমিতি যশোর অঞ্চল পরিদর্শন



সেনা পরিবার কল্যাণ সমিতির বার্ষিক সভা শেষে গ্রুপ ফটোসেশনে প্রধান পৃষ্ঠপোষক সোমা হক



সেনা পরিবার কল্যাণ সমিতির বার্ষিক সভায় প্রধান পৃষ্ঠপোষক সোমা হক



সেনা পরিবার কল্যাণ সমিতির প্রধান পৃষ্ঠপোষক সোমা হক কর্তৃক সেনা সদস্যার যশোর পরিদর্শন



বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠান



লেডিস কাব ঢাকা কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশনা

নৌবাহিনীর সামাজিক অনুষ্ঠান



বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিবার কল্যাণ সংঘ ঢাকা আয়োজিত সেলাই সনদ বিতরণ, শিশু স্বাস্থ্য প্রতিযোগিতা ও অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০১৬ এর পুরস্কার বিতরণী ও সমাপনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মাঝে প্রেসিডেন্ট বিএনএফডব্লিউএ



নৌসদরস্থ সাগরিকা হলে বিএন লেডিস ক্লাব আয়োজিত Art Competition 2016 এর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মাঝে প্রেসিডেন্ট বিএনএফডব্লিউএ বেগম নাজমুন নিজাম



নাবিক কলোনীস্থ নৌপরিবার শিশু নিকেতন স্কুল পরিদর্শনকালে শিক্ষার্থী শিশুদের সাথে কুশল বিনিময় করেন প্রেসিডেন্ট বিএনএফডব্লিউএ



মিরপুরস্থ নাবিক কলোনীতে ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইন ২০১৬ এ শিশুদের ভিটামিন এ ক্যাপসুল খাওয়ান প্রেসিডেন্ট বিএনএফডব্লিউএ বেগম নাজমুন নিজাম

বিমান বাহিনীর সামাজিক অনুষ্ঠান



বাংলা নববর্ষ-১৪২৩ উপলক্ষে বিমান বাহিনী ঘাঁটি বাশার আয়োজিত বৈশাখী মেলার উদ্বোধন করছেন বিমান বাহিনী প্রধান



বাফওয়া আঞ্চলিক শাখা বাশার আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী ও অন্যান্যদের মাঝে বাফওয়া সভানেত্রী তাসনীম এসরার



ভারতীয় বিমান বাহিনীর 'এয়ার ফোর্স ওয়াইভস ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন' এর সভানেত্রীকে ক্রেস্ট প্রদান করছেন বিএএফ লেডিস ক্লাবের প্রধান পৃষ্ঠপোষক



'চিলড্রেন'স ফেস্টিভ্যাল' অনুষ্ঠানে একটি শিশুকে পুরস্কার প্রদান করছেন বিএএফ চিলড্রেন'স ক্লাবের প্রধান পৃষ্ঠপোষক তাসনীম এসরার

সশস্ত্র বাহিনীর ক্রীড়া কার্যক্রম



বগুড়া অঞ্চলে অনুষ্ঠিত আন্তঃ ইউনিট
বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা-২০১৬



আন্তঃইউনিট মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতা-২০১৬



চট্টগ্রাম এরিয়া আন্তঃ ইউনিট সাইক্লিং
প্রতিযোগিতা-২০১৬



এএমসিসিএন্ডএস কর্তৃক পরিচালিত ডিপিসি-১
এ প্রশিক্ষণরত মহিলা সৈনিকবৃন্দের ভলিবল খেলা



বাংলাদেশ নৌবাহিনী টেনিস ও স্কোয়াশ প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন দলের হাতে ট্রফি তুলে দেন নৌবাহিনী প্রধান



বাংলাদেশ নৌবাহিনী ঘাঁটি তিতুমীরে অনুষ্ঠিত বিএন ভলিবল প্রতিযোগিতা-২০১৬ এর একটি বিশেষ মূহুর্ত



আন্তঃঘাঁটি কাবাডি প্রতিযোগিতা-২০১৫ এর বিজয়ী দলের খেলোয়াড় ও অন্যান্যদের মাঝে সহকারী বিমান বাহিনী প্রধান (প্রশাসন)



আন্তঃঘাঁটি ওয়াটার পোলো প্রতিযোগিতা-২০১৬ এর একটি খেলায় গোলমুখে আক্রমণ

'সশস্ত্র বাহিনী দিবস' উপলক্ষে রচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী কর্তৃক পরিচালিত স্কুল/কলেজের পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীগণ

রচনা প্রতিযোগিতা-২০১৬

সেনাবাহিনী

ক গ্রুপ - একাদশ হতে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত



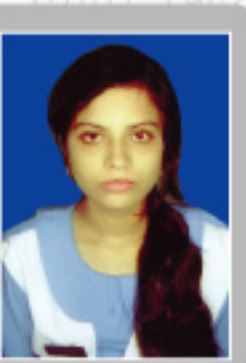
মোঃ লামইয়ানুল ইসলাম শোভন (১ম স্থান)
লালমনিরহাট ক্যান্ট
পাবলিক স্কুল ও কলেজ



আছিয়া খানম তানজিন (২য় স্থান)
শহীদ বীর উত্তম
লেঃ আনোয়ার গার্লস কলেজ



কানিজ ফাতেমা রিয়া (৩য় স্থান)
আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ



সারমিন সুলতানা তন্নি (৪র্থ স্থান)
দাউদ পাবলিক স্কুল ও কলেজ

খ গ্রুপ - ৯ম হতে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত



মোঃ ফেরদৌসুর রহমান সজীব (১ম স্থান)
রাজশাহী ক্যান্ট
পাবলিক স্কুল ও কলেজ



জাসিয়া আশরাফ সামিহা (২য় স্থান)
বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল
স্কুল ও কলেজ



নাঈমুল ইসলাম (৩য় স্থান)
কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট হাই স্কুল



ফাতেমা তুজ জোহরা (৪র্থ স্থান)
ঘাটাইল ক্যান্ট পাবলিক
স্কুল ও কলেজ

গ গ্রুপ - ৬ষ্ঠ হতে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত



আনিকা মাহজেবিন (১ম স্থান)
ঘাটাইল ক্যান্টনমেন্ট
পাবলিক স্কুল ও কলেজ



নাফিসাহ্ নূর-ই-জেরিন (২য় স্থান)
বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট
পাবলিক স্কুল ও কলেজ



খান কাজলা তাবাসসুম কেয়া (৩য় স্থান)
ঘাটাইল ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক
স্কুল ও কলেজ



মরিয়ম আক্তার রাফা (৪র্থ স্থান)
ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড
বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কুমিল্লা

নৌবাহিনী

ক গ্রুপ - ৯ম হতে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত



সাদিয়া তাসলিম (১ম স্থান)
বিএন কলেজ ঢাকা



লাবিবা তারান্নুম ইসলাম (২য় স্থান)
নেভী এ্যাংকরেজ চট্টগ্রাম



মাহমুদা সিগমা (৩য় স্থান)
বিএন কলেজ ঢাকা

খ গ্রুপ - ৬ষ্ঠ হতে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত



মেহের আফরোজ (১ম স্থান)
বিএন কলেজ ঢাকা



আরিয়ানা মেহজাদ (২য় স্থান)
বিএন স্কুল ও কলেজ চট্টগ্রাম



কাজী মোঃ ত্বোয়াহা (৩য় স্থান)
নেভি এ্যাংকরেজ খুলনা

বিমান বাহিনী

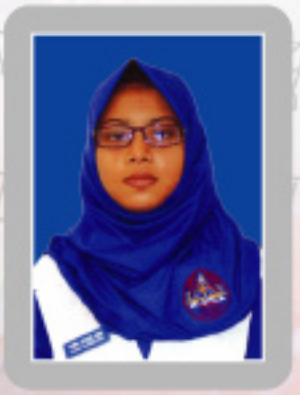
ক গ্রুপ - ৯ম হতে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত



আলিফ সামিয়া (১ম স্থান)
বিএএফ শাহীন কলেজ
পাহাড়কাঞ্চনপুর



মারিয়া বিনতে জামান (২য় স্থান)
বিএএফ শাহীন কলেজ যশোর



তামীম তাসনুবা ছোঁয়া (৩য় স্থান)
বিএএফ শাহীন কলেজ যশোর

খ গ্রুপ - ৬ষ্ঠ হতে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত



মাহমুদা ইসলাম (১ম স্থান)
বিএএফ শাহীন কলেজ যশোর



তাসনীম জাহান আনিকা (২য় স্থান)
বিএএফ শাহীন কলেজ ঢাকা

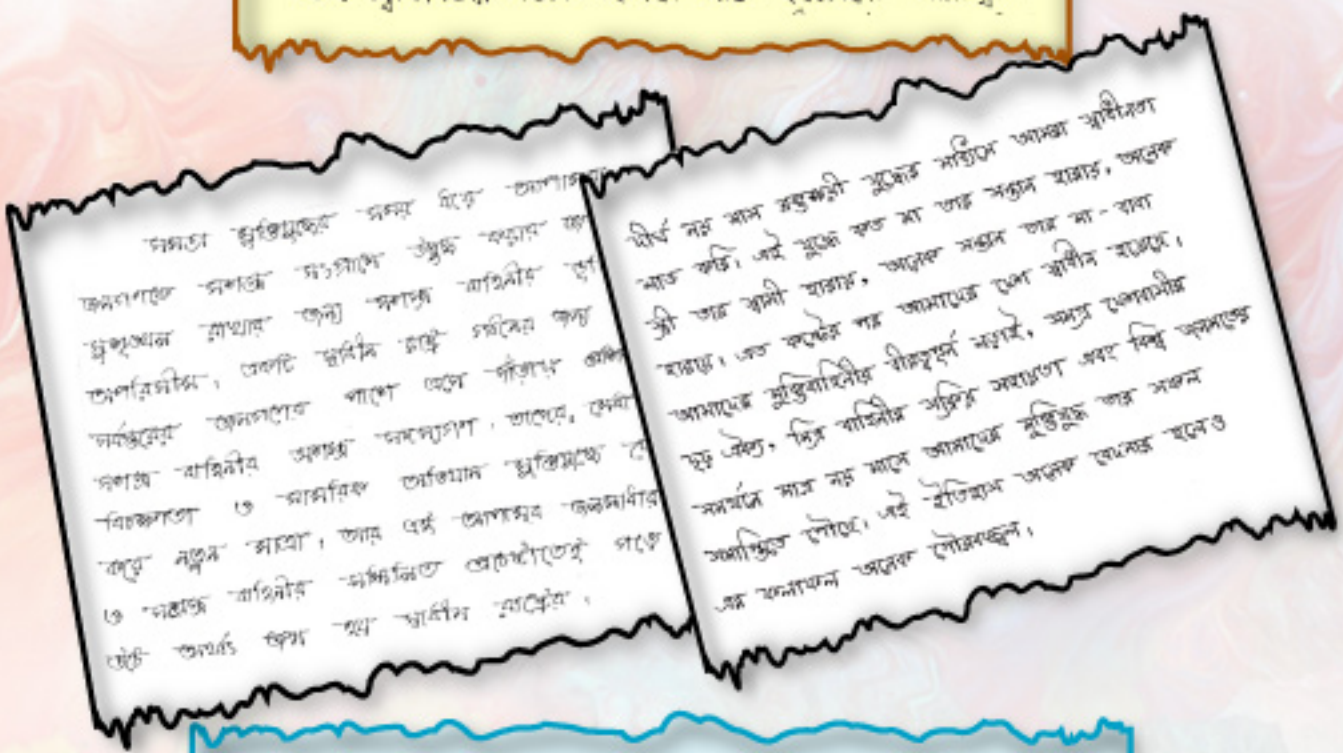


মির্জা সাদিয়া আফরোজ (৩য় স্থান)
বিএএফ শাহীন কলেজ যশোর

আমাদের সন্তানদের লেখনীতে উঠে এসেছে স্বাধীনতার অঙ্গীকার এবং সশস্ত্র বাহিনীর মাহাত্ম্য

সশস্ত্রবাহিনী আমাদের গর্ব, আমাদের অহংকার :

সশস্ত্র বাহিনী আমাদের গর্ব। তাঁদের কর্তব্যপরায়ণতা, আন্তরিকতা, দৃঢ়প্রত্যয়, আত্মবিশ্বাসী চেতনা, ত্যাগপ্রবণতা এবং মানবতাবাদী মনোভাব আমাদেরকে বিশ্বের মাঝে নতুন করে দাঁড়াতে সাহায্য করেছে। ১৯৭১ সালের ৯মাস ব্যাপী চলমান মুক্তিযুদ্ধে সশস্ত্রবাহিনীর অবদান অপরিসীম। তাঁরা জলে,স্থলে ও আকাশে সম্মিলিতভাবে আক্রমণ করে বাহন্নাদশের বিজয় এবং স্বাধীনতার পতাকা ছিনিয়ে আনে। স্বেকারন পরিস্থিতি



আন্তর্জাতিক জাতিগোষ্ঠে আমাদের পররাষ্ট্র নীতি হচ্ছে- 'সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে বৈরিতা নয়'। বিশ্বের বিভিন্ন দুর্গম এলাকে জাতিসংঘ শান্তি স্থাপন করা উদ্দেশ্য আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর জওয়ান দায়িত্ব হাতে তাঁড়িয়েছে। বিশ্ব মানবতা রক্ষায় আমাদের শান্তিরক্ষা বাহিনীর ভূমিকা অসামান্য অবদান। এ থেকে বুঝা যায়, জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর ভূমিকা অতুলনীয়।

চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ২০১৬

সেনাবাহিনী

ক গ্রুপ - ৯ম হতে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত



মোছাঃ লুৎফুন নেছা মীম (১ম স্থান)
গাজীপুর ক্যান্ট বোর্ড
বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়



শারমিন মারিয়া চৈতি (২য় স্থান)
ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড
হাই স্কুল, ঘাটাইল



সানজিদা হক (৩য় স্থান)
জিরাবো ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক
স্কুল ও কলেজ



ইসরাত জেরীন বনী (৪র্থ স্থান)
গাজীপুর ক্যান্ট বোর্ড
বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়

খ গ্রুপ - ৬ষ্ঠ হতে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত



আনিকা তাহসিন ঊর্মি (১ম স্থান)
নির্ঝর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক
স্কুল ও কলেজ



মরিয়ম তুন নেছা মিমি (২য় স্থান)
বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক
স্কুল ও কলেজ



রাওশান তাবাসসুম (রাফনা) (৩য় স্থান)
মোমেনশাহী ক্যান্টনমেন্ট
পাবলিক স্কুল ও কলেজ



নাওশীন তাবাসসুম নাবিলা (৪র্থ স্থান)
বারিধারা স্কলার্স
ইনিস্টিটিউশন

চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ২০১৬

গ গ্রুপ - ১ম হতে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত



ইবনুল আদিব ইরাম (১ম স্থান)
ঘাটাইল ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ



শাফিন ইবনে হাশেম (২য় স্থান)
গাজীপুর ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড উচ্চ বিদ্যালয়



সাদিয়া মুজতানিবাহ (৩য় স্থান)
জিরাবো ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ



সাহিরা মাইশা সারা (৪র্থ স্থান)
ঢাকা ক্যান্ট গার্লস পাবলিক স্কুল ও কলেজ

নৌবাহিনী

ক গ্রুপ - ৯ম হতে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত



রাইসা কবির (ঐশী) (১ম স্থান)
বিএন কলেজ ঢাকা



সিফাত বিন আশরাফ (২য় স্থান)
নেভি এ্যাংকরেজ খুলনা



মোঃ রেজাউল ইসলাম রাজু (৩য় স্থান)
বিএন স্কুল এন্ড কলেজ খুলনা

খ গ্রুপ - ৬ষ্ঠ হতে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত



জান্নাতুল তাসনিম (১ম স্থান)
বিএন স্কুল ও কলেজ চট্টগ্রাম



আসমা খানম (২য় স্থান)
বিএন স্কুল কাপ্তাই



স্বপ্নীল মন্ডল (৩য় স্থান)
নেভি এ্যাংকরেজ খুলনা



বিমান বাহিনী

ক গ্রুপ - ৯ম হতে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত



বীথিকা চন্দ (১ম স্থান)
বিএএফ শাহীন কলেজ শমশেরনগর



মোঃ মুহিবুল ইসলাম মুহিত (২য় স্থান)
বিএএফ শাহীন কলেজ শমশেরনগর



রেদুয়ান আহমেদ (৩য় স্থান)
বিএএফ শাহীন ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল

খ গ্রুপ - ৬ষ্ঠ হতে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত



তাসনিম নওশিন (১ম স্থান)
বিএএফ শাহীন কলেজ যশোর



মোঃ শোয়েব আল ফাহিম (২য় স্থান)
বিএএফ শাহীন কলেজ ঢাকা



সুবাইতা রেহনুমা (৩য় স্থান)
বিএএফ শাহীন কলেজ কুর্মিটোলা

চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ২০১৬

‘সশস্ত্র বাহিনী দিবস’ উপলক্ষে সশস্ত্র বাহিনীর আওতাধীন বিশেষ শিশুদের জন্য পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় সেনা ও নৌবাহিনীর পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীগণ

সেনাবাহিনী

ক গ্রুপ



মিস অনন্যা প্যারিজ (১ম স্থান)
প্রয়াস, রাজশাহী সেনানিবাস



মোঃ সিরাতুল ইসলাম (২য় স্থান)
প্রয়াস, বগুড়া সেনানিবাস



আল আমিন হাসান (৩য় স্থান)
প্রয়াস, কুমিল্লা সেনানিবাস

খ গ্রুপ



মোঃ শাহরিয়ার মাহমুদ রনি (১ম স্থান)
প্রয়াস, বগুড়া সেনানিবাস



মোঃ হাবিবুর রহমান ছনি (২য় স্থান)
প্রয়াস, বগুড়া সেনানিবাস



মোছাঃ সামিরা আজাদ অজন্তা (৩য় স্থান)
প্রয়াস, বগুড়া সেনানিবাস



ফারজানা আক্তার আঁখি (৩য় স্থান)
প্রয়াস, রংপুর সেনানিবাস

নৌবাহিনী



সঞ্জয় দত্ত (১ম স্থান)
আশার আলো, চট্টগ্রাম



মেহেবুবা হোসেন মীম (২য় স্থান)
আশার আলো, চট্টগ্রাম



হাসান হাসানাত আব্দুল্লাহ জীম (৩য় স্থান)
আশার আলো, চট্টগ্রাম

ছোট ছোট ছেলেমেয়ে রংতুলিতে
ফুটিয়ে তুলেছে ভালোবাসার দেশকে ও সশস্ত্র বাহিনীকে







Published by
Armed Forces Division

Graphic Design & Printing by
Creative Hands Limited

